

আত্ তওজিহাতুল বহিয়াহ্

ফি-তরদিদে মা-ফিত্ তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ্

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْمِنَّةُ اِنَّ هَذِهِ رِسَالَةٌ
عَجَالَةٌ غَرِيبَةٌ مُّسَمَّاءُ

بِالتَّوْجِيهَاتِ الْبَهِيَّةِ

تَرْدِيْدٍ مَا فِي التَّنْقِيْحَاتِ السَّنِيَّةِ
مَعَ الْقَوْلِ الْمَغْنِيِّ فِي رَدِّ مَنَاطِرَةٍ فِينِي

من مؤلفات واقف الخفايق كاشف الدقائق مفتي الاعظم غوث الزمان سيّد المناظرين
سند المحققين العلامة سيّد امين الحق ابن الفاضل الواصل العالم الكامل مولانا سيّد عبد
الكريم (بوالهما الله تعا في جنات النعيم) جاتجامي، ثم الفرهاد ابادي، بنغلاديش۔

গাউছে জমান, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত
মুফতীয়ে আজম, ছৈয়দুল মুনাজেরিন
আল্লামা ছৈয়দ আমিনুল হক
ফরহাদাবাদী (কঃ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
سورة نوح اسراءیل: ۸

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْمِنَّةُ
إِنَّ هَذِهِ رِسَالَةٌ عَجِيبَةٌ عَجَّالَةٌ غَرِيبَةٌ
مُسْتَأْثَرَةٌ

بِالتَّوْحِيدِهَا تِلْكَ الْبَهِيَّةُ

تَرْدِيدِ مَا فِي التَّنْقِيحَاتِ السَّنِيَّةِ
مَعَ الْقَوْلِ الْمَغْنَى فِي سَرِّ مَنَاطِرَةِ فَنِي

আততাওজিহাতুল বহিয়াহ
ফি তারদীদে মা ফিত্
তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ

(সিজদায়ে তাহিয়াহ সম্বন্ধীয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

গাউছে জমান মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হৈয়দুল মোনাজেরিন, মুকতীয়ে আজম,
আল্লামা শাহসুফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ)

আত্মাওজিহাদুল বহিয়াহ কি তরদীদে মা ফিত্ত তানকিহাতিহু ছুন্নিয়াহ

মূল :

গাউছে জমান মুজাদ্দিদে মিন্নাত, হৈয়দুল মোনাজ্জেরিন, মুফতীয়ে আজম,
আব্দামা শাহসুকা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ)
কাউলে মুগনী : মমতাজুল মোহাম্মদীন মাওলানা ওবাইদুল আকবর (রাহ.) পোস্ত মেডেলিস্ট

বাংলা অনুবাদ :

শাহজাদা মৌলভী সৈয়দ মুহম্মদ হক ফরহাদাবাদী
মাওলানা তৌহিদুল আনোয়ার মোহাম্মদ আবদুল হাই আল হাক্কনী
এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ও প্রাক্ষ আলোমেদীন কর্তৃক বাংলাভাষায় অনূদিত।

প্রকাশক :

আওলাদে ফরহাদাবাদী ও সাজ্জাদানশীনে দরবার
শাহজাদা মৌলভী সৈয়দ মুহম্মদ হক ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ জহুরুল হক ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ আজিজুল হক ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ আবু তাঈব ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হোসাইন ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ জিয়াউল হক ফরহাদাবাদী (র) এর পক্ষে তাঁর পুত্রগণ

সহযোগিতায় :

সাহেবজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ ফরসাল আবেদীন কারহান
মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদুল হক চৌধুরী

গ্রন্থসম্ব :

সর্বসম্ব, প্রকাশক ও আনজুয়ানে গাউছিয়া আমিনিয়া ফয়জিয়া প্রকাশনা পরিষদ কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ (আরবী) : ১২৯৭ মবী ১৩৫৪ হিজরী ১৯৩৫ ইংরেজী, ১৩৪১ বাংলা
দ্বিতীয় প্রকাশ (আরবী) : ১লা জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং
তৃতীয় প্রকাশ (আরবী ও বাংলা) : ২২ মাঘ ১৪১৭ বাংলা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং
(গাউছে জমান আব্দামা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম ফরহাদাবাদী (ক.) এর ২২তম পবিত্র ওরশ)
১ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরী

মুদ্রণে :

আল-মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
১৮২, আল-ফাতেহ শপিং সেন্টার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-৬২২২৬৪

হাদিয়া : ১৩০.০০ (একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র। U. S. \$: 5.00

প্রকাশনায় ও প্রচারণায় :

আনজুয়ানে গাউছিয়া আমিনিয়া ফয়জিয়া
ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ, নুর আলী মিয়াহ হাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

বিঃদ্রঃ- অত্র কিতাবের বাংলা অনুবাদ প্রকাশকদের অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ হুবহু কিংবা আংশিক ছাপালে তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধি ও কপিরাইট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রকাশকগণ অধিকারী হবেন, তবে যে কোন লেখক অত্র কিতাবের উদ্ধৃতি রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে কোন বাধা নেই।

দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা	১
প্রকাশকের কথা	২
প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৫
الفصل الأول :	১১
প্রথম পরিচ্ছেদ : হামদ-নাত ও অবতরণিকা	
الفصل الثاني :	১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সিজদা এর প্রকারভেদ ও বিশদ বর্ণনা	
الفصل الثالث :	২৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তায়াজ্জুকাতের প্রকারভেদ ও আমরে তাক্বীনি ও তামরীযীর বিশদ বর্ণনা	
الفصل الرابع :	৩৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে তাহিয়াহ বৈধতার বিশদ বর্ণনা এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডন	
الفصل الخامس :	৫১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আয়াতে সালাম দ্বারা সিজদায়ে তাহিয়া রহিত না হওয়ার বর্ণনা	
الفصل السادس :	৬১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সিজদা সম্পর্কিত আল কোরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ সমূহের অপব্যাখ্যা খণ্ডন	
الفصل السابع :	৮৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ : সিজদা-এ তাহিয়াহর বিরুদ্ধবাদীদের দলিল ও নাসেখ-মনসুখ বিধানের যুক্তিখণ্ডন	
الفصل الثامن :	১১০
অষ্টম পরিচ্ছেদ : সিজদা-এ তাহিয়াহ জায়েজ ও নাজাজেজ হওয়ার বাহ্যিক তাশাব্বাহ সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা	
الفصل التاسع :	১১৬
নবম পরিচ্ছেদ : সিজদা-এ তাহিয়াহ সম্পর্কে ফকীহদের মতামত	
الفصل العاشر :	১২২
দশম পরিচ্ছেদ : সিজদা সম্পর্কীয় হাদীস সমূহের পর্যালোচনায় কামেলীনদের মতামত	
الفصل الحادي العاشر :	১৩১
একাদশ পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে তাহিয়াহ সম্পর্কে সারসংক্ষেপ বর্ণনা	
التنمية :	১৩৩
পরিশিষ্ট : “হেমাহু” বা ধর্মীয় সংগীত বাদ্যযন্ত্র সহকারে শ্রবণ করার শরীয়ত সম্পর্কিত বিধানের বর্ণনা	

عرضِ ناشر

ہر قسم کی تعریف حقیقی معبود کائنات کے لئے جس شخص کو اپنے محبوب دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے عدم سے وجود میں لایا اور ہر طرح کی درود و سلام نورانی
نبی شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے از سر پائمنترہ و تبرہ ہیں خصوصاً
جس کی چھوڑ پاک مخلوقات کے لئے مرآۃ اللہ ہیں اور بر حثیت کے شکریہ صحابہ کرام و اولیاء
عظما کے ہیں جن حضرات مکرمین کے ظاہری و روحانی تصرفات کی بدولت ہم بد نصیبوں
کو دولت ایمان نصیب ہوا،

بعد اس کے عرض یہ ہے کہ یہ فتویٰ بر مضمون "یسجدہ" تحیہ "ہمارے والدِ مکرم مفتی
اعظم غوث زمان سید المناظرین سند الحقیقین علامہ سید امین الحق فرہادی
آبادی قبلہ عالم (قدس سرہ الباری) کی تصنیفات سے ہے جس کی حقانیت پر زمانہ
ماضیہ کے ہر اسسخین علم متفق الازار ہیں خصوصاً جسکی حقانیت زمانہ ماضی میں مصر
جامع الازھر کے تمام علماء حقانی و مفتیان ربانی تسلیم کی تھی، مگر قریباً پچیس سال
تک اس معتبر فتویٰ کو چھپانہ تھا لیکن ہر اطراف کے بہت علماء حقانی و مفتیان ربانی کے
طرف سے یہ چھپانے کیلئے خط آتے ہیں،

اس لئے ہیں آج کل کی مفتیان عظام علماء کرام و طلبان دوران کے نفع کیلئے
انکی خدمت میں دوسری مرتبہ چھپا کر پیش کی ہوں،

فقط والسلام

ناشر

مولانا سید فیض الاسلام فرہاد آبادی

প্রকাশকের কথা

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ পাকের জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি সৃষ্টিকাস্ট মানবকে নিজ জ্ঞান দানে সৃষ্টির সেরা গুণে গুণাঙ্কিত করেছেন। তাঁর হাবীব সৃষ্টির সেরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং নূরনবী (দ.) এর পবিত্র আহলে বাইত বংশধর ও আছহাবগণের প্রতি পরিপূর্ণভাবে অসংখ্য ছালাত ও সালাম বর্ষিত হউক, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত প্রিয় বান্দাগণের প্রতিও ছালাত বর্ষিত হউক যাঁরা একত্ববাদী ও আহলে একীনের কেবলা।

দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের ফযুজাত ও বরকতের উৎস, আবুল ওয়াকত আবরার ও অলীকুল সম্রাট, সম্মানিত কুতুব বিশ্বঅলি গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী হযরত মাওলানা শাহসূফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ ফানীফিল্লাহ বাকীবিল্লাহ কান্দাছা ছিররুহুল আজিজ ছাহেব কেবলা বেলায়তে ওজ্জমার উজ্জ্বল শিখা নিয়ে যখন এই ধরাধামে আত্মপ্রকাশ করলেন, অসংখ্য মানব পতঙ্গের ন্যায় তাঁর সুশীতল অত্যাঙ্গুল ধ্রুবতারার ন্যায় দিশারী বেলায়তের আশ্রয় গ্রহণের অভিপ্রায়ে তাঁর খেদমত শরীফে হাজির হতে লাগলেন। দিশেহারা মানুষ আলোর পথের দিশা পেয়ে অহমিকা বিসর্জনে অবনত মস্তকে উক্ত ফজিলতে রব্বানীর তা'জীম বা সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। ছিফাতে বশরীর বিদূরতা পূর্বক হেজাবে জোলমানী অপসারণে তজকীয়ায়ে নফছ ও হায়াতে কলবীর উদ্দেশ্যে হালকা মজলিশ করত : বাজনা সহকারে আল্লাহ, রছুল (দ.) ও পীর মুর্শিদের প্রশংসায় গানগীতি পাঠে ও জিকিরে জলী সহকারে অজুদ করতে আরম্ভ করলেন, যা বেলায়তে মাইজভান্ডারীর এক বিরাট অবদান, অল্প সময়ে লতিফা ও দেহে বিদ্যুৎময় গতিতে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং উরুজ্জে রুহানিয়তে বিশেষ ফলপ্রসূ। জনগণ মাইজভান্ডারী আশেক তালেবদের হালকা জজবা দেখতে গিয়া নিজেও জজবাতের অধিকারী সম্পন্ন হন।

ইলমে মারেফাত বা খোদা পরিচিতি জ্ঞানহীন কতক জাহেরী ভাষাবিদ আলেম ইহা দর্শনে ইনকার করত : মাইজভান্ডারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফতোয়া প্রদান করতে আরম্ভ করলেন এবং বেলায়তে মাইজভান্ডারীর শানে বিভিন্ন কটুক্তি করত শরীয়ত বিরোধী আল্লাহ রছুলের খেলাফ, শিরিক বেদআত ইত্যাদি আখ্যা দিতে লাগলেন এবং মানুষকে খোদায়ী প্রদত্ত আলো হতে মাহরুম করার চেষ্টা করতে লাগলেন, এমন কি তারা মাইজভান্ডারী আশেকদের উপর জুলুম নির্যাতন ও সমাজচ্যুত করতে লাগল এবং তাদের কাকের আখ্যা দিতে লাগল, যেহেতু প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর মাইজভান্ডারী আশেক তালেবরা ফিৎনা- ফ্যাসাদের শিকার হল।

ইহা দেখে হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী কেবলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা অদ্বিতীয় আলেমে দ্বীন, ইলমে শরীয়ত ও মারেফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী, যাকে যুগের ইমাম গাজ্জালী বললেও আত্মাক্তি হবে না, গাউছে জমান মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত মুফতীয়ে আজম আল্লামা ছৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) পবিত্র কোরআন ও হাদীছের অকাট্য দলিলাদি ও পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীনের কিতাবের দলিলাদি সংগ্রহ করে

যুগের প্রয়োজনে ‘তোহফাতুল আখইয়ার’ কিতাবখানা রচনা করেন যাতে ছেমা বা আধ্যাত্মিক গান বাজনা ও সজিদায়ে তাহিয়াহ বা সম্মানী সিজদার শরীয়তী ফয়সালা ও অকাট্যতা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত কিতাবখানা হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (ক.) কেবলার জাহেরী জীবদ্দশায় রচিত হয়েছিল এবং উক্ত কিতাব দেখে হযরত কেবলা (ক.) আনন্দিত হয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন ও উক্ত কিতাবে স্বয়ং দস্তখত করেন। (সূত্র: বেলায়তে মোতলাকা) পরবর্তীতে সিজদায়ে তাহিয়াহ ও ছেমা সম্পর্কে আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক.) এর সাথে বিপক্ষীয় আলেমদের অনেকগুলি মোনাজেরা বা ধর্মবিত্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার সবগুলোতে মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক:) সগৌরবে বিজয়ী হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ফেনীতে মাইজভান্ডারী অনুসারীদের বিরুদ্ধে সিজদায়ে তাহিয়াহ ও ছেমা বিষয়ে একটি মুনাজেরা তথা ধর্মীয় বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত মুনাজেরায় মাইজভান্ডারী আশেক ভক্তদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উপমহাদেশের অদ্বিতীয় মুফতী খলিফায়ে গাউছুল আজম আল্লামা হৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) আর তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁর নাতি সম্পর্কীয় জনাব মমতাজুল মোহাম্মেদীন মৌলানা ওবাইদুল আকবর এম এ গোন্ড মেডেলিষ্ট আর বিপক্ষে ছিলেন আত্‌তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ ফি তাহরিমে সিজদাতুত তাহিয়াহ কিতাবের লেখক জনৈক মৌলানা ছুফী সদরুদ্দিন ও তাঁর অনুসারীগণ। উক্ত মুনাজেরায় মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক.) মাইজভান্ডারী তারিকার বিরোধীদের সমস্ত অপব্যাখ্যা ও দাবি সফলভাবে খণ্ডন করে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন। আর উক্ত মুনাজেরায় বিপক্ষীয় সমস্ত দলিলের খণ্ডনই হল বর্তমান কিতাব ‘আত তওজিহাতুল বহিয়াহ ফি তরদীদে মাফিত্ তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ’। একটি মুনাজেরা থেকে একটি বিশ্বমানের কিতাব রচিত হওয়ার এই কাহিনী ইতিহাসে প্রোচ্ছল হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুনাজেরায় বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার সময় সৌজন্য কপি হিসেবে পরাজিত পক্ষের নেতৃত্বদানকারী মৌলানার রচিত আত্‌তানকি হাতিছ ছুন্নিয়াহ ফি তাহরিমে সিজদাতুত তাহিয়াহ নামক কিতাবের একটি কপি আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক.) কে প্রদান করেন। উক্ত আত্‌তান কিহাতিছ ছুন্নিয়াহ ফি তাহরিমে সিজদাতুত তাহিয়াহ এবং এই কিতাবের মত অন্যান্য বিভিন্ন কিতাবে সিজদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সিজদা নাজায়েজের পক্ষে যে সমস্ত দলিল যুক্তি, পবিত্র কোরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে সেগুলি সমূলে খণ্ডন করে আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক.) কোরআন ও হাদীছের প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন পূর্বক ঐতিহাসিক ফেনী মোনাজেরাকে ভিত্তি করে আরবী ভাষায় বিশ্বমানের এই অমূল্য কিতাব ‘আত তওজিহাতুল বহিয়াহ ফি তরদীদে মাফিত্ তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ মা আল কাওলিল মুগনি ফি রদে মুনাজিরাতে ফেনী’ রচনা করেন। উক্ত কিতাব শুধুমাত্র স্বদেশের আলেম সমাজ নয় সূদূর মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আলেমগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল এবং উক্ত কিতাবের ভাষা সৌকর্যের জন্য তা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য করা হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত কিতাবখানা ১৩৫৪ হিজরীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মুর্শিদে বরহক হযরতুলহাজ্ব মাওলানা শাহসুফী হৈয়দ ফয়জুল ইসলাম

ফরহাদাবাদী (ক.) ১লা জানুয়ারী ১৯৮৯ ইংরেজীতে, এর পরে উক্ত কিতাবের আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

আশেক ভক্তদের বারবার তাগাদা সত্ত্বেও উক্ত কিতাব এত দীর্ঘকাল যাবৎ প্রকাশ করতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। বর্তমানে উক্ত কিতাবের কোন কপি বাজারে না থাকায় আমরা সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে উক্ত কিতাবের হুবহু আরবীসহ বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এমতাবস্থায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলেমেদ্বীন কর্তৃক উক্ত কিতাবখানা বাংলাভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন করা হয়। বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হলে আমরা সর্বস্তরের পাঠকদের সুবিধার্থে মূল কিতাব (আরবী) হুবহু রেখে এর মূল অংশকে ১১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি এবং গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষে যা 'পরিশিষ্ট' আকারে লিখেছিলেন তাকে 'ছেমাহ বা ধর্মীয় সংগীত' সম্পর্কে পরিচ্ছেদ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, গ্রন্থকারের মূল কিতাবের (আরবী) কোন অংশই পরিবর্তন করা হয়নি, শুধুমাত্র অনুবাদকৃত বঙ্গানুবাদ বুঝার সুবিধার্থে একে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের সূচীপত্রে উল্লেখিত পরিচ্ছেদের নাম সমূহই শুধুমাত্র প্রকাশকগণ কর্তৃক সম্পাদনা করা হয়েছে, গ্রন্থকারের মূল আরবী হুবহু অক্ষত অবিকৃত রয়েছে। তাছাড়া বঙ্গানুবাদে কোন ত্রুটি বা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে অবশ্যই মূল আরবীই প্রাধান্য পাবে, এক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকদের আরবী অংশের সাহায্য গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিশেষে, যাঁরা উক্ত অমূল্য কিতাবখানার তৃতীয় সংস্করণ (বঙ্গানুবাদসহ) প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশাকরি, পাঠক মহোদয়গণ বর্ণিত মাছায়েলাদির জ্ঞান অর্জনে উপকৃত হবেন। বিশ্বঅলি গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর দরবারের নগণ্য খাদেম হিসাবে আমাদেরকে দোয়া করবেন।

ইতি

প্রকাশকবন্দ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক)- এর বিশিষ্ট খলিফা, মাইজভাণ্ডারী তরিকার যথার্থতার পক্ষে শরয়ী দলিল প্রদানকারী ও অতুল্য গ্রহণীয় যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ আল্লামা শাহসূফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
- শাহজাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফুল হক ফরহাদাবাদী

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন আল্লামা গাজী শেরে বাংলার (রা) ভাষায় আলেমগণের ইমাম, সর্বাত্মক মর্যাদাবানগণ কর্তৃক অনুসৃত, খোদা পরিচয় লাভকারীদের গৌরব, তর্কশাস্ত্রবিদগণের সর্দার, শরয়ী দলিল বিশারদগণের মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, সর্বজনীন নেতৃস্থানীয় আলেম, মহামর্যাদাশালী, দূরদর্শী জ্ঞানী, মর্যাদাশালী তত্ত্বজ্ঞানী, সূক্ষ্মজ্ঞানের অতল সাগর, তীক্ষ্ণ জ্ঞানের তরঙ্গমালা, খ্যাতনামা মাশায়েখগণের আশ্রয় কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞগণের সনদ, তত্ত্বজ্ঞানীদের মুকুট, লিখনী ও গ্রন্থগার সম্রাট, গণ্যমান্যগণের দলিল, উর্ধ্বতন মহামান্যগণ থেকে অন্যতম অবশিষ্টজন, ইসলাম জাহানের শায়খ বা ধর্মগুরু।

তিনি চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানার উত্তরপ্রান্তে ফরহাদাবাদ নামক একটি ছোট্ট গ্রামে কাজী ও সৈয়দ বংশীয় এক প্রখ্যাত আলেম পরিবারে ১২৭১ বাংলা মোতাবেক ১২৬৩ হিজরী, ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বগ্রামে এক শুভ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বুজুর্গ পিতার নাম হযরত আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর পিতা আলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম (র) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেমে-দ্বীন ও আশেপাশে রাসূল (দ)। তিনি মৌলুদ শরীফ বিষয়ক সরকার-দো-আলম রাহমাতুল্লাল আলামীন হযরত আহমদ মুজতবা, মুহাম্মদ মোস্তফা (দ)-এর শানে প্রায় সতেরশত হৃদয়গ্রাহী ফার্সী ও আরবী শ্লোক সম্বলিত 'নজমে দিল কোশা ফি মিলাদে মোস্তফা' শীর্ষক কিতাব রচনা করেন, যা সে সময়কার সুন্নী মুসলমানদের হৃদয়ে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। খাতেমুল আউলিয়া হযরত মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি আল্লাহ তা'আলার জগতসমূহে গাউসুল আজম রূপে নিয়োজিত এবং মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে মাহবুবীয়ত তথা প্রেমাস্পদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ২২ তারিখে তাঁকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে মৌলুদ শরীফ পড়বার জন্য দাওয়াত দিতেন এবং তাঁর (অর্থাৎ আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম (র)) উপস্থাপনায় পরিচালিত মৌলুদ শরীফ শ্রবণ করতেন। তাঁর (আল্লামা ফরহাদাবাদী) মাতার নাম সৈয়দা নসিমা খাতুন, যিনি হাটহাজারী থানার বুড়িচর মৌজার সৈয়দ বংশীয় কন্যা ছিলেন।

বাল্য জীবন ও জাহেরী ইলম অর্জন : সৈয়দ আমিনুল হকের বয়স চার বৎসর অতিবাহিত হলে তাঁর বুজুর্গ পিতা তাঁকে কালামুল্লাহর সবক'দেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পিতার নিকট ছহীভাবে পবিত্র কোরআন শিক্ষা করেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কেও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তাঁকে স্থানীয় মাদরাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি

চট্টগ্রাম শহরের তৎকালীন সরকারী মোহছেনীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। মোহছেনীয়া মাদরাসায় পাঠ্য অবস্থা থেকেই তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও যুগশ্রেষ্ঠ মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের নজরে করমের বদৌলতে ব্যতিক্রমধর্মী প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে শুরু করেন। মোহছেনীয়া মাদরাসায় ফাজেল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ারাকালীন এক রাতে তিনি চট্টগ্রাম শহরে প্রসিদ্ধ অলি উল্লাহ্ হযরত আমানত শাহ্ (র)-এর রাওজা শরীফে জিয়ারত করতে যান। তথায় মাজার পার্শ্বস্থ কুল গাছের নীচে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে দিব্যি দেখতে পেলেন পবিত্র মাজার শরীফের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ কুল গাছ থেকে একটি কুল ছিঁড়ে তাঁর মুখে পুরে দিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছুটে গেল। জাগ্রত হওয়ার পর তথাকার কুল গাছ থেকে তাঁর সামনে টস করে একটি বে মৌসুমী পাকা কুল পড়ল। তিনি অজু করে কুলটি খেয়ে ফেললেন। পরদিন রাতে তিনি হযরত মিছকিন শাহ্ (র)-এর মাজার শরীফে গিয়ে তাঁর অতি পরিচিত এক বুজুর্গ কমলি শাহকে কমল আবৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি কমলী শাহকে মৃত বলে ধারণা করে তথায় কোরান পাঠে রাত্রি অতিবাহিত করেন। অতঃপর সকালে নামাযের আযান শুনামাত্রই দেখতে পেলেন কমলি শাহ আল্লাহ্ আকবর বলে উঠে বসে গেলেন। তিনি এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে কমলি শাহ'র মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কমলি শাহ্ তাঁকে বললেন, গত রাতে আমানত শাহ তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন, আবার এখানে কেন এসেছো। অতঃপর তাকে বললেন, তুমি চলে যাও। আমাকে একটি কমল দিও। তিনি তথা হতে নিজ বাসায় চলে গেলেন। দিবাগত রাতে বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে তাঁর নিদ্রা এসে গেল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হযরত আমানত শাহ্ (র) তাঁর পাশে বসে কিতাবের পর কিতাব উল্টাচ্ছেন এবং আর তিনি পড়ে যাচ্ছেন। এই পড়ার যেন শেষ নেই। এরপর তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দরজা খুলে গেল অর্থাৎ তিনি এলমে লদুনী প্রাপ্ত হন। এরপর থেকে মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকগণ কোন মাছায়ালা নিয়ে আটকে গেলে তিনি এর সুন্দর সমাধান দিতেন। শিক্ষকগণ তাঁর এই ধরণের প্রতিভা দেখে তাঁকে 'মুফতী আমিন' অভিধায় আখ্যায়িত করতে লাগলেন। অতঃপর যথারীতি মোহছেনীয়া মাদরাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করেন তিনি। ইলমে কোরআন, ইলমে হাদিস, উসুলে হাদিস, ফিকাহ, সব মযহাবের উছুলে ফিকাহ, তাফসির, মানতিক, হেকমত, বালাগত, আকায়দে, ফলছফা ও ফরায়েজ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অতঃপর তিনি স্বধামে নিজ বাড়িতে এসে তাঁর বুজুর্গ পিতার সাথে ধর্মীয় বিষয়াদির উপর আরো অধিক জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। এ সময়ে তিনি স্বামী-স্ত্রীর তালাক সম্পর্কীয় ফতোয়া 'গায়তুত তাহক্বীক ফী মা ইয়াতা-আল্লুকুবহী তালা-কুত তালীক' নামে একটি উচ্চাংগের কিতাব রচনা করেন। তা দেখে তৎকালীন প্রখ্যাত মুফতী আল্লামা ফয়েজ উল্লাহ্ ছাহেব তাঁর এলমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুফতী ফয়েজউল্লা ছাহেব ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত জাহাপুর গ্রামের গরীব উল্লাহ্ মুফতী বাড়ীর প্রখ্যাত মুফতী ছিলেন।

ইসলামী জটিল বিষয়াবলীর উপর তাঁর ফতোয়া প্রণয়নে দক্ষতা, মোনাজারা, ফরায়েজ, আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা ভাষায় ছন্দে পদ্য, গদ্য ও লিখনি পদ্ধতির দক্ষতা দেখে তাঁর সমসাময়িক আলেম-উলামাগণ তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দিতে লাগলেন। আলেম ও আওয়াম সমাজের নিকট তিনি 'বড়' মৌলভী ছাহেব হিসেবে পরিচিত লাভ করেন।

ইলমে বাতেন তথা কামালিয়াত এবং খেলাফত লাভ : জাহেরী দ্বিনি এলম শিক্ষা সমাপ্তির পর এলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ব্যাপারে আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র) খাতেমুল অলি গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক)-এর অন্তর চক্ষুতে ধরা পড়লেন এবং স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে তাঁর খেদমতে গিয়ে রুহানী ফয়েজ লাভ করেন। ফলে আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র)-এর ধ্যান-ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। হযরত ওমর ফারুক (রা) যেরূপ ইসলাম ও খাতেমুন নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ)-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শেষ তক খাতেমুন নবী (দ)-এর নবুয়তী ও বেলায়তী প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আল্লাহ-রসূলের নৈকট্য ও রেজামন্দি হাসিল করতঃ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম হয়েছিলেন, তেমনি আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীও প্রথম দিকে মাইজভাগুরী তরিকার বিরোধী থাকলেও শেষতক খাতেমুল অলি গাউসুল আজম মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরীর (ক) খোদাপ্রদত্ত বেলায়তী শক্তির নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর জগৎ বিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র) তাপসকুল শিরোমণি হযরত শামছুত তাবরিজের (র) সাহচর্যে এসে জাহেরী জ্ঞানের পরিবর্তে বাতেনী জ্ঞান তথা অদৃশ্য খিজিরী জ্ঞান লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি হযরত আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীও খাতেমুল অলি গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক)-এর সাহচর্যে এসে জাহেরী জ্ঞানের পরিবর্ত অদৃশ্য খিজিরী জ্ঞান লাভ করেছিলেন। প্রথমে স্বপ্নে, তারপর জাহেরে দর্শন, সাহচর্যে এসেই আমূল পরিবর্তন। এক জামানা ছোহবতে বা আউলিয়া, বেহতর আজ ছদ ছালে তা আত বেরিয়া (মছনবী শরীফ) অর্থাৎ এক মুহূর্ত আউলিয়ার দর্শন লাভ করা শত বৎসরের ক্রটিহীন (কবুল হওয়া) ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

অতঃপর তিনি মাইজভাগুর দরবার ও তরিকার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে মাইজভাগুরী তরিকার প্রচার-প্রসারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে রীতিমতো প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পড়েন। এতদিন যিনি এই তরিকার ঘোর বিরোধী ছিলেন, এখন তিনিই সেই তরিকার একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। দেশ-বিদেশে ওয়াজ মাহফিলে এ তরিকার সুষ্ঠুতার সপক্ষে কোরআন, হাদীস-ইজমা ও কিয়াসের অকাট্য দলিলাদি পেশ করে আলেম সমাজের নিকট এ তরিকার বাস্তবরূপ ও সঠিকতা তুলে ধরেন। তখন মাইজভাগুর দরবার শরীফে প্রচলিত আশেক-ভক্তদের সেমা মজলিশ এবং গাউসুল আজম মাইজভাগুরীর (ক) সামনে আশেক-ভক্তদের সজিদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মান প্রদর্শনার্থে সজিদা ইত্যাদি দর্শনে এক শ্রেণীর আলেম ইনকার করতঃ মাইজভাগুর দরবার শরীফে প্রচলিত আধ্যাত্মিক সেমা ও সজিদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সজিদার বিরোধীতা করে বলতে থাকেন যে, 'সেমা' মতলক বা শর্তহীনভাবে হারাম, আর

সজিদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সজিদা করা কুফরী, এলহাদ বা ধর্ম বিরোধী, আবার কেউ কেউ বলেন হারাম। এ কারণে তারা মাইজভাগুর দরবার শরীফের আশেকভক্ত তথা অনুসারীদের বিরোধীতা করে স্থানে স্থানে-সভা সমাবেশ, ওয়াজ-নছিহতের আয়োজন করে লোকজনকে মাইজভাগুর দরবার শরীফের বিরুদ্ধে উত্তোজিত করে এবং কিছু সংখ্যক লোক মাইজভাগুর দরবার শরীফের আশেক-ভক্তদেরকে মাইজভাগুর দরবারে আসার পথে বাধা-সৃষ্টি করে তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিত আর মাইজভাগুরী আশেক-ভক্তদের সমাজচ্যুত করা হতো। এভাবে তারা মাইজভাগুরী আশেক-ভক্তদের অত্যাচার করে যেতে লাগল। তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লামা ফরহাদাবাদী (র) কিম্বৎ লিপিবদ্ধ করতঃ তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ ‘তোহফাতুল আখইয়ার’-এ বলেন, “আমি যখন দেখলাম, এই তরিকার অনুসারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে বিচরণ করছে। এ তরিকার সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নেই, তারা তাঁদের (অনুসারী) শানে নানারূপ বেয়াদবীমূলক কথা বলছে এবং অনেক সময় তাঁরা জুলুম-অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে, যেহেতু প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাদের (জুলুমকারীদের). কোন জ্ঞান নেই, ফলে দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং মাইজভাগুরী আশেক-ভক্তগণ ফ্যাসাদের শিকার হয়েছে। তাছাড়া তখনকার জাহেরী শরীয়তের আলেমগণ মাইজভাগুরী গান-গীতিসহ সমস্ত গান-গীতিসহ সমস্ত গান-গীতি শর্তহীনভাবে হারাম-কুফরী প্রভৃতি ফতোয়া প্রদান করে সাধারণ জনগণকে মাইজভাগুরী আশেকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল, এ অবস্থায় হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক) অনুমতিক্রমে এ মাছআলার ব্যাপারে তথা সেমা ও সজিদায়ে তাহিয়াহ বা সম্মানার্থে সজিদার ব্যাপার একটি কিতাব রচনা করার ইচ্ছা পোষণ করলাম, যাদ্বারা এই সেমা ও সজিদায়ে তাহিয়াহ যে জায়েজ বা বৈধ তা স্পষ্ট হয়ে যায়, যাতে এ বিষয়ে সন্দেহ ও সিদ্ধান্তহীনতা বিদূরিত হয় এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা কারো কাছে না থাকে, যাতে দানা ও ছোলা পরিষ্কার দু’ভাগে বিভক্ত হয়।” অতপর তিনি বলেন, “আল্লাহপাকের কৃপায় আমি যখন এই কিতাবটি লিখা শেষ করলাম “তোহফাতুল আখইয়ার ফি-দাফ্-ই-শরারাতিল আশরার” নামকরণ করলাম। অতঃপর আমার মোরশেদ বিশ্বালি গাউসুল আজম মাইজভাগুরী মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক) ফানা ফিল্লাহ বাকী-বিদ্বাহর সামনে এই সওগাত পেশ করে কিয়দংশ পাঠ করালাম। তিনি শুনে আনন্দিত হলেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন, তজ্জন্য আল্লাহপাকের শোকরিয়া আদায় করি। এ সময় হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরী আদর করে আমার জন্য খোদায়ী নেয়ামতের ভাগুর খুলে দিলেন।”

উপরে বিবৃত কথাগুলো আল্লামা ফরহাদাবাদী (র) তাঁর বহুল প্রচারিত কিতাব “তোহফাতুল আখইয়ার” এ আরবী ভাষায় ও বাংলা পয়ার ছন্দে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, তা হতে দুইটি পয়ার এখানে সন্নিবেশিত করা হলো:

দোয়া করিলেন মোরে করিয়া আদর। তাহার উপর করি খোদার শোকর।

এইক্ষণ হযরত গাউসে মাইজভাগুর। আদরেতে খুলিছেন প্রেমের ভাগুর।

এই দুটি পঙ্ক্তির প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই সময়ে হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক) তাঁকে দোয়া করতঃ খোদা প্রদত্ত নেয়ামত দান করেছিলেন অর্থাৎ তাঁকে খেলাফত দান করেছিলেন।

এতে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সম্ভ্রষ্ট ও আস্থাশীল হয়ে গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক) তাঁকে খলিফা বা আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং যথারীতি বাইআত করানোর অনুমতিও দেন। তাঁকে খেলাফত প্রদান করে গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক) কালাম করেন, “আমার ছয়টি কিতাব থেকে একটি তোমাকে দিলাম। আমার বারটি কাছারি আছে, একটি তোমাকে দিলাম, আমার বারটি সামা বা বাতি আছে, তন্মধ্যে একটি তোমার। আমার বারজন ইমামের একজন তোমাকে নিযুক্ত করলাম।” (মাছদারু আইওয়্যারিল বারী ফি তরজুমাতে গাউছিজ্জামান আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক)-প্রথম সংস্করণ ২০০৭ ইং পৃষ্ঠা ৫৪/৫৫) এরপর থেকে মাইজভাগুরী পরিমণ্ডলে আশেক-ভক্তবৃন্দের নিকট আল্লামা ফরহাদাবাদী সম্মানিত ও সুপরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

অতঃপর হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরীর (ক) ভ্রাতৃপুত্র ও বিশিষ্ট খলিফা কুতুবুে এরশাদী মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (ক.) হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরীর (ক) জীবদ্দশায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৫ অগ্রহায়ণ (মতান্তরে ২৭ অগ্রহায়ণ) ওফাতপ্রাপ্ত হন। স্বভাবতই হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (ক.) কে প্রদত্ত খেলাফত পদটিও শূন্য হয়ে পড়ে। এই শূন্যপদ পূরণ হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক) কর্তৃক একটি আধ্যাত্মিক রহস্যাবৃত ঘটনার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (ক.)-এর ওফাতের খবর পেয়ে মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) মাইজভাগুর দরবার শরীফ যাওয়ার পথে রোসাংগিরি গ্রামের এক পুকুর পাড়ে হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক) প্রকাশ বাবা ভাগুরীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। কুতুবুল আকতাব ও অদৃশ্য খিজরী জ্ঞানস্পন্দ অলি হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক) আল্লামা ফরহাদাবাদীর (র) ডান হাত ধরে উক্ত পুকুরে নেমে একাধারে সাতবার সাঁতার কাটার পর পুকুর থেকে উঠেন। ভিজা কাপড়ে আল্লামা ফরহাদাবাদী মাইজভাগুর দরবার শরীফে গিয়ে পৌছেন। মাইজভাগুর দরবার শরীফে পৌছার পর হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরী (ক) আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) কে পরনের কাপড়, সেরওয়ানী ও একটি পাগড়ী দিয়ে ভিজা কাপড় পরিবর্তন করতে বলেন। অতঃপর এই বলে হুকুম দিলেন, ‘আমিন মিয়ার জানাজা আমিন মিয়াই পড়াবে’। হযরত গাউসুল আজম মাইজভাগুরীর (ক) আদেশে আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) জানাজার ইমামতি করার সময়ে তিন তকবীর বলার পর অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর গাউসুল আজম মাইজভাগুরীর (ক) বাকী এক তকবীর দিয়ে জানাজার নামাজ সমাপ্ত করেন। এরপর থেকে মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের সমস্ত গুণাবলী আল্লামা ফরহাদাবাদীর (ক.) মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে। গাউসে জামান মুজান্নিদে দ্বীনোমিল্লাত মুকতীয়ে আজম আল্লামা শাহসুফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক) রচিত কিতাব সমূহের নাম :

১. শাওয়াহিদুল ইবতালাত ফী তারদীদে মা-ফী-রাফি-উল-ইশকালাত (ইহা সুন্নী

মতাবাদ বিরোধী হাটহাজারী মাদরাসার মৌলভী ফয়জুল্লাহ সাহেবের রাফিউল ইশকালাত নামক কিতাবের রদ বা খণ্ডন)।

২. দাফিউশ শোবহাত ফী জাওয়াজিল ইস্তিজারে আলাত ত্বোয়া-আত (ধর্মীয় কাজ করে বিনিময় লওয়া প্রসঙ্গে ফতওয়া)।

৩. রাফিউল গেশাবী ফি তরদীদে মা-ফি ইশাআতিল ফতাবী (ইহা আনারবী তথা মাতৃভাষায় জুমার খুতবা দান বা অর্থ করা নাজায়েজ সম্পর্কে লিখিত ফতওয়া ইশাআতিল ফতাবীলহানাফীয়াহ ফী তাহারীমি খোতবাতিল জুমআ বেগাইরিল আরাবিয়াহ কিতাবের রদ বা খণ্ডন)।

৪. মেরআতুল ফান ফী শরহে মোল্লা হাছান (ইহা ইসলামী আইন ও তর্ক শাস্ত্রের স্বনামধন্য কিতাব মোল্লা হাছান এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা)।

৫. তোহফাতুল আখইয়ার ফী-দাফ-ই-শরারাতিল আশরার (ইহা নির্দোষ সেমা, সিজদায়ে তাহিয়াহ, পীর মোরশীদের আনুগত্য, বাইআত ও ইলমে তাছাউফ সম্পর্কীয় বিস্তারিত ফতওয়া)।

৬. আত্ তাওজিহাতুল বাহিয়াহ ফী তারদীদে মা-ফিত্ তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ (ইহা তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ ফি তাহরীমি সিজদাতুত তাহিয়াহ নামক ফতোয়ার রদ বা খণ্ডনে সিজদায়ে তাহিয়াহ, নির্দোষ সেমা প্রভৃতি সম্পর্কীয় ফতওয়া)।

৭. গায়তুত তাহক্কীক ফী মা ইয়াতা-আল্লুক বিহীতালা-কুত্ তা'লীক (ইহা স্বামী-স্ত্রীর তালাত্ত সম্পর্কীয় ফতোয়া) প্রভৃতি।

আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক.) ২৭ জিলহজ্ব ১৩৬৩ হিজরী, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৫১ বাংলা মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে রোজ বুখবার, জোহরের সময় উনাশি বছর বয়সে ফরহাদাবাদ দরবার শরীফে আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক হতে পর্দা করেন (ইন্নািল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আছরের সময় তাঁর একমাত্র পুত্র ও খলিফায়ে আজম আল্লামা শাহসূফী সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম (রা)-এর ইমামতিতে জানাজার নামাজ সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাঁকে তাঁর দেখানো স্থানে দাফন করা হয়।

আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র) তাঁর রাওজা শরীফের বর্ণনা দিয়ে নিম্নোক্ত শোক গাথা রচনা করেন।

“তর বতশরা বাগে জন্মাত ছাজে আই রব্ব জাহা,

ইস্তাজিব ইয়া রব্ব তোফাইলে ছরওয়ারে পয়গম্বরা।

আন্দর আঁ ফরহাদাবাদস্ত রওজায়ে পুরনুরে উ,

মরদুমা পুর ফায়জে বাশন্দ দায়ে মান আজ জাতে উ।

অর্থ : হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তাঁর সমাধিস্থলকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করেন। হে রাক্বুল আলামিন! নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা (দ)-এর উসিলায় আমার এ প্রার্থনা কবুল করুন। চট্টগ্রামের ফরহাদাবাদ গ্রামে তাঁর নূরানী রওজা শরীফ অবস্থিত। সর্বদা আমাদের সকলের উপর এ মহান অলি আল্লাহর রূহানী ফয়জাত প্রবাহমান থাকুক (দিওয়ানে আজিজ)

প্রত্যেক বছর ২৭ অগ্রহায়ণে তাঁর পবিত্র ওরশ শরীফ তাঁর রাওজা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لا يعلم حقائق اموره الا من يعطيه عليها من عباده
المخلصين والصلوة والسلام على رسوله محمد الذي شرع صدى به كاشفاً
اسراره لا يطلع عليها الا من يكشفها من اوليائه المحبوبين وعلى له واصحابه
الذين بذلوا جهدهم في اظهار ما هو الصواب من امور الدين وعلى خواص عباده
الذين هم قبله لاهل التوحيد واليقين ،

اما بعد : فاعلموا يا اصحاب الصديق والسداد دار باب الحق والوداد
ات من مضوا فيما سلف من اكابر المشايخ الكرام مثل سلطان المشايخ
نظام الدين وغيره من اولياء الله العظام كان في حضرات كثير منهم يسجد
سجود الاكرام من كانوا يابسونهم من خواص الانام وهم مع كونهم في علوم الظواهر
محققين في سرائر البواطن مدققين لم يكونوا المریدهم من ذلك السجود
مانعين وكان في مریدهم كثير من الفضلاء والعلماء الكاملين يعتقدون ان
الانكسار بوضع الجبين في حضرات المشايخ المرشدين من جملة ما يرتقى
به درجة المریدين وشيخنا المكرم مرشدنا المعظم المجمع الكمال المنبع
الفيوضات تصرفاته الظاهرة خوارق وتلونات الباطنة حقائق شواهد
المعاني اثاره ومقاصد المعاني اسراره ذاته المقدسة طور تجلي نور التقديس
من سماته وطبعه الشريف نور يتلألى فيض التنزه من صفاته مكاشفاته
وميزات اوحى ما اوحى ومشاهداته غموزات اسرى بعبده الى ما اسرى المتخلق
باخلاق الله المتصف باوصاف الله غوث الله في بلاد الله الجناح الشاه
مولانا احمد الله قل من سرنا اظلتنا الله في ظلال عطفته الى يوم الاظلال
فيه الاظلال رحمة لها كان في مصر العريف بالمسجود بنده الشريف متجلياً

على منصة المحبوبة بحال يوسف تجلوت بشاهة النواظر ومكياً على عرش الغوثية
 بكال قدسى يروق بتراقبه البصائر كان ملئ ملئ من شيوخ الدهر يا تون
 في جنابه المعلى تحبباً لحضرتة فيضعون الجباه على ساداته تعظيماً
 لعلو شأنه والوف الوف من اخوة العصر يلتجئون الى عتبته تأدباً بجنابه
 فيخرون على الاذقان سجداً تكريماً لرفعة مكانه لكن لم يرقط من حضرة
 العليا اثر الجحود لذلك السجود فلما دعا الله الى حضرة وصاله واسكنه جوار
 نواله تولى سريره ولايته وملك اريكة سلطنته عمدة ذريته زبدة عترته قدوة
 الواصيلين قرة العارفين محبوب العاشقين مطلوب المشتاقين سراج -
 السالكين تاج المطالبين اثاره زاهية البرهان اسرار خافية العرفان
 افاضاته ربانية افاداته حقانية تصرفات قرانية ترمزاته عرفانية من
 راء فقد رآى نير الامعاء على وجه السماء المفاخر ولا زال سطوعه على فوق العلى
 ظلام الغواية عن قلوب المعاصر قطب الاقطاب في هذا الزمان مولد
 اهل لعراف الشاه مولانا غلام الرحمن قدس سره اذ اقنا الله
 ببركات حلاوة الايمان فلما شاعت في اطراف الديار زمزمة بحاسنة
 ومناقبه صار الناس يهرعون الى حضرة ليستناروا من مشاعل فيوضه
 ولما ذاعت في القرى والامصار طمطممة مكارمه ومناصبه صار اهلها
 يسرعون الى ساداته ليقبضوا من اشعة افاضاته فبعد وصولهم في تلك
 الدار لما يشاهدون بؤر الابصار ان نور حبيبه اجلى من ضياء الشمس
 في نصف النهار وبعد ورودهم في ذلك الدار لما يشاخصون بنور الانظار
 ان جمال امرأة يراى فيها جمال الله المختار يتخشع قلوبهم فيقعون في
 السجود تعظيماً لحضرتة بغاية الانكسار وهذا السجود وان يقع في
 حضرتة العليا في الليل والنهار لكن لم يظهر منه في ذلك في حين من

الاحيان اثر الانكار فلما تبين ما ذكر ان سجود المريد لشيخه على وجه التحية و
 التكرمة مجاز عند الاولياء الذين يعلمون حقائق الامور بمكاشفاتهم يدركون
 دقائق الاشياء بمشاهدة لهم فقد حصل الدليل على جواز مع ذلك لما يراى
 ان ارباب الظواهر ينكرون انكار العناد وينسبونهم الى الفسق والكفر و
 الالحاد ولا يتأملون ان بذلك يكون طعنهم على الاولياء والامجاد وقد كتبوا
 في ذلك رسائل منها التنقيحات السنية في تحريم سجدة التحية
 وقد ادعى فيها مؤلفه ان تلك السجدة لم تكن جائزة في زمان من الازمنة
 بل لا وجود لها في شريعة من الشرائع اصلاً وسجود الملائكة لادم عليه
 السلام وكذا سجود الاخوة ليوسف عليه السلام مما لا يعقل معناه والله يعلم
 لما امر الملائكة به ولم يكن ذلك السجود للتحية مع هذا كان مختصاً
 لادم عليه السلام وكذا سجود الاخوة كان مختصاً ليوسف عليه السلام
 انما سجدوا له لسر من الاسرار لا يطلع عليه الا الله المختار فلا يصح
 الاستدلال بامر الملائكة بالسجود وكذا بسجود الاخوة ليوسف عليه
 السلام على جواز في هذا الزمان فان امر الملائكة به امر تركوي لا تشريعي
 كيف يكون تشريعياً والامر التشريعي لا بد ان يكون بتوسط النبي ولم يكن ذلك
 الامر للملائكة بتوسط ادم عليه السلام وهو ما كان نبياً لهم في الجنة
 حتى يكون الامر بتوسط بل صار نبياً بعد هبوطه على الارض من الجنة و
 ما كان من الحكمة في امر الملائكة بالسجود قد تم بسجودهم مرة واحدة
 بدفع واحدة حتى لو كانوا سجدوا له مرة ثانية لم يجز لهم لان الامر
 المطلق لا يحتمل التكرار فلا يجوز ان يدخل تحت شرع من قبلنا حتى
 يكون حجة لنا وايتداه شرع من قبلنا من ادم بعد نبوته لا قبلها ثم
 كلامه وقد بين في تلك الرسالة دلائل هذه الدعاوى كلها بحسب زعمه

لكن لما كانت تلك الدعاوى كلها باطلة وفي دلائلها سخافة ظاهرة لا بد لازمة
بطلان تلك الدعاوى واطرها ما في دلائلها من السخافة وتقرير ما هو
الحق في هذا الباب ان يكتب سطور مشتملة على تحقيق هذه المسئلة بحيث
يرتفع به ما في جواز ذلك السجود من الشك والارتياح فالمسئول عند
الله الوهاب ان يوفق المجيب لاطرها ما هو الصواب بحسب ما يحكم به
الكتاب فيقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ،

প্রথম পরিচ্ছেদ

হামদ-না'ত ও অবতরণিকা

অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি স্বীয় হাকিকতের কার্যাদি সম্পর্কে
সবাইকে অবগত করান না, কিন্তু কতক বাছাইকৃত বান্দাকে ঐ হাকিকতের কর্ম সমূহের
জ্ঞান দান করেন ও অবগত করান; আর ছালাতো ছালাম বর্ষিত হউক তাঁর প্রেরিত রাসূল
ও বন্ধু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ তা'আলা
যাঁর পবিত্র বন্ধুত্বকে প্রশস্ত করেন তাঁর রহস্যাদি উন্মুক্তকরণের নিমিত্তে, আর ঐ সমস্ত
রহস্যাদি আল্লাহর অনুগৃহীত বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্য সাধারণের
মাঝেও উন্মোচিত করেন না; আর রহমতও শান্তি বর্ষিত হউক নবী করিম ছাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বায়াত এবং সাহাবায়ে কেরামগণের উপর, যারা তাঁদের
চেষ্ঠাকে ব্যয়িত করেছেন ধর্মের সঠিক ও নির্ভুল কার্যাদি প্রকাশ করার জন্য; এবং
আল্লাহর খাস বান্দাগণের উপরে সালাতো ছালাম বর্ষিত হউক, যারা আহলে তাওহীদ
তথা একত্ববাদী ও আহলে ইয়াকীন তথা দৃঢ় বিশ্বাসী গণের কেবলা স্বরূপ।

হামদ ও সালাতের পর অবগত হউন, হে সং পথ অবলম্বন কারী ও সত্য্যভিমুখী ব্যক্তি
এবং “আবরাহিল হক ওয়াল ওয়াদাদ” হক বা সত্যের অনুসারী ও বন্ধুত্বকারী, যে সমস্ত
বুজুর্গ ও সম্মানিত মাশাইখীনগণ যারা অতীতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, যেমন
মাশায়েখগণের বাদশাহ হযরত শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়া (কঃ) এবং অন্যান্য সম্মানিত
ও মহিমাম্বিত আউলিয়ায়ে কেরাম যাদের সম্মুখে তাঁদের শিষ্যগণ সিজদায়ে তাহিয়াহ
বা সম্মান প্রদর্শনার্থে সিজদা করতেন অথচ তাঁরা তথা মাশায়েখগণ ইলমে জাহের তথা
আচার ধর্মে পারদর্শী ছিলেন এবং গোপন রহস্যের সুক্ষ তত্ত্ববিদও ছিলেন। তাঁরা তাঁদের
শিষ্যদের তথা মুরিদানদেরকে এ জাতীয় সিজদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সিজদা করা
থেকে বারণ করেন নি। তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে অনেক যুগশ্রেষ্ঠ ও পরিপক্ব আলেম
ছিলেন। উপরন্তু তাঁদের শিষ্যগণ বিশ্বাস করতেন যে, মাশায়েখীন ও মোরশেদীনগণের
সামনে মস্তক অবনত করে সিজদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সিজদা দ্বারা বিনয় প্রকাশ
করা মুরীদানের উচ্চ দরজা বা মরতবা লাভের মুখ্য কর্ম ও সারকথা।

আমার মোরশেদে মোয়াজ্জাম, শাইখে মোকাররম, যিনি সমস্ত কামালিয়ত ও ফজিলতে
রাব্বানীর সমাবেশকারী এবং ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কেন্দ্র, যাঁর প্রভাব
অলৌকিক ঘটনাবলীও কেরামত সমূহের মধ্যস্থতায় সর্বময় ব্যাপ্ত, তাঁর অন্তর্নিহিত স্বরূপ

পবিত্র তুর পর্বত সদৃশ চেহারাতে বা মুখমন্ডলে প্রস্ফুটিত। তাঁর মেজাজ শরীফ বা ভাবভঙ্গী নূর বিশেষ। তাঁর গুণাবলী হতে দোষ বিবর্জিত ‘ফয়জ’ বিকীর্ণ হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক সূক্ষ তত্ত্বাবলী বা কাশ্ফ রাসুলে করিম ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে’রাজ কালে আন্বাহ তা’লার সাক্ষাৎ দর্শনে অবগত বস্তু, তাঁর মোশাহেদা বা দর্শন রাসুলে করিম ছান্নান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে’রাজী ছায়রের পরিদৃষ্ট রহস্যাবলীর চাক্ষুষ জ্ঞান। তাঁর গুণাবলী আন্বাহ তা’লার গুণাবলী হতে অর্জিত। তিনি আন্বাহ তা’লার জগত সমূহে গাউছুল আজম রূপে নিয়োজিত। তাঁর পবিত্র নাম মোবারক জনাব শাহ মোলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ), আন্বাহ তাঁর রহস্যকে পবিত্র করুন। মহান আন্বাহ তা’লা আমাদের উক্ত গাউছুল আজমের অনুগ্রহের ছায়া দান করুক, যে দিন তাঁর অনুগ্রহের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া তথা আশ্রয় থাকবে না। যখন তিনি মাইজভাভার দরবার শরীফে মাহবুবীয়তের তথা প্রেমাস্পদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের সম্মুখে তিনি জামালে ইউসুফী তথা ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্যের সাদৃশ্যতায় বিরাজমান ছিলেন এবং কামালে কুদশী তথা পরিপূর্ণ পবিত্রতায়, গাউছিয়তের মসনদে সমাসীন ছিলেন, তখন অনেক পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি সমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, যাঁরা তখনকার সময়ের মহাজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা হযরত শাহ ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাভারীর মহিমাবিত দরবারে আসতেন আন্তরিক মোহাব্বত তথা প্রেম প্রীতি নিয়ে এবং তাঁর মহান শান শওকতের কারণে তাঁর আস্তানা মোবারকে ঐ সমস্ত জ্ঞানী আলেমগণ তাঁর সম্মানার্থে তাঁকে সিজদায়ে তাহিয়্যাহ তথা সম্মানী সিজদা করতেন। আর তখনকার সময়ে হাজার হাজার মানুষ অতীব আদবের সাথে বিভিন্ন আশা আকাংখা নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর (হযরতের) উচ্চাসনের সম্মুখে আশেক ভক্তবৃন্দগণ প্রেমাকর্ষণে তাঁর সম্মুখে সম্মানী সিজদা করতেন এবং এ সম্মানী সিজদার মাধ্যমে হযরতের পক্ষ থেকে অনেক ফয়েজ বরকত লাভ করতে দেখা যেতো।

অতঃপর যখন মহান আন্বাহ রাক্বুল আলামীন নিজের মাহবুব হযরত গাউছুল আজম মাইজভাভারীকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন, তাঁর বেলায়তের মসনদে ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তাঁরই বংশের উত্তম ও সুযোগ্য সন্তান কোদওয়াতুল ওয়াছেলীন তথা আন্বাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অগ্রণী, কুররাতুল আরেফীন তথা খোদা পরিচিতি লাভকারীদের চক্ষু জুড়ানো শীতলতা, মাহবুবুল আশেকীন তথা খোদা প্রেমিকদের প্রেমাস্পদ, মাতলুবুল মোশতাকীন তথা খোদা আকাংখা কারীদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য, ছেরাজুহ ছালেকীন তথা খোদার পথের পথিকদের আলোকবর্তিকা, তাজুত তোয়ালেবীন তথা খোদা অবেষণকারীদের তাজ বা মুকুট; তাঁর বেলায়তের প্রভাব প্রামাণ্য ও স্পষ্ট, আসরারুহ খাপিয়াতুল ইরফান তথা তাঁর রহস্যাদি খোদা পরিচয়ের সহায়ক, তাঁর ফয়েজ খোদা প্রদত্ত, তাঁর সাহচর্য্য খোদার সাহচর্য্য সদৃশ, তাঁর তছাররোফত তথা প্রভাব পবিত্র কোরআন মোতাবেক, তাঁর ভাবভঙ্গীসমূহ খোদা পরিচয়ের সহায়ক; যে ব্যক্তি তাঁকে দেখেছেন, উপরন্তু তিনি দেখেছেন নাইরুল আময়া তথা উর্ধ্বাকাশের রাশিচক্র এবং বুরুজসমূহের উপর তার পবিত্র পদাংক উর্ধ্বাকাশে সদা সর্বদা বিরাজমান; সমসাময়িকদের হৃদয় থেকে “জালামুল গাওয়াইয়া” তথা বেঈমানী ও গোমরাহীর

অঙ্কার বিদুরীতকারী, এ জামানার কুতুবুল আকতাব, আহলে ইরফান তথা খোদা পরিচয় প্রার্থীদের মৌলা তথা বন্ধু, শাহ ছৈয়দ মাওলানা গোলামুর রহমান (কঃ), আল্লাহ তা'লা তাঁর বরকতে আমাদের ঈমানের স্বাদ আশ্বাদন করুক।

যখন চতুর্দিক বসবাসকারী লোকজন অস্থির ও পাগলের ন্যায় তাঁর মহিমাম্বিত দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন, যেন তাঁরা তাঁর ফয়ুজাতে রাক্বানীর সফুলিজ দিয়ে নিজেদের কুলবকে নূরানী তথা আলোকিত করতে পারে। যখন গ্রাম ও শহরে তাঁর মর্যাদা ও উচ্চাসনের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল, তখন গ্রাম ও শহর থেকে লোকজন দলে দলে তাঁর দরবারে আসতে লাগলেন- যেন তারা তাঁর ফয়ুজাতের বিচ্ছুরিত বারিধারা গ্রহণ করে নিজ অন্তরকে নির্মল করত পারেন। এ সমস্ত লোকেরা তাঁর মহিমাম্বিত দরবারে আসার পর থেকে তাদের অন্তরের চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করলেন যে, তাঁর পবিত্র কপাল মোবারকের নূর দিবাভাগের মধ্য প্রহরের সূর্যের আলো থেকে আরো শক্তিশালী ও উজ্জ্বল। অতঃপর তারা তাঁর দরবারে রীতিমত আসা যাওয়া করতে করতে যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যে, তাঁর জামাল তথা সৌন্দর্য আয়না স্বরূপ যে আয়নায় ক্ষমতাবান মহান রাক্বুল আলামীনের জামালিয়াত তথা সৌন্দর্য দেখা যায়। উক্ত জামালিয়াত তথা সৌন্দর্য দেখে আশেকে ভক্তগণের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, আর তখনই আশেক ভক্তবৃন্দ তাঁর সম্মুখে অতীব আদব ও বিনয়ের সাথে সিজদায়ে তাহিয়াহ করতঃ মাথা নোয়ায়ে দেয়; আর এ জাতীয় সিজদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানের সিজদা দিবা রাত্র অহরহ আশেক ভক্তগণ হযরতের আস্তানায় করে থাকেন কিন্তু হযরতের পক্ষ থেকে এ সিজদা নিষেধ অথবা এতে অসম্মতি ও শরীয়ত বিরোধী কাজ বলে বিবেচিত হলো না।

উপরন্তু যা বর্ণনা করা হলো, তা হতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শিষ্য বা মুরীদগণের সিজদায়ে তাহিয়াহ করা স্বীয় শাইখ বা মুর্শিদকে সম্মান বা তা'জীমের উদ্দেশ্যে আউলিয়ায়ে কেরামগনের দৃষ্টিতে জায়েজ তথা শরীয়ত সম্মত। আর আউলিয়া হলেন ঐ সমস্ত আল্লাহর বন্ধু যারা জ্ঞাত কার্যাদির সম্পর্কে তাঁদের কশ্ফ বা অন্তদৃষ্টি দ্বারা এবং যারা বুঝেন বস্তুর সমূহের সূক্ষ্মতা তাঁদের মোশাহেদা বা দর্শন দ্বারা। সুতরাং এর দ্বারা সিজদায়ে তাহিয়াহ বা সম্মানী সিজদা জায়েয বা বৈধতার দলিল পাওয়া গেল। এরপরও দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর আলেমে জাহের সিজদায়ে তাহিয়াহর তথা সম্মানী সিজদার বিরোধীতা করে বলেন যে, সিজদায়ে তাহিয়াহ করা কুফুরী তথা ধর্মবিচ্যুতি। তারা আরো বলেন যে, সিজদায়ে তাহিয়াহ করা ফিস্ক তথা নাফরমানী, কুফুরী ও এলহাদ তথা ধর্মবিচ্যুতি, অথচ তারা এ কথা ভাবল না যে, তাদের এ মন্দ বাক্যের আচরণ আউলিয়া ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর পড়ছে।

তারা এ সিজদায়ে তাহিয়াহ নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে অনেকগুলি কিতাব লিখেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো “আত্‌তানকিহাতিছ ছুন্নিয়া ফী তাহরিমে সেজদাতুত তাহিয়াহ”। উল্লেখিত কিতাবের সংকলক স্বীয় লেখনীতে উপস্থাপন করেছেন যে, (১) সিজদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সিজদা কোন কালে জায়েজ বা বৈধ ছিল না বরং কোন শরীয়তে মূলত এর অস্তিত্ব ছিল না।

(২) হযরত আদম (আঃ) কে ফিরিশতারা সিজদা করা এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর ভাইয়েরা সিজদা করা (যা পবিত্র কোরআনে বিবৃত আছে) যার অর্থ পরিষ্কার

বোধগম্য নয় এবং আল্লাহই ভাল জানেন কেন তিনি ফিরিশতাদের সিজদা করার আদেশ করেছেন। আর অন্য দিকে এ সিজদা তাহিয়াহ বা সম্মানের ছিল না। এরপরও ইহা শুধুমাত্র আদম (আঃ) এর জন্য খাস তথা নির্দিষ্ট ছিল।

(৩) ফিরিশতাগণ আদম (আঃ) কে সিজদা করেছিলেন- এটা আল্লাহ তা'লার রহস্যাদি হতে একটি রহস্য; আর এ রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ অন্য কাউকে অবগত করান নি। সুতরাং বর্তমানকালে সিজদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সিজদার জায়েজের স্বপক্ষে আল্লাহ কর্তৃক ফিরিশতাদেরকে আদম (আঃ) কে সিজদার নির্দেশ এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ভাইগণ কর্তৃক সিজদা করার দলিলাদি উপস্থাপন করা বিতর্ক হবে না বরঞ্চ ফিরিশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এটা আমরে তাকবীনি। আর এটা শারী'য়ী তথা শরীয়তীও নয়। তাহলে এটা শরীয়ত সম্মত কিভাবে হবে? অথচ শরীয়তের পথ নির্দেশনা নবী তথা আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষদের মাধ্যমে হওয়া অত্যাবশ্যকীয়; উপরন্তু ফিরিশতাদেরকে আদম (আঃ) জান্নাতের মধ্যে অবস্থানের সময় ফিরিশতাদের নবী ছিলেন না। উপরন্তু ফিরিশতাদেরকে আদম (আঃ) কে সিজদা করার নির্দেশ আদম (আঃ) এর মাধ্যমে হয় নি (বরং আল্লাহর নির্দেশে তা হয়েছিল) আর এতে করে এ নির্দেশ মাধ্যমের দ্বারা হওয়া সাব্যস্ত হয় না বরঞ্চ আদম (আঃ) জান্নাত থেকে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করার পর নবী হয়েছেন।

(৪) আর ফিরিশতাদেরকে সিজদা করার আল্লাহর নির্দেশ যা হেকমত ও কৌশলময় ছিল। আর ফিরিশতাদের একবার সিজদা করার দ্বারা ঐ নির্দেশ পরিপূর্ণ হল। যদি ফিরিশতাগণ দ্বিতীয়বার সিজদা করত তা তাঁদের জন্য জায়েজ বা বৈধ হত না; কেননা আমরে মতলক তথা অনির্দিষ্ট নির্দেশ বার বার সম্পাদনের ব্যাপারে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহে তা অন্তর্ভুক্ত করা জায়েজ হবে না। তাহলে ইহা আমাদের জন্য কিভাবে দলিল হতে পারে? আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের আরম্ভ হযরত আদম (আঃ) এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পর, নবুয়্যত প্রাপ্তির আগে নয়।

এতটুকু বলে উক্ত কিতাবের সংকলক তার উপস্থাপনা শেষ করলেন। আর উক্ত কিতাবের সংকলক ও সিজদায়ে তাহিয়াহ নাজায়েজের দাবীদার তার লিখিত ঐ কিতাবে আরো কতকগুলি দলিল উপস্থাপন করেছেন। আমি বলি সংকলকের স্বপক্ষের দলিলাদি সবগুলি ধারণা প্রসূত। তাই ঐ সমস্ত দলিলাদি সব গুলি বাতিল বা অগ্রাহ্য। সিজদায়ে তাহিয়াহ নাজায়েজ দাবীকারকের প্রকাশ্য জ্ঞানের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত দাবী সমূহ অবশ্যই বাতিল বা অগ্রাহ্য; আর তাঁর দাবীসমূহের মধ্যে তার স্বল্প জ্ঞান বা অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ মাছআলার ব্যাপারে যা সত্য বর্ণনা তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যার দ্বারা এই সিজদায়ে তাহিয়াহ যে জায়েজ বা বৈধ তা স্পষ্ট হয়ে যায়, যাতে এ বিষয়ে সন্দেহ ও সিদ্ধান্তহীনতা যেন বিদূরিত হয় এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা কারো কাছে না থাকে। সুতরাং অসীম সাহায্যকারী আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা যে, তিনি যেন পবিত্র কোরআন হাদীস মোতাবেক বিগ্ৰহভাবে এ ব্যাপারে লিখার সাহায্য দান করেন। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী আর তাঁর উপরই একমাত্র নির্ভরশীলতা।

اتَّ السَّجْدَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ سَجْدَةُ عِبَادَةٍ، وَسَجْدَةُ تَحِيَّةٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا ثَابِتٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ. أَمَّا السَّجْدَةُ الْعِبَادَةُ فَيَقُولُهُ تَعَالَى، **وَأَسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ** هَذِهِ الْآيَةُ فِي تَقْرِيرِ سَجْدَةِ الْعِبَادَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْطَانِ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَأَمَّا سَجْدَةُ التَّحِيَّةِ فَيَقُولُهُ تَعَالَى **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ** هَذِهِ الْآيَةُ فِي سَجْدَةِ التَّحِيَّةِ فَإِنَّ سَجُودَ الْعِبَادَةِ لغيرِ اللَّهِ تَعَالَى كُفْرٌ وَالْأَمْرُ لَا يَرُدُّ بِالْكَفْرِ لَهَا بِالتَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ السَّجُودَ لَيْسَ لِلْعِبَادَةِ لِأَنَّهُ كُفْرٌ وَالْأَمْرُ لَا يَرُدُّ بِالْكَفْرِ إِلَى

لَهُ بِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُفْتِيَ فَيُضِ اللَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فِيمَا قَالَ فِي رِسَالَتِهِ الْفَيْصَلَةَ سَجْدَةُ بَرَسَهُ كَوْنَهُ اسْتَسْجَدَ عِبَادَتِ وَسَجْدَةُ تَعْظِيمِ وَسَجْدَةُ تَحِيَّةِ سَجْدَةُ عِبَادَتِ بَغْضِ تَقَرُّبِ مِ بَاشِدِ سَجْدَةُ تَعْظِيمِ بَغْضِ تَعْظِيمِ مِ بَاشِدِ بِمَنْزِلَةِ قِيَامِ تَعْظِيمِ وَسَجْدَةُ تَحِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ سَلَامِ اسْتَسْجَدَ، فَانْه لَا أَصْلَ لِتَثْلِيثِ السَّجُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَوْلِ رَسُولِهِ وَالْقِيَامُ لِلتَّعْظِيمِ ثَابِتٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ بِخِلَافِ السَّجُودِ لِقَوْلِهِ السَّجُودُ لِلتَّعْظِيمِ بِمَنْزِلَةِ الْقِيَامِ لَهُ بَاطِلٌ؛ نَعَمْ إِنْ كَانَ التَّعْظِيمُ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ فَالسَّجُودُ لَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَهُوَ لغيرِ اللَّهِ كُفْرٌ وَشُرْكٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُنْ لَكَ فَهُوَ مِنَ التَّحِيَّاتِ وَحَكَ ذَلِكَ السَّجُودُ كَمَا سَيَأْتِي :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَجْدَةُ

وَفِي مَعَالِمِ التَّزْيِيلِ قَوْلُ اسْجُدْ وَافِيهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ السَّجُودَ كَانَ لِأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجِهَ الْحَقِيقَةُ وَتَضَمَّنَ مَعْنَى طَاعَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَمْتِثَالِ مَرَّةٍ وَكَانَ ذَلِكَ سَجُودَ تَعْظِيمٍ وَتَحِيَّةٍ لِأَسْجُودَ عِبَادَةٍ إِلَى وَعَنْ قِتَادَةِ السَّجْدَةِ لَهَا طَرَفَانِ طَرَفُ الْعِبَادَةِ وَطَرَفُ التَّحِيَّةِ فَالتَّحِيَّةُ لِأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْعِبَادَةُ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَى وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَجْدَةُ التَّحِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ السَّلَامِ إِلَى وَفِي تَفْسِيرِ الْعِلَامَةِ إِلَى سَعُودٍ وَالسَّجُودُ فِي الْأَصْلِ تَذَلُّلٌ مَعَ التَّطَامُّنِ وَفِي الشَّرْعِ وَضَعُ الْجَبِيْهَةِ عَلَى قَصْدِ الْعِبَادَةِ فَقِيلَ أَمْرٌ بِالسَّجُودِ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالتَّكْرِمَةِ

تعظيمها واعترافاً بفضلها واداء الحق التعليم واعتزازاً عما وقع في شأنه قيل
امروا بالسجود لله تعالى وانه كان قبلة لسجودهم والاول هو الاظهر الخ
وفي التفسير الكبير القول الثالث ان السجود في اصل اللغة : هو
الانقياد والخضوع اما القول الثالث فضعيف ايضاً لان السجود لا نشأ
انه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الارض فوجب ان يكون
في اصل اللغة كذلك لان الاصل عدم التغيير الخ وفي تفسير المذاكر
الجمهور على ان المأمور به وضع الجبهة على الارض وكان السجود تحية
لآدم عليه السلام في الصحيح اذ لو كان لله لما امتنع عنه ابليس وكان
سجوداً التحية جائز فيما مضى الخ فوضع من ذلك ان سجود الملائكة
لآدم عليه السلام وسجود الاخوة ليوסף عليه السلام كان على وجه
الحقيقة بقصد التعظيم لا الانقياد والخضوع والاختناء ولا عبادة الله -
تعالى بحملها قبلة للسجود له تعالى بهذا تبين بطلان ما قال في

له قوله فوجب الخ لما تقرر ان اصل اللغة يجب ان يكون موافقاً للشرع والسجود في
الشرع وضع الجبهة على الارض علم ان مافي مناظرة فيني من قوله ان سجود الملائكة لآدم
وسجود الاخوة ليوסף يحتمل كونه على وجه الاختناء كما في الجلالين او الخضوع
كما في بعض من التفاسير ضعيف مرجوع لا يصح التمسك به (قول مغنى) ١٢

التنقيحات السنية سبحة تحيت اور عبادت دونوں کا احتمال ہے تحیت ہونا متعین نہیں
تمسکاً بما فی شرح المواظف من قوله اذ يجوز ان يكون سجودهم لله تعالى وادم
عليه السلام كان كالقبلة لهم الخ وانت تعلم ان القول المروج كالمنسوخ فتعين
كونه لآدم عليه السلام تحية له على هذا الواحتمل كونه تعبدية
كما زعم صاحب التنقيحات السنية وتبعه صاحب المناظرة فيني لزم ان
يحتمل كون آدم عليه السلام معبوداً للملائكة وهم امروا بسجود العباد
له نعوذ بالله من ذلك فعم ان سجود الملائكة لآدم عليه السلام ما كان تعبدية بل كان
اكرامياً ومعنى انهم امروا بالسجود اى السقوط على الارض بالصاقهم الجبا ١٤

بها الأكرام آدم عليه السلام والسقوط كذلك للتعظيم لا يمتنع بعض الأوقات
لما في التفسير الكبير لم يمتنع بعض الأوقات سقوط الإنسان بالصاقه
الجبين ضرباً من التعظيم وهذا السقوط وإن كان في يادي النظر
سجوداً من حيث أنه يوجد فيه وضع الجبهة على الأرض لكنه في الحقيقة
ليس بسجود عند الشرع لما علمت أن السجود الشرعي هو السجود الذي
يكون فيه قصد العبادة لله تعالى مع ذلك يشترط فيه أن يكون إلى جهة
القبلة والسجود الشرعي مختص لله تعالى لا هذا السقوط ولما لم يكن هذا
السقوط في الأصل سجوداً غيره الله بالخروج في قصة يوسف عليه السلام
بقوله خَرُّوا لِي سَجْدًا أو يقال لهذا الخروج ديناً في عرف البنجاله و

قول مفتعين إلى هذا رد على مافي مناظرة فيني من قوله اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
وعصوا من جاز سجد تحية ثابتة ليس يرتأى كونه بعض مفسرين اس سے سجد عبارت مراد
لئے ہیں إلى قوله فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وجه الروايات لما تعين كونه
سجود تحية لم يبق معنى كونه سجود عبادة على ما هو الاصح فلا يصح القول -
ببطلان الاستدلال بالنظر إلى ذلك
(قول مفتي بجيد الأكبر)

واصل العرف به امر الملائكة بذلك وقد تعرف بذلك الامر في كل زمان من الازمنة
فهو في الأصل من اعمال اهل القصور والظواهر والتدليل اعتذاراً عما يقع منهم لكن لما
كان في ضمة معنى التعظيم يستعمل محل التحية والسلام وكان ذلك واجباً على الملائكة
بحكم الامر فان الامر للوجوب في جميع الاديان بل عند الملائكة ايضاً ولا يمكن ان لا يلبس
لعيناً بترك الاستكبار عنه وانما اوجبه الله تعالى عليهم تعظيماً لآدم عليه السلام
لما له عليهم من الشرف بالخلافة وحق التعليم الذي يوجب التعظيم لديه فمعنى
قوله تعالى اسجدوا لآدم واسقطوا لآدم على الأرض بالصاق الجبين بها

تعظيم الله فلما كان ذلك الامر للوجوب صار الملائكة مكلفين بوجوب ذلك السقوط عليهم فان معنى التكليف ايجاب المامور به على المامور وقد وجد هذا المعنى بذلك الامر فهو خطاب الله تعالى المتعلق بافعالهم اقتضاء والخطأ الاقتضائي يفيد الوجوب وانت تعلم ان كلامي يفيد الوجوب على المكلف به فهو امر تكليفي لكن ان اريد من ذلك الخطاب الكلام النفسى الخطاب - الأزلى القديم يكون التكليف به الزلماً من حيث انه يفهم فحينئذ يكون تعلقه بافعال المكلفين تعلقاً عقلياً فيما لا يزال لا تنجزياً فيما يزال من حيث انه افهم فان التعلق التنجزى بهذا المعنى بفعلهم حادث وقيام - الحوادث بالقديم الأزلى ممنوع والمعدوم يجوز ان يكلف بالامر باعتبار تعلقه بفعله بعد وجوده تنجزياً كما في الأصول

قوله المعدوم يجوز ان هذا دفع لما يرد على تكليف المعدوم تنجزياً بان الافهم - بالفعل لا بد ان يكون في هذا التعلق وهو لا يجوز للمعدوم والجواب بجوز ان يكلف المعدوم تنجزياً بالامر باعتباره تعلقه بفعله بعد وجوده تنجزياً فالافهم ايضا يكون بعد وجوده والتنجزى شامل لكلا المعنيين ، القول المعنى بعبء الاكبر

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিজদা এর প্রকারভেদ ও বিশদ বর্ণনা

অনুবাদঃ নিঃসন্দেহে সেজদা দু'প্রকার যথা (১) সিজদায়ে ইবাদত অর্থাৎ ইবাদতের সিজদা তথা আল্লাহর জন্য বান্দার সিজদা এবং (২) সিজদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মান প্রদর্শনার্থে সিজদা। উল্লেখিত উভয় সিজদা পবিত্র কোরানের আয়াত দ্বারা ছাবিত আছে। সিজদায়ে ইবাদত সম্পর্কিত আল্লাহ পাকের বাণী, যেমন- আল্লাহ তা'লা বলেন, ওয়াহুদু লিল্লাহিল্লাযি খালাকাহুনা ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন (সূরা হা-মীম-সিজদাহ ৩৭ নং আয়াত) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে সজিদা করো, যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা খাস করে তারই ইবাদত তথা বন্দেগী কর, এ আয়াতে করিমা সজিদায়ে ইবাদত সম্পর্কে বিবৃত। আর আয়াতে ইনকুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন (অর্থাৎ যদি তোমরা খাস করে তাঁরই ইবাদত তথা বন্দেগী কর) আয়াতাংশটুকু দ্বারা ইবাদতের সজিদাকে বুঝায়।

দ্বিতীয়তঃ সজিদায়ে তাহিয়াহ সম্পর্কিত আল্লাহ পাকের বাণী, যেমন- আল্লাহ তা'লা বলেন, ওয়াইজ্জুলনা লিল মালাইকাতিহুদুলে আদামা ফাছাযাদু ইল্লা ইবলিস (সূরা বাক্বারা ৩৪ নং আয়াত) অর্থাৎ- যখন আমি (আল্লাহ) ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ

দিয়েছিলাম, তোমরা আদমকে সজিদা করো, তখনই সবাই সজিদা করেছিলো, ইবলিশ ব্যতীত। এ আয়াতে কারীমা সজিদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানী সজিদা সম্পর্কে প্রযোজ্য, কেননা ইবাদতের উদ্দেশ্যে আদায়কৃত সজিদা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে তথা মখলুকাতকে করা কুফুরী, আর আল্লাহর নির্দেশ কুফুরীর জন্য প্রবর্তিত নয়, যেমন- তাফসীরে কবীরে উল্লেখ রয়েছে, “সমস্ত মুসলমানগণ ফিরিশতা কর্তৃক আদম (আঃ) কে সজিদা করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ঐ সজিদা ইবাদতের সজিদা ছিল না কেননা ইবাদতের সজিদা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের জন্য কুফুরী, আর আল্লাহর নির্দেশ কুফুরীর জন্য প্রবর্তিত হয় না।

টীকার অনুবাদ : এ বিষয়ে (চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক মুফতী) জনাব ফয়েজ উল্লাহ সাহেব অবশ্যই মারাত্মক ভুল করেছেন যা তিনি তাঁর রচিত “আল্ ফাইছালাহ” নামক রেছলায় বলেছেন। তিনি বলেছেন, সজিদা তিন প্রকার। যথা- (১) সজিদায়ে ইবাদত, (২) সজিদায়ে তাজিম ও (৩) সজিদায়ে তাহিয়াহ। সজিদায়ে ইবাদত নৈকটোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে; সজিদায়ে তাজিম তাজিমের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে যা সম্মানার্থে দাঁড়ানোর পরিবর্তে এবং সজিদায়ে তাহিয়াহ ছালামের পরিবর্তে।

আল্লাহর কোরআনে তিন প্রকার সজিদার কোন দলিল বা ভিত্তি নাই এবং সাথে সাথে নবী করিম (দ.) এর হাদীস শরীফেও নেই। সম্মানার্থে যে দাঁড়াতে হয় তা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ আছে। অতএব তাঁর কথা সজিদায়ে তাজিম যে সম্মানার্থে দাঁড়ানোর পরিবর্তে তা স্পষ্ট বাতিল। হ্যাঁ যদি সম্মান আল্লাহ পাকের সম্মানের মত হয় তবে ঐ ধরনের সজিদা করা ইবাদতের হবে এবং ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে করা কুফুরী এবং শিরিক। আর যদি ঐ রকম না হয়, তা হবে তাহিয়াহ। আর সেই সজিদায় তাহিয়াহর হুকুম সম্বন্ধে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসতেছে।

“তাফসীরে মুয়ালেমুত তানজীল” এ উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর বাণী “ওয়াজযুদু” তথা আদম (আঃ) কে সজিদা সম্পর্কে দু’টি অভিমত ওলামায়ে কেরামগণ থেকে বিবৃত আছে। বিশুদ্ধ অভিমতটি হচ্ছে আদম (আঃ) এর জন্য সজিদাটি প্রকৃতপক্ষেই ছিল কিন্তু আদম (আঃ) কে ফিরিশতাগণ যে সজিদা করেছেন তা সজিদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানের সজিদা ছিল। ইবাদতের সজিদা ছিল না। এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, সজিদার দু’টো দিক রয়েছে- একটি ইবাদত সম্পর্কিত, অপরটি সম্মানের বা তাজীমের সহিত সম্পর্কিত। সুতরাং সজিদায়ে তাহিয়াহ যেমন- আদম (আঃ) কে ফেরেশতাগণ করেছেন আর সজিদায়ে ইবাদত যা আল্লাহর জন্য খাস তথা নির্দিষ্ট এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাজদাতুত তাহিয়াহেবি মানজিলাতিস সালাম অর্থাৎ সজিদায়ে তাহিয়াহ সালামের মত।

আল্লামা আবিসুয়দের তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে, সজিদা মূলতঃ স্থির চিত্তে বিনয় প্রকাশ করা; আর শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের উদ্দেশ্যে কপাল নিচু করা তথা ঝুঁকানো। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ কর্তৃক ফেরেশতাদেরকে আদম (আঃ) কে সজিদা করার নির্দেশ প্রদান আদম (আঃ) এর সম্মানের বুজুর্গির ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচেনায় ছিল যা শিক্ষাদানের হক আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ফেরেশতাগণ তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে। আবার কেউ কেউ বলেন, সজিদা করার নির্দেশ আল্লাহ

তাঁদের জন্যই ছিল এবং আদম (আঃ) তাঁদের সজিদার কেবলা ছিল কিন্তু এ অভিমত দুর্বল, প্রথম বর্ণনাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

তফসীরে কবীরে বর্ণিত আছে, সজিদার তৃতীয় অভিমত হল অভিধানের ভাষায় সজিদা অর্থ অনুগত হওয়া ও আজিজী করা, তৃতীয় অভিমতটিও জয়ীফ তথা দুর্বল, যেহেতু শরীয়ত মতে সজিদার অর্থ ইবাদতের উদ্দেশ্যে মাটিতে কপাল রাখা, মূল অভিধানও তদ্রূপ অর্থ করা উচিত ছিল, কেননা আসলের কোন পরিবর্তন হয় না।

তফসীরে মাদারেকে উল্লেখ আছে যে, জমহুর ওলামায়ে কেরামগণ এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আদম (আঃ) কে সজিদা করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে সজিদা মাটিতে কপাল রেখে করা হয়েছিল, আর আদমকে ফেরেশতাগণের সেই সজিদা সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল। যদি তা আল্লাহর জন্য খাস হত, তাহলে ইবলিশ কখনো উহা আদায় করা থেকে বিরত থাকত না।

আর সজিদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানের সজিদা জায়েজ তথা শরীয়ত সম্মত। যা উপরে বর্ণনা করা হলো। আর এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আদম (আঃ) কে ফেরেশতাগণের দ্বারা সজিদা করানো এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ভাইগণ কর্তৃক সজিদা-এসব মূলত সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল। এটা আনুগত্যতা প্রকাশ, বিনয় বা আজিজী প্রকাশের উদ্দেশ্যে ছিলনা, আর আদম (আঃ) ও ইউসুফ (আঃ) কে যে সজিদা করেছিল তা তাঁদেরকে কেবলা সাব্যস্ত করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সজিদাও ছিল না। আর এতে করে তানকিহাতিচ ছুন্নিয়া'র সংকলক পেশকৃত সমস্ত দলিলাদি যে বাতিল তথা অগ্রাহ্য তা স্পষ্ট হয়ে গেল।

টীকার অনুবাদ : যখন বর্ণনা হল, অভিধানিক মূল অর্থ শরয়ী বা প্রচলিত অর্থের মধ্যে সম্পর্ক থাকা আবশ্যিক। শরীয়তের প্রচলিত অর্থে সজিদা হল ইবাদতের উদ্দেশ্যে মাটিতে কপাল রাখা। তার কথামতে আদম (আঃ) এর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক সজিদা করা এবং ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর ভাইদের সজিদা করা ও কপাল ঝুঁকিয়ে (টেকিয়ে) করা হয়েছিল যা তাফছিরে জালালাইনে আছে। অথবা (খুর্দ) খদ খাওয়া যা বিভিন্ন তাফসীরে আছে। ইহা দুর্বল; অগ্রহণযোগ্য বিষয় নিয়ে দলিল গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না। - (কাওলে মুগনি) - মাওলানা ওবাইদুল আকবর (রহ.) এম. এম.

(তানকিহাতিছ সুন্নিয়ায় বলেন) সজিদায়ে তাহিয়াহ ও সজিদায়ে ইবাদত উভয়ের দিকে আলোচ্য আয়াত শরীফের ভাবার্থের সম্ভবনা রয়েছে, শুধু সজিদায়ে তাহিয়াহ ব্যাপারে নির্ধারিত নয়। শরহেল মাওয়াকেফ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যদি তা গ্রহণ করে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ফিরিশতাগণের সজিদা আল্লাহর জন্যই হয়, আর আদম (আঃ) তাদের কেবলা হিসেবে সাব্যস্ত ইত্যাদি শেষতক। অথচ আপনি জানেন যে, অপ্রাধান্য সিদ্ধান্ত শরীয়তে মানসুখ তথা রহিতের মত, তাহলে এখন ফেরেশতাগণের সজিদা আদম (আঃ) এর জন্যই নির্ধারিত ছিল প্রকৃত পক্ষে সম্মান ও তাজিমের উদ্দেশ্যে, আর যদি কেউ ঐ সজিদাকে ইবাদতের সজিদা ধারণা করে থাকেন যেমন- তানকিহাতিচ ছুন্নিয়া কিতাবের সংকলক ও তার অনুসারীগণ ফেনী ধর্ম বিতর্ক সভায় এরূপ ধারণা পোষণ করেছিল। তাদের এ ধারণা দ্বারা এটা স্পষ্ট ও আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে, আদম (আঃ) ফেরেশতাগণের মা'বুদ তথা উপাস্য ছিলেন এবং মহান রাক্বুল আলামীন ফিরিশতাগণকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আদম (আঃ) কে

না এবং সে অহংকার প্রকাশ করতো না, অথচ আল্লাহ তা'লা তাঁদের উপর আবশ্যক করেছেন আদম (আঃ) কে সম্মান করার জন্য, কারণ আদম (আঃ) আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি হিসেবে ফিরিশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, শিক্ষাদানের অধিকারের দিক দিয়ে কেননা প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষাদাতাকে সম্মান করা আবশ্যিক। আল্লাহ তা'লার বাণী উছ্যুদুলে আদামা অর্থ তোমরা আদমকে সজিদা কর অর্থাৎ তোমরা আদমের সম্মানে নতজানু হয়ে কপালকে মাটিতে পতিত কর। আর আল্লাহর এ নির্দেশ যখন ওজুব তথা আবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচিত, তখন সমস্ত ফিরিশতাগণ মোকাল্লেফীন তথা মান্যকারী হয়ে গেল, আর এ ছুকুত তথা পতিত হওয়াকে আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করল।

‘তাকলীফ’ তথা মান্য করার অর্থ হল নির্দেশিত বিষয়কে প্রাপ্তগণ আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করা; আর এ অর্থ ঐ মামুর তথা নির্দেশ প্রাপ্তদের মাঝে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়; কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ এবং এ নির্দেশের সাথে তাঁদের কাজের বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। আর “খিতাবে ইকতেযায়ী” তথা প্রয়োজনীয় সম্বোধন যা আবশ্যকতার ফায়দা প্রদান করে; আর আপনিও অবগত আছেন, প্রত্যেক আমর তথা নির্দেশ আবশ্যকের ফায়দা দেয় তথা আবশ্যক হওয়া চায় নির্দেশ প্রাপ্তদের তথা যার উপর নির্দেশ প্রদান করে তার থেকে। আর এ জাতীয় আমরকে “আমরে তাকলীপি” বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের এ খিতাবকে তথা সম্বোধনকে যদি শুধুমাত্র ‘কালামে নুপুছি’ হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে ঐ খিতাব তথা সম্বোধনটা আজলী এবং কদীম হিসাবে সাব্যস্ত; আর এ খিতাবের তথা সম্বোধনের উদ্দেশ্য নির্দেশ প্রাপ্তগণ যারা এটা পালন করবে, তাদের পালন করাটা আজলী বলে বিবেচিত হবে, এ হিসেবে যেন তা অনুধাবন করা যায়; আর তখন ঐ খিতাব এর সম্মান মোকলিফীন দের তথা মান্যকারীদের কাজ কর্মের সাথে; আর এ সম্পর্ক আকলী হিসেবে নির্ধারিত।

টীকার অনুবাদঃ

কাউলিহি আল মাদুম।

ইহা রহিতকরণ যখন ‘তাকলীপে মাদুম’ তথা এমন সব বিধান যা বর্তমানে প্রচলিত নয় তা মূলতঃ জায়েজ, কেননা কার্য বাস্তবায়নে তা জায়েজ বুঝায়। এই জাতীয় সম্পর্ক দ্বারা আবশ্যক হয়, অথচ ইহা ‘মাদুম’ বিধানের জন্য জায়েজ নহে। ইহা জায়েজ হওয়ায় যখন মাদুম বিধান জায়েজ হিসাবে আদায় করা হয় নির্দেশের দ্বারা এই হিসেবে যে তার সম্পর্ক কার্যকারণ দ্বারা, তখন এই বিধানের অজুদের বৈধতা থাকে এবং বোধগম্যতা ও ইহা অস্তিত্ব পাওয়া যাওয়ার পর উপরন্তু তানজীজি উত্তম অর্থকে অর্ন্তভুক্ত করে।

কাউলে মোগনী-মমতাজুল মোহাক্কেসীন মাওলানা ওবাইদুল আকবর (রহঃ) এম এম

هذه الامور سواء كان بتوسط النبي صلى الله عليه وسلم او بلا توسطه فقد وجد -
 معنى التشريعي والايجاب بالامر تكليف الايرى ان امر صلواتم مثلاً تشريعي بتوسط
 نبياً صلى الله عليه وسلم في حق الامم اما في حق نفسه فليس بتوسط نبي آخر
 مع ذلك تشريعي في حق نفسه ولا معنى لتوسطه في حق نفسه في كونه مكلفاً
 بالوامر فانه لا يجوز ان يتوسط احد بنفسه في ثبوت حكم شرعي له ولو سلم ان
 التشريعي يشترط فيه ان يكون بتوسط النبي صلى الله عليه وسلم وفي التكليف
 لا يشترط ذلك لكن لما كان كل منهما من حيث كونه خطاب الله في اصل
 التكليف اى في افادة الوجوب سواء والوجوب حكم شرعي علم انه لا فرق بين
 التكليف بتوسط النبي صلى الله عليه وسلم وبين التكليف بلا توسط بل ما لهما
 واحد فيكون لكل منهما حكم الاخر على هذا يكون امر الملائكة بالسجود لادم عليه السلام
 داخل تحت شرع من قبلنا فيكون حجة لنا فعلم ان جميع ما في القرآن المجيد -
 سواء كان من القصص والاحكام دليل لنا في ثبوت الحكم الشرعي به فما
 ثبت به يكون من الشرعيات فظهر ان امر السجود للملائكة امر تشريعي
 والاحتجاج به صحيح لهذا احتج به في التفسير الكبير حيث قال اجمع
 المسلمون على ان ذلك السجود ليس للعبادة لانه كفر والامر لا يرد بالكفر
 وايضا احتج به قاضيان في فتاويه حيث قال اما اذا سجد للسلطان
 للتحية والتعظيم لا يكون ذلك كفراً واصداً امر الملائكة بسجود ادم عليه السلام
 وسجود الاخوة ليوسف عليه السلام بل احتج به عامة الفقهاء والمفسرين
 كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه والتفسير فلما علم ان الاحتجاج بامر
 الملائكة بالسجود صحيح لنا ولا يتوقف صحة هذا الاحتجاج على كون
 ادم عليه السلام نبياً للملائكة ولا يشترط في كون الامر تكليفاً بل
 تشريعياً ان يكون بتوسط النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهر بطلان ما في

التنقيحات من قوله ان ذلك الامر مركوبي لا تشري لان آدم عليه
 السلام ما كان نبيا للملائكة في الجنة وهم لم يكونوا أمما له حين امره بالسجود
 له وبذلك شرع من قبلنا بعد نبوة آدم عليه السلام ونبوته بعد هبوطه في
 الارض من الجنة الى ما اورد فيهما من الدلائل في اثبات هذه الدعاوى لاطائل
 تحته سند كرفيما يأتي حاصل ما في الباب ان خطاب الله من حيث كونه كلاما
 نفسها لفظيا متعلقا بفعل المكلفين يتعلق تنجيز حكم تشريعي والتشريعي
 ان كان فيه اقتضاء الفعل من المكلفين ولو ضمنا فتكليفيا والا فتخييري فوضع
 ان الحكم التشريعي هو الخطاب التكويني وانما الفرق بينهما من حيث القام
 والحدوث ومن حيث التعلق بفعل المكلف نعم التكويني الذي ليس فيه تعلق
 بفعله بل يتعلق بايجاد الكائنات نحو كن فليس من التشريعي ولا كلام فيه والتكليف
 قسم من التشريعي وامر للملائكة بالسجود تكليفيا فيكون من التشريعي بالضرورة
 لان المقسم معتبر في الاقسام ولما كان ذلك الامرا امر تكليفيا وموجب الامر
 التكليف هو الوجوب والوجوب حكم شرعي ثبت ان ذلك الامر من
 الشرائع وان لم يكن بتوسط النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو لم يكن
 شرعيا لزم ان يبطل الخطاب به بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو على
 وجه الحكاية فعلم انه من شرع من قبلنا من حيث انه قصده الله تعالى
 في كتابنا فيثبت به الحكم الشرعي الا يرى ان المراد من شرع من قبلنا
 ليس جميع شرائعهم بل ما قصده الله تعالى منها وقد قص الله تعالى
 بذلك الامر فيصح الاحتجاج به بان السجود لا دم عليه السلام لما كان
 واجبا على الملائكة بالامر التكليف في علم انه مباح في اصله فانه لو كان
 حراما في اصله لم يجز ان يكلف الله الملائكة به بلا ضرورة داعية
 اليه فان المحظورات لا يجوز ان تباح من غير ضرورة ولا ضرورة في تكليف

الملائكة بسجود آدم عليه السلام كما لا يخفى فلما كان مبأخا في الأصل قد وجب على الملائكة بالامر مستقط عنهم الوجوب بعد ما سجدوا له امتثالاً للأمر لأن الأمر المطلق لا يحتمل التكرار لكن بقي إباحته الأصلية بل بقي استحبابه فان أدنى الواجب بالأمر الاستحباب حتى لو كانوا مسجدين وال مرة ثانية كان ذلك السجود مستحباً لهم ولا يلزم من ذلك تكرار الأمر المطلق وإنما يلزم ذلك إذا حكم أنهم اتوا مرة ثانية بما وجب عليهم من المأمور به وليس الأمر كذلك بل إنما يحكم بأنهم اتوا بمستحب من المستحبات أو مباح من المباحات فلم يلزم تكرار الأمر المطلق بهذا الظاهر بطلان ما في التنقيحات

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তায়াল্লুকাতের প্রকারভেদ ও আমরে তাকবীনি ও তাশরীয়ীর বিশদ বর্ণনা
 অনুবাদ : অতএব পরিস্কারভাবে জানা গেল, তায়াল্লুকাতে দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) তায়াল্লুকে আকলী ও (২) তায়াল্লুকে তানজিজী; আর উত্তম প্রকারের তায়াল্লুক মহান আল্লাহ তা'লার প্রত্যেক খিতাবে তথা সম্বোধনে বিদ্যমান আছে। উপরন্তু তায়াল্লুকে আকলী কালামে আযলী এর সম্পৃক্ত, আর তায়াল্লুকে তানজিজী এ খিতাব যার সাথে মোকাল্লেফীনদের ক্রিয়া কর্মের সম্পর্ক থাকার একত্রেজা চায়। সুতরাং ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ উছয়দুলে আদমা, যদিও তা খিতাবে আযলী, নফসী ও তাকবিনী হয় কিন্তু ইহার তায়াল্লুক তথা সম্পর্ক ফিরিশতাদের ক্রিয়া কর্মের সাথে হওয়ার ইকতেজা করে; তাহলে এ জাতীয় তাকলীপ তথা হুকুম পালন করা শরীয়ত মোতাবেক খুবই জোরালো, কেননা তাশরীয়ী তা তাকলীপি হতে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তায়াল্লুকে তানজিজী ও ওয়াজযী তাকলীপির অর্ন্তভুক্ত কেননা তাকলিফীর আভ্যন্তরীণ চাহিদাও উহা; যেমন-উসুলের কিতাবে বিদ্যমান আছে এবং আপনিও জানেন যে, 'আম' তথা ব্যাপক ছাড়া খাস তথা নির্দিষ্ট পাওয়া যায় না। সুতরাং যেখানে তাকলীপি বিধান পাওয়া যাবে, সেখানে তাশরীয়ী অবশ্য পাওয়া যাবে, এর বিপরীত নয়; তথা তাকলীপি তাশরীয়ীর অর্ন্তভুক্ত কিন্তু তাশরীয়ী তাকলীপির অর্ন্তভুক্ত নয়। আপনি কি দেখেন নাই, কুল্লি তাবয়ী এর অস্তিত্ব তার এককত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। যেখানে ঐ কুল্লির একক পাওয়া যাবে, সেখানে তাবয়ীও পাওয়া যাবে। এভাবে তাকলীপি বিধানের মধ্যে তাশরীয়ীকে আবশ্যকীয়ভাবে পাওয়া যাবে, কেননা তাকলীপি বিধানের হুকুম তাবয়ীয়ার মতই। তাহলে এখন সিদ্ধান্ত স্থির হল যে, "উছয়দুলে আদামা" অর্থাৎ তোমরা আদমকে সজিদা কর, আল্লাহর এ আমর তথা নির্দেশ তাকলীপি ও তাশরীয়ী হিসেবে পরিগণিত। আর এ বিশ্লেষণের দ্বারা ফাসেদ তথা বিভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেল যা আত তানকিহাতিচ ছুন্নিয়া কিতাবের সংকলক স্বীয় লেখনীতে উপস্থাপন করেছেন যে আল্লাহর 'উছয়দু' এ নির্দেশ আলমে মালাকুতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তার সম্পর্ক তাকবীনের সাথে, আর

অনকিহাতিচ ছুন্নিয়ার সংকলকের এ দাবী যে, আল্লাহর নির্দেশ তাকবীনী ছিল, তাশরীযী ছিল না, তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য ও বাতিল, কেননা আপনি জানেন যে, প্রত্যেক তাশরীযী আমর যা মূলতঃ খেতাবে আজলী ও তাকবীনী এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর যদি ঐ বিভাবের সম্পর্ক মান্যকারীর ক্রিয়া কর্মের সাথে সম্পর্কিত, এটাই একতাজারে তাশরীযী হিসেবে সাব্যস্ত। তিনি তাশরীযী ও তাকবীনির মধ্যকার পার্থক্য ছাবেত করার জন্য যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যেমন- মালাকুল মাউতকে ‘রুহ’ কবজ করার নির্দেশ দান করা, যা আততানকিহাতিচ ছুন্নিয়ায় আছে তা আর একটা ফাসেদ তথা অগ্রাহ্য প্রমাণ যা দ্বারা দ্বিতীয় ফাসেদ কে উপস্থাপন করা হয়।

আল্লাহর বাণী, ওয়াইজ কালা রাক্বুকা ইন্নি খালেকুন বাশারান মিন তিনিন, ফা ইজা চাওওয়াইতুহ ওয়া নাফাখতু ফিহে মিররুহী পাকায়ু লাহ সাজেদীন অর্থাৎ আপনি স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রভু বলল, নিশ্চয়ই আমি মৃত্তিকা থেকে বাশার সৃষ্টিকারী, যখন তা যথার্থ আকৃতিতে গঠিত হল, এবং আমি আমার রুহ উহার মধ্যে ফুঁকে দিলাম, তখন তারা সবাই সজ্জিদায় পতিত হল এবং “পাকাউ লাহ সাজেদীন” এটা আমরে তাকবীনি কিন্তু ঐ বিভাবের সম্পর্ক কেরেশতাগণের ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ততায়; আর আদম (আঃ) এর গঠন যথাযথভাবে অস্তিত্ব হওয়ার সাথে এবং আদম (আঃ) এর মাঝে আত্মাকে প্রবেশ করানো হল, আর এটাই তাশরীযী। সুতরাং আততানকিহাতিচ ছুন্নিয়ার প্রমাণ ইহা দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উভয়ের মাঝের পার্থক্য স্পষ্ট হল না। অতএব জেনে রাখুন, আমরা তাকলীপি ও আমরা তাশরীযীর মাঝে কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু তাই নয় এমনকি আমরা তাকবীনি ও উপর বর্ণিত আমরা তাকলীপি ও আমরা তাশরীযীর মাঝেও পরিবর্তন হয় না। যেমন- ধারণা পোষণ করেছেন আততানকিহাতিচ ছুন্নিয়ার সংকলক এই যে, আমরা তাকলীপি নবী ও রাসূল দ্বারা তাশরীযী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রাখেন না, কেননা তাশরীযী অর্থ বান্দাদের জন্য সুনির্ধারিত বিধান ছাবেত আছে, সেটা আমরা তথা নির্দেশ দ্বারা আবশ্যকীয় হিসেবে হউক বা উহা দ্বারা উত্তম আমল আদায় করা হউক বা গঠন প্রক্রিয়ার পদ্ধতি দ্বারা হউক। সুতরাং যদি এ সমস্ত আমরা সমূহ থেকে কোন আমরা নবীর মাধ্যমে বা নবীর মাধ্যম ব্যতীত পাওয়া যায় উভয়ই সমান কথা; আর এটাই তাশরীযী এর অর্থ। নির্দেশ দ্বারা আবশ্যকতাই হল “তাকলীপি”।

তিনি কি দেখেন নাই, তাশরীযী এর উদাহরণ যা “ছাল্লু” আমরা দ্বারা পরিবেশিত। আর উহা আমাদের নবী করিম (দ.) এর মাধ্যমে প্রকাশিত উম্মতগণের ব্যাপারে। আর ঐ “ছাল্লু” আমরা এর দায়িত্ব বরদার নবী করিম (দ.) নিজের জন্য নয় এবং ইহা অন্য কোন নবীর মাধ্যমেও প্রাপ্ত হয় নাই, তারপরও ইহা নবী করিম (দ.) এর জন্য তাশরীযী হিসেবে সাব্যস্ত। আর নবী করিম (দ.) এর মাধ্যমের দ্বারা তাঁর স্বীয় ব্যাপারে প্রয়োজ্য হবে না এমন নয় অথচ তিনি মোকাল্লেপ আল্লাহর বিধি নির্দেশাবলী দ্বারা। সুতরাং অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশ দ্বারা নবী করিম (দ.) এর ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম প্রয়োজ্য হবে না। যদিও এ কথা মানা হয় যে, তাশরীযী তথা শরীয়তের যাবতীয় বিধান নবী করিম (সাঃ) এর মাধ্যমে হওয়া শর্ত, আর তাকলীপি যার মধ্যে ইহা শর্তারোপ করা হয় নাই, কিন্তু তাদের উভয় তথা তাশরীযী ও তাকলীপি যা আল্লাহর সম্বোধন দ্বারা মূলতঃ তাকলীপি অধ্যাৎ সচরাচর ঐ খেতাব তথা নির্দেশাবলী যা দ্বারা আবশ্যকতার দিকে ধাবিত হয়, আর ওয়াজেব তথা আবশ্যক বিধান ইহাতো শরীয়তের হুকুম।

অতপরঃ জানা গেল, নবী করিম (দ.) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তাকলীপের নির্দেশাবলী এবং নবী করিম (দ.) ভিন্ন অন্য কোন উপায় প্রাপ্ত তাকলীপের নির্দেশাবলীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বরং উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং তাদের উভয় একের হুকুম অন্যের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। আর এতে করে ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ) কে সজিদা করার নির্দেশ আমাদের পূর্ববর্তী আশিয়া কোরামের শরীয়তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এটাই আমাদের জন্য দলিল স্বরূপ।

জানা গেল, পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা যা কিছু নাযিল করেছেন, যেমন বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী বা বিধানাবলীর হুকুম, সবগুলিই এক বরাবর আমাদের ধর্মে শরীয়তের আহকাম সমূহের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, আর পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা যা কিছু স্থিরকৃত ও সাব্যস্ত তা হলো শরীয়ত। এতে করে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ) কে সজিদা করার নির্দেশ, তা হলো আমরে তাশরীয়ী। আর সজিদায়ে তাহিয়াহ এর বৈধতার ব্যাপারে এ আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণ করা অধিকতর বিশুদ্ধ। আর এ কারণে তাফসীরে কবীরের গ্রন্থকার স্বীয় তাফসীরে দলিল হিসেবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, উম্মতে মোহাম্মদী এর ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ফেরেশতাগণ দ্বারা আদম (আঃ) এর প্রতি সজিদা যা ইবাদতের সজিদা ছিল না, কেননা ইবাদতে সজিদা ধারণা করা কুফুরী। আর আল্লাহর নির্দেশ কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তিত নয়। অনুরূপভাবে ফতোয়ায়ে কাজিখানে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদি সোলতান বা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানকে তাহিয়াহ তথা সম্মানের উদ্দেশ্যে সজিদা করা হয়, তা শরীয়তে কুফুরী হিসেবে গণ্য হবে না। আর এ মাছায়ালার বৈধতায় তিনি উপমা ও আসল হিসেবে ফেরেশতা কর্তৃক আদম (আঃ) কে সজিদা করার পর ইউসুফ (আঃ) কে ভাইগণ কর্তৃক সজিদা করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন এবং এ আয়াতদ্বয় দ্বারা ফোকাহায়ে কেরাম ও মোফাচ্ছেরীনে কেরামগণ দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

যারা ফিকহ ও তাফসীরের কিতাবাদি বিশদভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের নিকট ইহা অস্পষ্ট নয়। উপরন্তু যখন জানা গেল যে, ফিরিশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আদম (আঃ) কে সজিদা করা, যা উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা তা আমাদের শরীয়তে বিশুদ্ধ হিসেবে দলিল গ্রহণ করা হল, আর এ দলিলের বিশুদ্ধতার জন্য আদম (আঃ) ফিরিশতাগণের নবী কিনা তার উপর স্থির থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই আর শর্তারোপ করা হয় নাই যে, এ আমর তথা নির্দেশ তাকলীপি হবে বরং তা আমরে তাশরীয়ী যা নবী করিম (দ.) এর মাধ্যমে হয়। সুতরাং তানকিহাতিচ ছুন্নিয়ার সংকলকের দাবীকৃত দলিল বাতিল বলে প্রকাশ্য হয়ে গেল। তিনি বলেন, ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ইহা আমরে তাকবীনি, তাশরীয়ী নয়, কেননা আদম (আঃ) বেহেশতের মধ্যে অবস্থানের সময় ফেরেশতাদের নবী হিসেবে ছিলেন না, আর ফেরেশতারাও তাঁর উম্মাত ছিলেন না। যখন তাঁদেরকে সজিদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আর আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রারম্ভ আদম (আঃ) এর নবুয়তের পর থেকে এবং আদম (আঃ) এর নবুয়ত বেহেশত হতে পৃথিবীতে অবতরণ করার পর হতেই পরিগণিত ইত্যাদি। আর তানকিহাতিচ ছুন্নিয়ার সংকলক স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখিত যুক্তির স্বপক্ষে কোন দলিলাদি উপস্থাপন করেন নাই এর বিপরীতে আমি বিশদভাবে তুলে ধরব, অতি শীঘ্রই উল্লেখ

আল্লাহর খিতাব তথা নির্দেশ কালামে নফসী যা শাব্দিকরূপে বিরাজিত এবং নির্দেশ প্রাপ্ত তথা মোকাল্লেপদের কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং শরীয়তের হুকুমের আবশ্যকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর তাশরীযী বিধান, যাতে মোকাল্লেফীনগণের নিকট থেকে ইকতেজায়েফেল তথা কর্মের বাস্তবায়ন চায়। যদিও সে চাওয়াটা আভ্যন্তরীণভাবে হউক, আর ইহা আমরা তাকলীপি হউক। আর এভাবে না হলে তা তাশরীযী বিধানে তাকলীপি তাশরীযী নামে খ্যাত।

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল, শরীয়তের হুকুম, সেটা মূলতঃ খিতাবে তাকবীনি, আর তাকবীনি ও তাশরীযীর মধ্যে পার্থক্য, কুদুম তথা স্থায়িত্ব আর হুদুস তথা স্থায়িত্ব নয় এদিক দিয়ে এ হিসেবে মোকাল্লেপের কর্মের সম্পর্কটা উত্তম। আর তাকবীনি, এ খিতাব, যার মধ্যে মোকাল্লেপের কর্মের সম্পর্ক থাকে না। বরং আমরা তাকবীনি এর সম্পর্ক সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- আল্লাহর নির্দেশ “কুন” আর ইহা তাশরীযী বিধান ও নির্দেশ নয়, এতে কারো দ্বিমত নেই। আর আমরা তাকলীপি, ইহা তাশরীযী বিধানের একটা প্রকার বা রূপ এবং ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ) কে সজ্জিদা করার নির্দেশ তাকলীপি, সুতরাং তাকলীপি তো তাশরীযী এর এক প্রকার তাহলে ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ) কে সজ্জিদা করার নির্দেশ তাশরীযী হিসেবে বিবেচিত, কেননা মোকাচ্ছম তার প্রকার সমূহের মাঝে প্রযোজ্য। উপরন্তু যখন ফেরেশতাদেরকে সজ্জিদার নির্দেশ আমরা তাকলীপি হিসেবে সাব্যস্তকৃত এবং আমরা তাকলীপি আবশ্যকতাকে চায়, আর এ আবশ্যকতা “ওয়াজেব” এবং “ওয়াজেব” ইহা শরীয়তের হুকুম। সুতরাং এখন বুঝা গেল, ঐ নির্দেশ শরীয়তের অর্ন্তভুক্ত যদিও তা নবী করিম (দ.) এর মাধ্যমে প্রবর্তিত হয় নাই। পক্ষান্তরে যদি এই সজ্জিদার নির্দেশকে শরীয়ী হিসেবে গ্রহণ করা না হয়; তাহলে মহান রাক্বুল আলামীনের এই আয়াতে করিমা যা নবী করিম (দ.) নিকট অবতীর্ণ করা হল, তা বাতিল বলে গণ্য করা হবে; যদিও তা ঘটনা বর্ণনার হিসেবে হয়।

জেনে রাখুন, ইহা আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তের ঘটনা, তথাপি মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের কিতাবে তথা কোরআনে এ ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন। আর এ আয়াতে করীমা দ্বারা শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত করা হয়। তিনি কি দেখেন নাই, আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের পূর্ণাঙ্গ বিধি বিধান আমাদের নবী করিম (দ.) নিকট ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ) কে ফেরেশতাগণ যে সজ্জিদা করেছিলেন তা ওয়াজিব বলে খ্যাত, আর ইহা আমরা তাকলীপি এর অর্ন্তভুক্ত।

জেনে রাখুন, সজ্জিদা তাহিয়াহ মূলতঃ মোবাহ তথা শরীয়তে বৈধ। উপরন্তু ইহা যদি মূলতঃ হারাম হত, তাহলে ফেরেশতাগণ কখনও হারাম কাজ আদায় করার জন্য আদিষ্ট হতেন না, কেননা মাহজুরাত তথা সীমাবদ্ধ বিষয় প্রয়োজনের কারণ ব্যতিরেকে বৈধ হবে না। আর ফেরেশতাগণকে আদম (আঃ) কে সজ্জিদা করার জন্য তাকলীপি দেওয়া অবশ্যক ছিল না, যেমন-তা অস্পষ্ট নয়। মূল তঃ সজ্জিদা তাহিয়াহ যখন মোবাহ তথা শরীয়তে বৈধ, আর এ সজ্জিদা ফেরেশতাদের উপর ওয়াজিব ছিল আল্লাহর নির্দেশের পরিত্রেক্ষিতে এবং ফেরেশতাগণ আমের তথা নির্দেশ দাতার হুকুম পালন তথা সজ্জিদা আদায় করার মাধ্যমে ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত হল, কেননা আমরা মতলক তথা সাধারণ নির্দেশ বারংবার কাজের বাস্তবায়ন চায় না। কিন্তু ঐ আমাদের মূল

বৈধতা “এবাহাত” হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায় বরং উহার মোস্তাহাব অবশিষ্ট থেকে যায়; উপরন্তু আমার তথা নির্দেশ পালনের আবশ্যিকতার সর্বনিম্ন স্তর হল “ইস্তেহবাব” তথা পছন্দনীয়; এতে করে ফেরেশতাগণ যদি আদম (আঃ) কে দ্বিতীয়বার সজিদা করতঃ তাহলে ঐ সজিদা তাঁদের জন্য দ্বিতীয়বার আদায় করা মোস্তাহাব হিসেবে পরিগণিত হত। আর এ দ্বিতীয়বার আদায় করা দ্বারা “আমরে মোতলাক” বারংবার হিসেবে পরিগণিত হত। আর এ দ্বিতীয়বার আদায় করা দ্বারা “আমরে মোতলাক” বারংবার হওয়া ও আবশ্যক হয় না। আর আমরকে আবশ্যক করতঃ যদি তাঁদেরকে আদেশ করত তাহলে তাঁরা দ্বিতীয়বার ওয়াজিব বিধান হিসেবে আদিষ্ট ব্যাপার হিসেবে আদায় করত। আর আমার অনুরূপ হয় না বরং তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন একটা মোস্তাহাব কাজ পালন করে বা অনেকগুলি মোবাহত থেকে যেন একটি মোবাহ পালন করে।

সুতরাং এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, “আমরে মোতলাক” তাকরার তথা বারংবার হওয়াতে আবশ্যক হয় না আর এতে করে আততানকিহাতিচ ছুনিয়ার গ্রহাণুকারের দাবী বাতিল বলে স্পষ্ট হয়ে গেল।

من قوله استدلالاً بما باحتساجه تحية إسبرو توفى به كراهية مطلقاً مفيداً تكراراً هو، الخ
 فان الاستدلال على إباحة السجود واستحبابه لا يتوقف على كون الأمر
 مفيداً للتكرار فإنه على تقدير كونه مباحاً أو مستحباً ليس بما موربه حتى
 يلزم ذلك المحذور بالاستدلال على إباحته واستحبابه بل إنما يلزم
 إذا استدلل على بقاء الوجوب بالأمر ولا قائل أحد بذلك فلماذا ذلك -
 الأمر على كون السجود مباحاً في الأصل لكن فيه معنى الاستحباب من
 حيث كونه تحية بحكم الأمر والتحية مسنونة في كل زمان بل عند الملائكة
 أيضاً بقي ذلك الحكم لغير الملائكة بل للملائكة بعد سقوط الوجوب

قوله بل بقي استحبابه: إلا لما كان استحبابه تأكيداً لما مضى سجد يعقوب ونبوة يوسف
 عليه السلام نظراً لبقاء ذلك الاستحباب فلا حاجة إلى ورود الأمر لهم بالسجود بهذا
 ظهراً بطلان ما في مناقرة فيني من قوله أو ظاهر به كراهية أن يكون له سجد
 كرهى حتى تعالى كرهى الربى وبطلان غير خفى على أحد فان الأمر المستحب
 بل المباح يجوز أن يختار من غير ورود الأمر بها فلما اختاروا إلى بقى نديه
 به في شريعته مما لنا الاحتجاج به كما هو ظاهر ١٢
 قول المغنى لتعبد الأكبر

عنهم بالامتثال به مرة علم أن ذلك السجود غير مختص لأدم عليه السلام في مرتبة
 إباحته واستحبابه وإن كان مختصاً له في مرتبة وجوبه على الملائكة وكون
 المباحات والمستحبات مختصة ببعض دون بعض مما لا وجه له أصلاً ونظيره
 في شرعنا صلوة التهجد فإنها كانت فريضة على نبينا صلى الله عليه وسلم بحكم الأمر
 في قوله تعالى فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ^{إلا} فهي في مرتبة الوجوب مختصة
 له وفي مرتبة الندب غير مختصة له ونظيره في شرع من قبلنا صوم الأيام
 البيض فإنه كان مفروضاً على أنبياء أدم عليه السلام وبقى مندوباً لغيره فلما كان
 ذلك السجود بالنظر إلى أنه مباح في أصله غير مختص لأدم عليه السلام
 مع هذا لما كان فيه معنى الاستحباب من حيث كونه تحية بحكم الأمر كان

تحية الملوك بذلك السجود مندوبه في شرع من قبلنا وقع التصريح به في
عامّة التفاسير قال ابن جرير الطبراني في تفسيره اتى يعقوب وبنوه ودخلوا
على يوسف عليه السلام فلما راواوه وقعوا سجوداً وكانت تلك تحية الملوك
في ذلك الزمان **الزوفي** التفسير الزاهدي وتحية الامام افضلية بالسجود
كالسلام لم نعلم ان سجود الاخوة ليوسف عليه السلام كان على وجه التكرمة
له لا سجود الشكر لله تعالى بوجدانه كما زعم صاحب التنقيحات اعتمداً
على ما في التفسير الكبير من قوله ان المراد بهذه الآية **أَنَّهُمْ خَرُّوا** اى
لاجل وجدانه **سَجْدًا** لله تعالى **حاصل** الكلام ان ذلك السجود كان
سجود الشكر لله تعالى، فالسجود هو الله تعالى الا ان ذلك السجود انما
كان لاجله **الزوفي** وهذا القول ضعيف كما ان القول بكون آدم عليه السلام
قبله اسجود الملائكة ضعيف وقد اوضحناه وقوله تعالى **رَأَيْتُمُ لِي**
سَاجِدِينَ **الزوفي** على ان سجود الاخوة انما كان لتعظيم يوسف عليه
السلام لا للشكر لله تعالى بوجدانه فان الضمير المجرور فيه للاختصاص
ثم تقدّم على ساجدين اختصاص خريفهم منه انه كان ذلك السجود له
لا لله تعالى شكر بوجدانه على هذا يكون اللام في قوله تعالى **خَرُّوا لَهُ سَجْدًا**
ايضاً للاختصاص لا بمعنى الاجل فانه لو كان بمعنى ويكون المعنى لاجل وجدانه
يلزم ان لا يكون لكيد الاخوة معنى فانه على هذا التقدير يكون السجود لله وهو
لا يصح لكيد الاخوة وقد قال الله تعالى حكاية من قول يعقوب عليه السلام
قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ اخَوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا **الزوفي**
نكيد الاخوة لاجل السجود ينادى بانه كان لتعظيمه لا لشكر الله تعالى
بوجدانه بهذا اسقط ما في التنقيحات السنية من قوله **اورا** اسكى علاوة اس
میں سب سے شکر اور تصدیق روایوں یوسف علیہ السلام بھی جاری ہے یعنی یوسف کے

سأتمم فمقص به وهذا السجود اى سجود الاخوة ليوسف عليه السلام ولو سلم انه يحتمل أن يكون لتأويل رؤياه وتصديقها لكنه مع هذا الاينام في كونها لأكرامه فان ما يرى في عالم المنام لو تحقق في عالم اليقضة يقال لما تحقق في عالم اليقضة تأويله فالتأويل بهذا المعنى لاينام في كونه للاكرام فانه قد كان رأى في المنام ان اخوته يعظمونه بالسجود وقد تحقق الاكرام له منهم بالسجود في عالم اليقضة بعد ما حصلت له ولاية الجلوس على عرش الحكومة في ملك مصر فظهر انه لا تناقض بين السجود والتأويل الرؤيا وبين كونه للاكرام فتأمل وما صدر من نبينا ابراهيم عليه السلام من القصد لذبح ولده اسمعيل عليه السلام فلا يجوز ان يقاس عليه سجود الاخوة ليوسف عليه السلام كما وقع في التنقيحات فان ما كان رأى نبينا ابراهيم عليه السلام من انه يذبح ولده اسمعيل عليه السلام لم يكن في الحقيقة رؤيا يحتاج الى التأويل للتحقق بل كان عليه الامر بذبح ولده ابتلاء له في دعوى خلته له تعالى فما صدر منه بعد الرؤيا من القصد اى ذبح ولده لم يكن لتأويل رؤياه فان الرؤيا الصادقة لا تدخل في تأويلها للقصد والاختيار بمعنى ان ما يكون به تأويله يوجد من غير القصد اليه بل كان لتعميل ما امر الله به في المنام فذبح ولده كان حكماً متحتماً عليه فعمله به امتثال لذلك الحكم لا تأويل للرؤيا فبين ما رآه وبين ما رأى يوسف عليه السلام فرق بعيد فعلم ان ذبح اسمعيل عليه السلام كان ابتلاء محضاً له بحكم الامر في المنام ولو لم يكن ذلك لم يفطر الى ذبحه فان قتل الانسان وذبحه كان حراماً في شريعته ويجوز ان يجب ما يرى في المنام على الأنبياء ان كان من قبيل الاوامر فان رؤياه صادقة لا تدخل الموسوس فيها وما رآه نبينا ابراهيم

عليه السلام من هذا القبيل فلذلك اضطر الى ذبح السبعيل عليه السلام ففعل
امثال الامر فان الرؤيا من يوسف عليه السلام وعمل السجود من اخوته
وهم لم يروا في المنام انهم يسجدون لله والالئصه الله تعالى كما نص ما رواه -
يوسف عليه السلام فلما لم ينص به علم ان سجودهم لم يكن بامر الله تعالى ولو
في المنام بطريق الرؤيا وايضا لم يقصص يوسف عليه السلام رؤياه
عندهم قبل سجودهم لما منعه يعقوب عليه السلام عن ذلك فلم يكن عليهم بزيارته
اصلا فكيف يصح حمل سجودهم على تأويل رؤياه وهم يكونوا بها عالمين ولو سلم
انهم سجدوا له اتبا على يعقوب عليه السلام في سجوده له وهو كان يعلمها
لما من ان يوسف عليه السلام كان قد قص رؤياه عنده لكن لا معنى لسجود
يعقوب عليه السلام له لتأويل رؤياه على ان السجود لغير الله تعالى كان في
شريعة يعقوب عليه السلام حراما او جائزا على الاول يلزم تأويل الرؤيا
بالحرام وهو ممنوع والثاني اما ان يكون للعبادة او للتخية والاول كفر وتأويلها
بما هو كفر خلاف المعقول فتعين الثاني وهو المراد وايضا ان ابراهيم
عليه السلام ما رآه في منامه من ذبح ولده فهو عمل ابتلائي ولا معنى لابتلاء
يعقوب عليه السلام بسجود ولده كما كان في تقدير الله تعالى وارادته ذبح
اسماعيل عليه السلام بل كان امر ذبحه ابتلاء مختصا من غير ان يتحقق في الواقع
فلا يجوز ان يقاس عليه سجود اخوة يوسف عليه السلام وابويه له فانهم
سجدوا له في الواقع بهذا اظهر عدم صحة ما في التنقيحات من قوله
اور يوسف عليه السلام كما خواب سچ کر دکھانے کے لئے یعقوب علیہ السلام اور ان کے
اولاد ماورجئے الزوال دلیل علی انہم امروا بسجود یوسف علیہ السلام
بل انہما سجدوا له لكون تحية الملوك بالسجود في ذلك الزمان كما في
عامة التفاسير و تفسير حسيني مي گوید القصہ چون یعقوب علیہ السلام بہ نزد

ملك مصر سيد يوسف عليه السلام باملك ريان وتماي اشرف ممریان
 باستقبال پدر بیرون آمدن و یعقوب علیه السلام بافرزندان بر بالای تلی برآمده تفرج
 آن کوه و آراستگی می کردند و تعجب می نمودند جبرئیل علیه السلام فرود آمد، و
 یعقوب علیه السلام را گفت ازیں لشکر و تحمل عجب میداری بالا که که جنود ملک از
 زمین تا فلک تفرج آمده بشادی تو میتهج و مسرور اند چنانچه درین مدت از اندوه تو
 محزون و رنجور بودند پس یوسف علیه السلام چون پدر را دید از مرکب فرود آمد
 خواست که کند جبرئیل علیه السلام گفت بگذار تا پدر ترا سلام کند و در خبرست
 که یعقوب علیه السلام نیز پیاده شد و چون چشمش بر جمال یوسف علیه السلام افتاد
 گفت السلام علیک یا مذهب الاحزان هر دو دستهارا بگردن یکدیگر آورده از شادی
 می گریستند (الی قوله) چون بمصر آمدند به منزل خود فرود آورد و رفع ابویه علی -
 العرش برداشت پدر و خاله را یعنی بالا برد و بخت خود خروا له سجد ابروی -
 افتادند پدر و خاله و بر دران مرا و را در حالتیکه سیه کنان بودند و تحیت و تعظیم
 ایشان دران زمان سیه بود یوسف علیه السلام چون آن حال را مشاهده نمود
 اظهار سرت و بجهت فرمود و قال یا ایت هذا تأویل رؤیای من قبل و گفت
 یوسف علیه السلام این سیه شما را تعبیر خواب من است که دیدم پیش ازین در ایام صبا الو
 فقد وضح من ذلك ان یوسف علیه السلام لما اراد ان یسلم علی یعقوب علیه -
 السلام فی اول الملاقات منعه جبرائیل علیه السلام عن ذلك و قال
 لا تسلم فانه یسلم علیک فسلم یعقوب و بنوه علیه ثم لما جلس علی سریر سلطنته
 خروا له سجد ا فقال یوسف علیه السلام مبتهجا علیه یا ایت هذا تأویل رؤیای
 من قبل فقد استفيد منه ان الله اجتبى یوسف علیه السلام علی یعقوب علیه
 السلام و سائر نبيه علیهم السلام بل علی سائر الناس فی ذلك الزمان
 و دلیل اجتبى له منع جبرئیل علیه السلام له عن تسلیمة علی ابیه فلما کان

معظم الخلائق في ذلك الزمان صار مستحقاً لأن يُعظم يعقوب بالسلام
 في أوّل الملاقات وتعظيم الاب وان كان واجباً على الولد في شريعتنا لكن
 لا يعلم كونه واجباً على الولد في تلك الشريعة بل يعلم ان الابن ان كان
 له شرف سواء كان من حيث العلم او السلطنة او غيرها فهو كات
 مستحقاً لأن يُعظم أبوه والشرف كان ليوسف عليه السلام في ذلك الزمان لانه
 كان ملك مصر في ذلك الوقت مع هذا قد اوتي علم تاويل الرؤيا بل في شريعتنا ايضاً
 وصف العلم والخلافة فوق وصف الأبوة فإن الاب اذا كان جاهلاً والابن عالماً
 او خليفة فالشرف للابن والتقدم في الصلوة له والشرف لوصف الابوة في الظاهر
 ولو وصف العلم والخلافة من حيث المعنى ولما نظر يعقوب عليه السلام الى الشرف
 المعنوي وهو افضل على الشرف الظاهري سلم على يوسف عليه السلام في أوّل
 الملاقات وانما سلم ولم يسجد فيه لان اثر امرته لم يكن ظاهراً له في ذلك
 الوقت ثم بعد ذلك لما جلس يوسف عليه السلام على سرير سلطنته حصل
 له الدليل على خلافة فسجد هو ونبوة تعظيماً له فعلم ان سجود يعقوب عليه
 السلام وبنيه ليوسف عليه السلام معقول المعنى لا كما زعم صاحب -
التنقيحات : انه ليس معقول المعنى وايضاً ظهر من ذلك ضعف قول من
 قال لعل الفعل الدال على التحيّة والاکرام في ذلك الوقت هو السجود كان مقصود
 هم من السجود تعظيمه وهذا في غاية البعد لان المبالغة في التعظيم كان اليق يوسف
 عليه السلام منها بيعقوب عليه السلام فلو كان الامر كما قلتم لكان من الواجب أن
 يسجد يوسف ليعقوب عليهما السلام الز هذا القول انما يحتاج به اذا حصل
 الدليل على انه كان تعظيم الاب واجباً على الابن في تلك الشريعة ومعاملة
 يعقوب عليه السلام بيوسف عليه السلام يشهد بعدم وجوبه بل يشهد ان
 التعظيم لاهل الشرف سواء كان ابناً واباً ولو سلم ان التعظيم من الابن في كل

زمان الإلّاٰ لكن لا يلزم منه ان لا يكون سجود يعقوب ليوسف عليهما السلام بسجود
تحية وتعظيم فان التعظيم له وقد وجد منه بالسّلام في اول الملاقات كما
حلت وهو ليل على ان سجود له سجود تعظيم وتحية فان التعظيم منه بالسّلام
كما وجد اولاً يستدل به على ان سجود له اخراً ايضاً هو للتعظيم بهذا الظاهر -
بطلان مافي التفتيحات من قوله تحيت تو اول ملاقات بين دستور
جب اول ملاقات هو تو سجد کسی نے نہیں کیا جب يوسف عليه السلام
تخت پر بیٹھے اور باپ و ماں کو تخت پر بیٹھا باپ سجد کیا فرمائے سجدہ تحية کیونکر
ہوا، علی ان الناس لا يعظمون عادة لمن لا يكون عظمته في قلوبهم ومعظمه -
السلطين انما يحصل في القلوب غالباً اذا جلسوا على سرير سلطنتهم فحينئذ
يكونوا معظّمين للخلّاق فيعظمونهم بما يليق لشأنهم من ادب التعظيم بهذا الظاهر
سجودهم اى يعقوب عليه السلام وبنيه يوسف عليه السلام بعد ما جلس على
العرش وعدم سجودهم له في اول الملاقات لعل تعرفهم بكونه ملك مصر و
عظمته السلطانية لم يكن في قلوبهم حاصلًا في اول الملاقات فلذلك عظموه
بالسلام فيه ولم يسجدوا له فبعد ذلك لما جلس على السرير حصل لهم تعرفه
بذلك واستقرت شوكته في قلوبهم فوقعوا في السجود تعظيماً له في ذلك الوقت
وما حكى ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان يوسف عليه السلام لما رأى حاله
واقشع جلده ولكنه لم يقل شيئاً اذ لعل اقشع جلده بالنظر الى ظاهر الحال
لا بالنظر الى المعنى فلذلك لم يقل له شيئاً مما يدل على استكراهة السجود
بالا بهج به وقال بسرو عرضه حين رآه يا ابت هذا تأويل رؤياى من
قبل الخ واما سلموه اولاً ثم سجودوا اخراً يعلم منه ان في شريعته كان كل
من التحيتين تحية عموم الناس بالسّلام وتحية الملوك بالسجود بل رسم
التحية بالسجود والسّلام جار من الملائكة و ابى البشر اذ مر عليه السلام

رسم التحية بالسجود من الملائكة كما علمت ورسم التحية بالسلام من
 آدم عليه السلام لما أخرجه البخاري في كتاب بدل الخلق عن أبي هريرة
 رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله تعالى آدم وطوله ستون
 ذراعاً ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاسمع ما يحيونك
 به فإنه تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا عليك السلام
 ورحمة الله وبركاته إلا أنها مراد من عليه السلام على الملائكة في بدأ
 خلقه لأن الشرف الذي يستحق به للتعظيم كان في ذلك الوقت للملائكة
 ثم بعد ذلك لما حصل به شرف العلم وتعليم الانبياء للملائكة حصل فضله
 عليهم فهم أمروا بالسجدة له لأنه صار في ذلك الوقت حصل تجليات انوار
 الله وقد اجتباها وكساها خلعة القبول ، (شعر) از مثنوی شریف
 ہ آدمی چوں نور گیرد از خدا ، بہت مسجود ملک زاجتبا ،
 نیز مسجود کسی کو چوں ، ملک ، رستہ باشد جانش از طغیان و شک
 فسجدوا له تعظيماً لنور الله واداء لحق التعليم واعتزاناً بفضله واعتذاراً
 عما وقع منهم في شأنه هذا هو السرف كون الملائكة مأمورين بسجود .
 آدم عليه السلام فعلم ان سجودهم له مما يعقل معناه لا كما زعم صاحب التنقيحات
 انه غير معقول المعنى على عامة المفسرين قالوا ان سجود الملائكة لآدم عليه
 السلام وسجود الاخوة ليوسف عليه السلام كان على جهة التحية والاکرام وقد
 اتفق الفقهاء على ذلك القول فالقول بان ذلك السجود لم يكن للتحية والاکرام
 معناه ليس بمعقول خلاف المذهب

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সিজদায়ে তাহিয়াহ জায়েজ বা বৈধতার বিশদ বর্ণনা
এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডন

অনুবাদ : তানকিহাতিছ ছুল্লিয়ার লিখক বলেন; সজিদায়ে তাহিয়াহকে ‘মোবাহ’ হিসেবে দলিল পেশ করা, ঐ আমরে মোতলাকের উপর স্থিরকৃত যে ‘আমরে’ মোতলাক বারংবার কার্যকরণের উপকারিতা প্রদান করে। উপরন্তু সজিদায়ে তাহিয়াহ এর মোবাহ বা মোস্তাহাব হওয়ার দলিল, ‘আমরে’ তাকরার হওয়ার পক্ষে স্থিরকৃত নহে। কারণ সজিদায়ে তাহিয়াহ ‘মোবাহ’ বা মোস্তাহাব বলে বিবেচিত। আল্লাহর নির্দেশে এটা আদিষ্ট নহে, কারণ এতে করে আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, এই আমর দ্বারা ‘মোবাহ’ বা মোস্তাহাব বিষয়ে দলীল গ্রহণ করা বরং আমর ছাড়া ওয়াজিব বিধানে অবশিষ্টতার জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আর এজাতীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ মতামত দেয় নি।

আর যখন বুঝা গেল, ঐ সজিদায়ে তাহিয়াহ এর আমর মূলতঃ মোবাহ হিসেবে সাব্যস্ত। কিন্তু এর অর্থ মোস্তাহাবের দিকে এ হিসেবে ঐ সজিদা সম্মানের ছিল আমরের নির্দেশের কারণে আর তাহিয়াহ তথা সম্মান করা প্রত্যেক কালে সুন্নত হিসেবে পরিগণিত, ফিরিশতাদের বেলাও অনুরূপ, আর আল্লাহর এ নির্দেশ ফেরেশতা ভিন্ন অন্য সৃষ্টির জন্যও অবশিষ্ট রইল। বরং ফেরেশতাগণ একবার নির্দেশ দাতার আদেশ পালন করা দ্বারা ওয়াজেবের বিধান আদায় করল এবং ওয়াজিব হিসেবে বিধান রহিত হল।

টীকার অনুবাদ : কাউলিহি বাল বাকা, ইস্তেহবাবিহি

উপরন্তু যখন সজিদা তাহিয়াহ মোস্তাহাব হওয়ার বিধান অবশিষ্ট রইল যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণ ইউসুফ (আঃ) কে সেজদা করেছিল। এই দিকে লক্ষ্য করলে সিজদায়ে তাহিয়াহ মোস্তাহাব হওয়ার বিধান অবশিষ্ট রইল বুঝায় এবং এতে করে সিজদা কারীদের জন্য আমর তথা নির্দেশ সিজদা করার জন্য আয়াতে কোরআন তথা আমরী নির্দেশের প্রয়োজন ছিল না। আর এতে করে ফেনী মোনাজারায় বিরুদ্ধবাদীদের দাবী বাতিল ও অগ্রাহ্য হয়ে গেল। সিজদায়ে তাহিয়াহ নাজায়েজ দাবীদাররা বলে ইউসুফ (আঃ) কে স্বীয় পিতা-মাতা এবং ভাইয়ের সিজদা করা আল্লাহর নির্দেশ ছিল না তারা নিজেরাই করেছিল। তাদের ভ্রান্ত ধারণা সবার নিকট স্পষ্ট, ‘আমর’ মোস্তাহাব বা মোবাহ যেটাই হউক নতুনভাবে আমরের আয়াত অবতীর্ণ না হলেও মোবাহ বা মোস্তাহাব হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ। ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানেরা সিজদায়ে তাহিয়াহ ‘মোবাহ’ হিসাবে আদায় করল এবং তা তাদের শরীয়তে ‘মানদুব’ হিসাবে গ্রহণ করল। আর পূর্ব শরীয়ত থেকে দলীল গ্রহণ করা বিমুন্ধ যা অন্যান্য বিষয়েও স্পষ্ট।

কাউলে মুগনী! মমতাজুল মোহাদ্দেসিন মাওলানা ওয়াইদুল আকবার এম. এম.

জেনে রাখুন, এ জাতীয় সজিদায়ে তাহিয়াহ আদম (আঃ) এর জন্য খাস তথা নির্দিষ্ট ছিলেন না ‘মোবাহ’ ও মোস্তাহাবের বিধান অনুসারে। যদি আদম (আঃ) এর জন্য খাস হয়, উহা ফেরেশতাদের আদায়কৃত ওয়াজিব সজিদা তাহিয়াহ খাস, অন্যদিকে সজিদা তাহিয়াহ মোবাহ ও মোস্তাহাবের দিক দিয়ে তা কতক প্রকার লোকের জন্য খাস, এ যুক্তির মূলত কোন ভিত্তি নেই।

আমাদের শরীয়তে ইহার উদাহরণ হল। যেমন :- তাহাজ্জুদের নামায, এ নামায নবী

করিম (দ.) এর উপর আদায় করা আমারের বিধান অনুযায়ী ফরজ ছিল, আল্লাহ তা'লা এ নির্দেশে বলেন, “ফাতাহাজ্জাদ বিহি না ফেলাতাল লাক” অর্থাৎ হে রাসূল! নাফেল তথা অতিরিক্ত নামায হিসেবে আমি আপনাকে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর আল্লাহ তা'লার এ নির্দেশ যা নবী করিম (দ.) এ জন্য ওয়াজিব ছিল, আর ঐ আমার তথা নির্দেশ মোস্তাহাব হিসেবে নবী করিম (দ.) এর জন্য খাস ছিল না।

আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তেও এর উদাহরণ যেমন- আইয়্যামে বাইজ তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোজা রাখা আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) এর উপর ফরজ ছিল আর আদম (আঃ) ভিন্ন অন্যদের জন্য মোস্তাহাব হিসেবে অবশিষ্ট রইল।

উপরন্তু, যখন সজিদায়ে তাহিয়াহ শরীয়তের বিধি বিধান অনুসারে মূলতঃ মোবাহ জাজেজ হিসেবে সাব্যস্ত হল এবং তা আদম (আঃ) এর জন্য খাস তথা নির্দিষ্ট নয়, আর সজিদায়ে তাহিয়াহ মোস্তাহাব এ হিসেবে যে, তা দ্বারা আমার এর হুকুম দ্বারা তাহিয়াহ তথা সম্মান আদায় করা। আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তে বাদশাহের তথা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের সম্মুখে সজিদা তাহিয়াত আদায় করা মোস্তাহাব ছিল যা তাফসীর গ্রন্থ সমূহে বিশদভাবে বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে জারীর আত্ তিবরানী তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থে বলেন, ইয়াকুব (আঃ) সন্তানাদিসহ হযরত ইউসূফ (আঃ) এর দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন, যখন তাঁরা সকলে হযরত ইউসূফ (আঃ) কে দেখলেন, সবাই সজিদায় পতিত হল। আর এ সজিদা বাদশাহের সম্মানার্থে আদায় হত তখনকার সময়ে। তাফসীরে জাহেদীতে উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী উম্মতগণের সজিদায়ে তাহিয়াহ আদায় করা তা আমারের শরীয়তের সালামের সমপর্যায়ের ছিল।

জেনে রাখুন, হযরত ইউসূফ (আঃ) কে তাঁর সহোদরগণ যে সজিদা করেছিলেন, তা হযরত ইউসূফ (আঃ) এর সম্মানার্থে করেছিলেন। এ হিসেবে নয় যে, তাঁরা আল্লাহকে শুকরিয়ার সজিদা করেছিলেন তাঁকে দীর্ঘদিন পর পাওয়ার কারণে। যেমন তানকিহাতিচ ছুন্নিয়ার লেখক ধারণা করেছেন যে, এ সজিদা সজিদায়ে শোকর ছিল যা তিনি তাফসীরে কবীর থেকে গ্রহণ করেছেন। তাফসীরে কবীর, আল্লাহর বাণী, “আননাহুম খাররুলাহ” এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, হযরত ইউসূফ (আঃ) এর ভাইগণ তাঁকে পুনরায় ফিরে পাওয়ায় আল্লাহর দরবারে শোকরিয়ার সজিদা আদায় করেছিলেন। সারকথা যদি ঐ সজিদা আল্লাহর শোকরিয়ার আদায় করা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই ঐ সজিদা আল্লাহর জন্য হবে। আসলে এ সজিদা কি এ কারণে ছিল? তাফসীরে কবীরের এ মতামত দুর্বল, যেভাবে আদম (আঃ) কে কেবলা বানিয়ে আল্লাহকে ফেরেশতাগণ সজিদা করেছিলেন, এ কথাটিও দুর্বল যা আগে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'লার বানী “রায়াইতুহুম লি সাজেদীন” অর্থাৎ আমি তাদেরকে দেখলাম আমাকে সজিদারত। এ আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইউসূফ (আঃ) কে তাঁর ভাইগণ সজিদায় তাঁকে সম্মান করেছিলেন। আল্লাহর শুকরিয়া সজিদা ছিল না ইউসূফ (আঃ) কে অনেকদিন পর পাওয়ার কারণে, কেননা আয়াতের কারীমা অংশ “লি” জমীরে মাজরুর ইখতেসাস তথা নির্দিষ্টের জন্য তাছাড়া “লি” কে ‘সাজেদীনের’ আগে উল্লেখ করাও দ্বিতীয় ধরনের নির্দিষ্ট। ইহা হতেও বুঝা যায়, ঐ সজিদা ইউসূফ (আঃ) এর জন্য ছিল। তাঁকে পুনরায় ফিরে পাওয়ায় আল্লাহর প্রতি শোকরিয়ার সজিদা ছিল না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'লার বাণী “খাররুলাহ সুজ্জাদায়” অর্থাৎ সবাই তাঁর সামনে সজিদায় পতিত

হয়ে পড়ল- এ আয়াতের মধ্যে লাহ এর লাম ও খাস তথা নির্দিষ্টকরণের অর্থে 'লাম' আজল তথা উদ্দেশ্যের অর্থে নহে, কেননা 'লাম' যদি আজল অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন ইউসূফ (আঃ) কে পুনরায় ফিরে পাবার কারণে অর্থ হবে, আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, ইহা ভাইদের চক্রান্ত ছিল না, কেননা এ অর্থের দিক দিয়ে সজিদাটি আল্লাহর জন্যই ছিল, আর এ কথা বিস্ময়কর নয়। ইহা যে ভাইদের চক্রান্তের কারণে, ইহা আল্লাহ তা'লা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর উপদেশ নিজে এরশাদ করেন যেমন- আল্লাহর বাণী, "কালো ইয়া বনাইয়া লা তাকছুচ রু ইয়াকা আলা এখ ওয়াতেকা ফাইয়াকিদু লাকা কাইদান" (আয়াত) অর্থাৎ হে আমার পুত্র (ইউসূফ) তুমি তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করোনা, কেননা তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক ষড়যন্ত্র করবে।

সুতরাং ভাইদের চক্রান্ত সজিদা করা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, কেননা ঐ সজিদা ইউসূফ (আঃ) এর সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল, তাঁকে পুনরায় ফিরে পাওয়ায় আল্লাহর শোকরিয়া হিসেবে ছিল না। এতে করে রহিত হয়ে গেল আততানকিহাতিচ ছুনিয়ার সংকলকের দাবী, যেমন তিনি বলেন, এ ছাড়া ও তার মধ্যে সজিদা শোকর এবং ইউসূফ (আঃ) এর সত্য স্বপ্নের বাস্তবায়ন ছিল। অর্থাৎ ভাইগণের সজিদা ইউসূফ (আঃ) এর জন্য খাস তথা নির্দিষ্ট ছিল; ভাইগণের সজিদা ইউসূফ (আঃ) কে যদি ও মানা যায়, তথাপি উহার মধ্যে তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নের তাবির করা যায় যা সত্য ছিল। কিন্তু এর পরে যখন তাঁকে সজিদা করেছিলেন তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন না, কারণ তিনি নিদ্রা থাকা অবস্থায় যা দেখে ছিলেন তা যদি বাহ্যিক জগতে বাস্তবায়িত হিসেবে দেখা যায়, তখন বলা যাবে ঐ স্বপ্নের তাবির বাহ্যিক জগতে বাস্তবায়িত এ অর্থে তাঁকে সম্মান করার সময় তিনি নিদ্রিত ছিলেন না; আর ইউসূফ (আঃ) স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিলেন যে, তাঁকে সজিদা করে সম্মান করেছিলেন, আর এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন হল বাহ্যিক জগতে ভাইয়েরা যখন তাঁকে সজিদা করে সম্মান করেন, আর ইহা তখন যখন তিনি মিশরের হুকুমতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর। এখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তাঁর স্বপ্নে দেখা সজিদার তাবির এবং তাঁকে সম্মান করার দিকে ঐ সজিদা করার অর্থ করা নিষিদ্ধ নয়।

পত্নীভাবে অনুধাবন করুন, আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে নিজের সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ) কে জবেহ করার জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিলেন, উহার উপর হযরত ইউসূফ (আঃ) এর ভাইদের সজিদার কিয়াস তথা অনুমান করা জায়েজ হবে না, যেমন- আততানকিহাতিচ ছুনিয়ায় অনুক্রপভাবে কিয়াস তথা অনুমান করা হয়েছে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নের মধ্যে নিজের প্রিয় সন্তান ইসমাইল (আঃ) কে জবেহ করতে দেখেছিলেন, অথচ এ স্বপ্ন বাস্তবে বাস্তবায়ন দেখা যায় নি বরং এ স্বপ্নের তাবির তথা বাস্তব বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছে, বরং এ স্বপ্নে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইব্রাহীম (আঃ) কে পরীক্ষামূলকভাবে নিজ পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে জবেহ করার ইচ্ছা অনুযায়ী এতে তাঁর স্বপ্নের কোন তাবির তথা বিশ্লেষণ হল না, কেননা, "রুইয়ায়ে ছাদেকা" তথা সত্য স্বপ্নে তাবির তথা বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে না, পছন্দসই সিদ্ধান্ত বা নতুন কোন প্রকারের উদ্দেশ্যে, এ অর্থে যা ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বাস্তবায়ন পাওয়া যায় বরং তা ছিল স্বপ্নে পাওয়া আল্লাহর নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে আদায় করল। এতে করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাইল (আঃ) কে জবেহ করার মনস্থ করলেন। এটা ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর আবশ্যকীয় 'হুকমান' ছিল। তিনি আল্লাহর ঐ নির্দেশের

পুরোপরি ইহা দ্বারা পালন করেছিলেন। স্বপ্নের কোন তাবির তথা বিশ্লেষণ হল না। সুতরাং এখন স্পষ্ট হয়ে গেল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দেখা স্বপ্নের আর হযরত ইউসূফ (আঃ) এর দেখা স্বপ্নের বিশাল দূরত্বের পার্থক্য। সুতরাং জেনে রাখুন, ইসমাইল (আঃ) এর জবেহ, ইহা শুধু মাত্র স্বপ্নে দেখা আল্লাহর নির্দেশের সাধারণ পরীক্ষার স্থান। যদি এরূপ না হত, তাহলে জবেহ দ্বারা কোন মৃত্যুবরণ করেন নাই। কেননা মানুষকে হত্যা বা জবেহ করা তাঁর শরীয়তের হারাম তথা নিষিদ্ধ ছিল এবং আবশ্যকতা দিক দিয়ে আশিয়ায়ে কেরামগণের স্বপ্নে দেখা বিষয় পালন বৈধ, যদি তা নির্দেশমূলক স্বপ্নের মাধ্যমে হয়, কেননা আশিয়ায়ে কেরামগণের স্বপ্ন যথার্থ ও সত্য হয়ে থাকে, যার মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাব প্রবেশ নিষেধ এবং আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আঃ) যা কিছু স্বপ্নে দেখেছেন উল্লেখিত সত্য স্বপ্নের প্রেক্ষাপটে। এতে করে তিনি ইসমাইল (আঃ) কে জবেহ করার ব্যাপারে মাজবুর হয়ে পড়েন। আর কার্য সম্পাদনের দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ যথাযথ পালন করা বুঝায়। আর ইউসূফ (আঃ) এর দেখা স্বপ্ন এর তাঁর ভাইগণের আদায়কৃত সজিদা ব্যাপারে দেখা যায় ইউসূফ (আঃ) এর ভাইগণ স্বপ্নের মধ্যে ইউসূফ (আঃ) কে সজিদা করতে দেখে নাই। অন্যদিকে আল্লাহ তা'লা কালামে পাকের মধ্যে সজিদা করার বাস্তবতা বিবৃত করেছেন। যেমন- এরশাদ করেছেন ইউসূফ (আঃ) এর স্বপ্নের ব্যাপারে, অথচ তাঁদের স্বপ্নে দেখার বিধানের উল্লেখ করেন নাই।

জেনে রাখুন, ভাইগণের আদায়কৃত সজিদা যা আল্লাহর নির্দেশে ছিল না, যদিও হযরত ইউসূফ (আঃ) নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে দরশন করেছিলেন এবং হযরত ইউসূফ (আঃ) তাঁর দেখা স্বপ্নের কথা তাঁর ভাইদের নিকট সজিদা করার পূর্বে বর্ণনা করেন নাই। কেননা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে ইহা বলা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেন। কাজেই মূলতঃ ভাইদের নিকট ইউসূফ (আঃ) দেখা স্বপ্নের কোন জ্ঞান ছিল না। সুতরাং সজিদা করার বাস্তবায়নকে ইউসূফ (আঃ) এর দেখা স্বপ্নের তাবির তথা বিশ্লেষণ বলে গ্রহণ করা বিশুদ্ধ হবে না, কারণ সজিদা করার ব্যাপারে তাঁদের কোন জ্ঞান ছিল না। যদি মানা হয় যে, তাঁরা ইউসূফ (আঃ) কে তাঁদের পিতা ইয়াকুব (আঃ) এর অনুসরণে সজিদা করেছিলেন, আর হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ সজিদা করার ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন। উপরন্তু ইউসূফ (আঃ) তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট স্বপ্নে দেখা ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর কৃত সজিদা ইউসূফ (আঃ) কে তাঁর দেখা স্বপ্নের তাবির তথা বিশ্লেষণমূলক কাজ ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। এ অর্থে যে ইয়াকুব (আঃ) এর শরীয়তে আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে সজিদা করা হারাম ছিল, না জায়েজ ছিল?

প্রথম অর্থে যদি স্বপ্নের তাবির তথা বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে হারাম কার্যকে আবশ্যক করা বুঝায়, আর এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় অর্থে তথা জায়েজের দিক দিয়ে সজিদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল, নাকি তাহিয়াহ তথা সম্মানের ছিল। ইবাদতের উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহকে সজিদা করা কুফুরী, আর স্বপ্নের এ জাতীয় তাবির তথা বিশ্লেষণ করাও কুফুরী, আর ইহা জ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে দ্বিতীয় অর্থ তথা সজিদা তাহিয়াহ এর উদ্দেশ্যে ছিল, ইহাই নির্দিষ্ট ও স্থির হল।

অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর পুত্রকে কোরবানী তথা জবেহ করছেন; আর এটা আল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষামূলক আমল। এতে করে ইয়াকুব

(আঃ) ও তাঁর পুত্রকে সজিদা করার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ অর্থ গ্রহণ করা উচিত হবে না ও যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। উপরন্তু মহান রাক্বুল আলামীন ইসমাইল (আঃ) এর জবেহ হওয়া নির্ধারণ করেন নাই ও তাঁর এ কাজ ইচ্ছাও ছিল না বরং ইসমাইল (আঃ) এর জবেহ করার ব্যাপারে এটা খাস ও বিশেষ ‘ইবতেলা’ তথা পরীক্ষা ছিল যা বাস্তবে বাস্তবায়িত হয় নি।

সুতরাং ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর বাপ মা ভাইগণ সজিদা করেছিলেন ইহাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্বপ্নের উপর কিয়াস তথ্য অনুমান করা বৈধ হবে না, কেননা তাঁরা সবাই বাস্তবে ইউসুফ (আঃ) কে সজিদা করেছিলেন। আর এতে আততানকিহাতিচ ছুনিয়ায় সংকলকের উপস্থাপিত যুক্তি বিপুল নয় ইহা স্পষ্ট হয়ে গেল। আততানকিহাতিচ ছুনিয়া কিতাবে বলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর স্বপ্নকে সত্যভাবে জগতবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণ- আদিষ্ট ছিলেন। তাঁর এ যুক্তির পিছনে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সজিদা করার ব্যাপারে তাঁর পিতা ও ভাইগণ আদিষ্ট ছিলেন, প্রামাণ্য হিসেবে তিনি কোন দলিল পেশ করেন নাই। বরং তাঁর পিতা ও ভাইগণ সকলেই তাঁকে সজিদা করেছিলেন কেননা তখনকার সময়ে বাদশাহকে সজিদা করার মাধ্যমে সম্মান করা রেওয়াজ ছিলো; যেমন সব তফসীরে ইহা দেখা যায়। তাফসীরে হুসাইনীতে এ ঘটনা বর্ণিত আছে এভাবে, যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিশর রাজ্যের নিকটে গিয়া পৌছলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) উম্মীর নাজীর ও মিশরের সম্মানিত ব্যক্তিগণ কে নিয়ে পিতার আগমনের সম্বর্ধনায় সামনে অগ্রসর হলেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় সন্তানগণ সহ শাহী রাজ দরবারের নিকট আসলে, আসমানের তারকারাজী যেন খুশিতে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে বললেন, এ সমস্ত সৈন্য সামন্ত দেখে আপনি আশ্চর্যান্বিত বোধ করছেন? সর্বোপরি আসমান জমিনের ফেরেস্তাগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। আপনি খুবই আনন্দিত। কেননা আপনি দীর্ঘদিন যাবত ইউসুফ (আঃ) এর বিচ্ছেদের বিরহে অস্থির ও চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে দেখলেন সওয়ারী হতে নিচে নামতে চাইলেন, কিন্তু হযরত জিব্রাইল (আঃ) নিচে অবতরণ করা থেকে তাঁকে বারণ করলেন যেন তাঁর পিতা তাঁকে সালাম করেন। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) পদব্রজ অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টি যখন জামালে ইউসুফ তথা ইউসুফ (আঃ) এর দিকে পড়লেন, তখন ইয়াকুব (আঃ) সালাম দিলেন এই ভাবে, “আসসালামু আলাইকুম-ইয়া মাজহাবাল আহযান” হে চিন্তা দূরীভূতকারী আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক। একে অপরের হাত মোছাফাহা করলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন ইত্যাদি। হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখন মিশর রাজদরবারে উপস্থিত হলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয় সিংহাসন থেকে নেমে এসে পিতামাতাকে নিজের আসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট করলেন। আল্লাহর বাণী “খররুলাহু সুজ্জাদান” এর তফসীরে তাফসীর হোসাইনীতে বর্ণিত আছে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সম্মুখে তার পিতামাতা ও ভাইগণ খাস করে সজিদা করলেন তাহিয়াহ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে। এ জাতীয় সজিদা করা তখনকার সময়ে প্রচলিত ছিল। আর ইউসুফ (আঃ) এ অবস্থা দেখে আনন্দে পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার আব্বা, এটা কি আমার পূর্বে দেখা

স্বপ্নের তাবির তথা বিশ্লেষণ। আর এতে করে স্পষ্ট হয়ে গেল যে যখন ইউসুফ (আঃ) নিজের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে সালাম করার ইচ্ছা করলেন তাঁর সাথে প্রথমে সাক্ষাতে, তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে সালাম দেওয়া থেকে বারণ করেন এবং বললেন, “সালাম কর না, কেননা তিনিই আপনাকে প্রথমে সালাম করবে।” ইহার পর হযরত ইয়াকুব (আঃ) তার সন্তানগণ সবাই হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সালাম করেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন বাদশাহর সিংহাসনের উপবিষ্ট হলেন “খাররুলাহ সুজ্জাদা” অর্থাৎ তাঁরা সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদায় পতিত হল। এতে হযরত ইউসুফ (আঃ) হত বিহবল হয়ে পিতাকে বললেন, “হে আমার পিতা! এটা কি আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের তাবির।” ইহা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মহান রাক্বুল আলামিন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর উপর হযরত ইউসুফ (আঃ) কে মনোনীত করেছেন, এমনকি তখনকার সময়ে নবী ও সাধারণ মানুষের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহতালা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর পিতা ও অন্যান্যদের উপর মনোনীত করার দলিল হলো যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) কে জিব্রাইল (আঃ) স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আঃ) কে প্রথমে সালাম করতে নিষেধ করলেন। উপরন্তু ঐ যুগে হযরত ইউসুফ (আঃ) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়াতে তিনি সম্মান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন, সে কারণে প্রথম সাক্ষাতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সালাম দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

আমাদের শরীয়তে যদিও পিতাকে সম্মান করা ছেলের জন্য ওয়াজিব, কিন্তু হযরত জিব্রাইল (আঃ) কি জানতেন না যে ঐ শরীয়তে সন্তানের উপর পিতাকে সম্মান করা ওয়াজিব ছিল কি না? তিনি অবশ্যই জানতেন যদি সন্তান শরাফত তথা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব যদি জ্ঞান, বাদশাহী বা অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হয়, সবটাই সমান, আর এতে করেই হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে সম্মান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। উপরন্তু ঐ যুগে হযরত ইউসুফ (আঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তিনি সে সময়ে মিশরের বাদশাহ ছিলেন, এ ছাড়া আল্লাহতালা স্বপ্নের তাবির বা বিশ্লেষণ করার জ্ঞান দান করেছেন; বরং সাধারণ পিতৃত্বের গুণের উপর জ্ঞান ও খলিফার গুণধারীকে শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের শরীয়তেও আছে। পিতা যদি অজ্ঞানী হয়, অপর পক্ষে ছেলে যদি আলেম তথা জ্ঞানী হয় বা রাষ্ট্র প্রধান হয় এ উভয়ের মাঝে সন্তানই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত, পিতার উপস্থিতিতে সন্তানই নামাজের ইমামতি করেন। পিতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব বাহ্যিক ভাবে, আর খিলাফত ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব অভ্যন্তরীণ ভাবে স্থিরকৃত। আর হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পেলেন যা বাহ্যিক শরাফত থেকে অধিকতর শ্রেয়, ইহাতে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সালাম জানালেন। এ সাক্ষাতে শুধু সালামই করেছিলেন সজিদা করেন নি। কারণ হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন বাদশাহীর সিংহাসনে সমাসীন হলেন, এতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর খেলাফতের প্রমাণ পেলেন, অতঃপর হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণ হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সম্মানার্থে সজিদা করলেন।

অতঃপর জানা গেল, হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণদের সজিদা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে করা বোধগম্য বিষয়, না বুঝার বিষয় নয়। যেমন- আত্ তান কিহাতিহ ছুনিয়ার লেখক ধারণা করেছেন যে- উহা বোধগম্য বিষয় নয়। এতে করে ঐ দুর্বল উক্তি ও স্পষ্ট হয়ে গেল। যারা বলেন, ঐ যুগে তাহিয়াহ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে তাহাদের কৃতকর্ম ছিল সজিদা

করা, আর সজিদা দ্বারা সম্মান করাই তাদের উদ্দেশ্যে, উক্ত যুক্তি খুবই দুর্বল, কেননা মোবালাগা কথা বারবার সম্মান তা ইউসুফ (আঃ) এর জন্য যথোপযুক্ত ছিল, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দ্বারা। এই উক্তি যা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা হল যে, সন্তানের উপর পিতাকে সম্মান করা ওয়াজিব বা তাদের শরীয়তে ছিল। অন্যদিকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর কৃতকর্ম হযরত ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে সায় দে। বরং এতে করে বুঝা যাচ্ছে যে, শরাফত তথা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্মান করা আবশ্যিক; চাই শরাফত তথা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সন্তান হউক বা পিতা হউক; যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, প্রতি যুগে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতাকে সম্মান করার বিধান বা রেওয়াজ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর সেজদা করা স্বীয় পুত্র ইউসুফ (আঃ) এর প্রাপ্য ছিল, এবং প্রথম সাক্ষাতেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ) কে সালাম দিয়েছিলেন- যা জানেন আপনি আর ইহাই দলিল হিসেবে পরিগণিত যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর সজিদা করা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সম্মান ও তাহিয়ার উদ্দেশ্যে ছিল। কেননা, প্রথম সাক্ষাতে সালাম দেওয়ার দ্বারা তার দ্বিতীয় সাক্ষাতে সজিদা করা ও যে সম্মানের ছিল ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

তানকিহাতিচ ছুন্নিয়া কিতাবের সংকলকের যুক্তি বাতিল প্রমাণিত হলো যেমন তিনি বলেন, প্রথম দেখাতে সম্মান করার প্রচলন বিদ্যমান ছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রথম সাক্ষাতে একে অপরকে সজিদা করেননি, যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বাদশাহীর সিংহাসনের উপর আসন গ্রহণ করলেন এবং স্বীয় পিতা মাতাকে পার্শ্বে উপবিষ্ট করলেন, তখন তাঁরা সকলেই হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সজিদা করলেন, এটা সজিদায়ে তাহিয়াহ কিভাবে হলো? উপরন্তু মানুষ অভ্যাসগতভাবে কেউ কাউকে সম্মান করে না যতক্ষণ না তাঁর অন্তরে কোন ব্যক্তির মান-মর্যাদার পরিচিতি না হয়। অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বাদশাহীর মর্যাদা তাঁদের অন্তরে অত্যধিক পরিমাণে অর্জিত হয়েছিলো যখন তাঁরা সকলেই বাদশাহীর সিংহাসনের পাশে উপবিষ্ট হলেন। আর তখনই তাঁরা অন্য সকলের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হল। সুতরাং অন্যান্য সকলে তাঁদেরকে সম্মান করল, তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী।

এতে করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণের সজিদা করা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে স্পষ্ট হয়ে গেল, যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বাদশাহীর সিংহাসনে আরোহন করলেন এবং প্রথম সাক্ষাতে সজিদা না করা এ অর্থে তাঁরা বাদশাহ হিসেবে তখন চিনতে পারেন নি, আর তাঁর বাদশাহীয়তের শান শওকত সম্পর্কে ও তাঁরা অবগত ছিলেন না, কেননা প্রথমে প্রথম সাক্ষাতে তাঁরা তাঁর এ গুণগুলি দেখতে পায়নি, এ কারণেই তাঁরা প্রথম সাক্ষাতে সালামের মাধ্যমে তাঁকে সম্মান করেছিলেন, কেউ সজিদা করেননি। এ কারণেই অতঃপর যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বাদশাহীর মসনদে উপবিষ্ট হলেন- তখনই তাঁদের নিকট তাঁর আসল পরিচয় অর্জিত হল, এবং তাঁদের অন্তরের মধ্যে তাঁর শান শওকত সম্পর্কে স্থিরতা লাভ করল, আর তখনই তাঁরা সকলেই তাঁকে (হযরত ইউসুফ (আঃ)) সম্মান উদ্দেশ্যে সজিদা করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজের অবস্থা দেখলেন এবং তাঁর শরীর কম্পিত হল, তিনি নীরবে রইলেন, সম্ভবতঃ তাঁর বাহ্যিক অবস্থার কারণে শারীরিক কম্পন ছিল। অর্থের তথা আভ্যন্তরীন দিক থেকে এটা ছিল

না, এ কারণে তিনি কিছু বলেননি, যা সেজদা ‘মাকরুহ’ হওয়াকে বুঝায়, বরং ইহা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা বুঝায়, এবং বলেন, বাহ্যিক আনন্দের কারণে যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) সেজদা ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আঃ) কে বললেন, হে আব্বাজান ইহা কি আমার দেখা স্বপ্নের তাবির তথা ব্যাখ্যা যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণ প্রথম স্বাক্ষাতে সালাম এবং দ্বিতীয় স্বাক্ষাতে সজিদা করে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সম্মান করেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁদের শরীয়ত এ উভয়বিধ নিয়ম তাহিয়াহ তথা সম্মানের প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য তাহিয়াহ তথা সম্মানের নিয়ম সালামের দ্বারা, আর বাদশাহ এর জন্য সজিদা করাই তাহিয়াহ তথা সম্মানের রীতি ছিল। বরং রহমে তাহিয়াহ তথা সম্মান করার প্রথা সজিদার মাধ্যমে এবং সালামের মাধ্যমে আদায় করা প্রচলিত রয়েছে। সজিদা দ্বারা সম্মান করার প্রথা ফেরেশতাদের নিকট হতে প্রচলিত, যা আপনি অবগত আছেন এবং সালাম দ্বারা সম্মান করার প্রথা আদম (আঃ) থেকে প্রচলিত; যেমনঃ ইমাম বোখারী (রহঃ) তাঁর বোখারী শরীফে “বদউল খলক” অধ্যায়, হযরত আবু হুরায়রা নবী করিম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। রাসুলে করিম (সাঃ) এরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন এবং আদম (আঃ) ৬০গজ লম্বা ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা’লা আদম (আঃ) কে বলেছেন, আপনি ঐ ফেরেশতাদের নিকট যান এবং তাঁদের কে সালাম করুন ও শুনুন তাঁরা আপনার সালামের উত্তরে কি বলে। আর সালামের উত্তর আপনার জন্য তাহিয়াহ এবং আপনার সন্তানদের জন্যও তাহিয়াহ স্বরূপ। এরপর আদম (আঃ) ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম করলেন অত্যাং ‘আসসালামু আলাইকুম’ তাঁরা (ফেরেশতাগণ) সকলেই সালামের উত্তরে বললেন, “আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারকাতুহু; উপরন্তু আদম (আঃ) কে সৃষ্টির প্রারম্ভে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কেননা, এ সময় শ্রেষ্ঠত্ব ও শরাফতের দাবীদার ফেরেশতারা ছিলেন এবং তাঁদেরকে সম্মান করা উপযুক্ত ছিল।

অতঃপর আদম (আঃ) যখন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফেরেশতাদেরকে ‘আসমা’ বিভিন্ন বস্তুর নাম শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন, তখনই আদম (আঃ) ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলতের দাবীদার হলেন, এবং তখনই আল্লাহতালা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদম (আঃ) কে সম্মানের উদ্দেশ্যে সজিদা করার জন্য, কেননা সেই মুহূর্তে আদম (আঃ) আল্লাহর নূরানী তাজল্লিয়ত অর্জন করলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের খলিফা তথা প্রতিনিধি মনোনীত করলেন এবং তাঁকে মাকবুলিয়াতের পোশাক পরিধান করালেন। আর মছনবী শরীফে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রাহঃ) বললেন,

আদমী হুঁ নুরে গিরদ আজ খোদা

হাস্ত মাছযুদে মালায়েক যে, ইজতেবা।

নিজে মাছযুদে কছি কোঁ হুঁ মারক।

রেশতা বাশদ জানশ আজ তুগইয়ানো শক।

অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহর নিকট হতে নূর লাভ করেন, তখন ঐ মানুষ মছযুদে মালায়েক তথা ফেরিস্তাদের সজিদা পাওয়ার উপযুক্ত হয়। যা আল্লাহ থেকে নির্ধারিত। ফেরিস্তারা আদম (আঃ) কে যেভাবে সিজদা করেছিল ঐ ভাবে যদি সাধারণ মানুষকে

সিঁজদা করা হয় তাহলে সিঁজদাকারী ব্যক্তির সাথে সন্দেহ ও পথভ্রষ্টতার সম্পর্ক রয়েছে। ফেরেশতাগণ আদম (আঃ) কে সজিদা করেছিলেন আল্লাহর নূরের সম্মানের উদ্দেশ্যে এবং শিকার হক্ক আদায়ের উদ্দেশ্যে, আদম (আঃ) এর ফজিলত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার পর এবং আদম (আঃ) এর ব্যাপারে ফেরেশতাদের ভুল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। এ রহস্য গুলির কারণে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে সম্মানের সিঁজদার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব জানা গেল ফেরেশতাগণের সজিদা (আদম) কে যার ভাবার্থ বোধগম্য কিন্তু আততানকিহাতিচ ছুন্নিয়ার লেখক ইহাকে বোধগম্য বিষয় নয় বলে উল্লেখ করেছেন। মোফাছ্ছেরীনে কোরামগণ বলেন, আদম (আ) কে ফেরেশতাগণের সিঁজদা করা এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর ভাইগণ সিঁজদা করা ইহা তাহিয়াহ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল। এছাড়া সমস্ত ফোকাহায়ে কোরামগণ উক্ত মতে একমত পোষণ করে।

আত তানকিহাতিচ সুন্নিয়ার লেখকের উক্তি ঐ সজিদা সমূহ তাহিয়াহ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিলনা এবং ইহার অর্থ বোধগম্য নয়- “ইহা মাজহাবের খেলাপ কথা।

والتحية المستفادة بقوله تعالى:
 سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحْمَنِ ، وَسَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ، وَسَلَامٌ
 عَلَى الْيَاسِينَ هـ وغيرها من آيات السلام لا تدل على كون التحية بالسجود
 منسوخة في ذلك الزمان كما زعمه صاحب **التثقيحات** وتبعه في ذلك
 صاحب **مناظرة فني** فان السلام مندوب والمندوب على ما عند بعضهم كما
 في السلم لما يفهم كراهة ضده فقط لا كراهة جميع افعاله بل عند اكثرهم لا يتضمن كراهة
 ضده ايضا فكيف يصح القول بان التحية بالسجود قد كانت منصرفة منسوخة
 في كل زمان بتحية الناس بالسلام بهذا تبين بطلان ما في **مناظرة فني** ان
 سجد التحية نسخ بقوله تعالى **تَسْلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا** الا بقوله تعالى:
 إِذَا حُتِّبْتُمْ بِبَحِيَّةِ الْآيَةِ : فان بهذه الآية لا يثبت كراهة ضده السلام
 عند الاكثرين فكيف تكون ناسخة للتحية بالسجود والناسخة لا بد ان
 تكون للواجب او التحريم كما سيأتي ولا يخفى انه لا تنافي في الجمع

قوله: التحية المستفادة الا ليس المراد في آية السلام التحية المنسوبة التي جعلها
 الشرع طريقا من طرق تعظيم مسلم لمسلم اخر عند لقائهما على اسلوب الدعا والسلامة
 بل المراد منها الاخبار عن تحقق السلامة لأهل السلام من الانبياء والعظام
 وكذا المراد بقوله تعالى اذا جاءك الذين يؤمنون بآيتنا فقل سلام عليكم
 كتبكم على نفسه الرحمة الا الاخبار عن كونهم سالمين في كتف رحمته الله بسبب
 ايمانهم بآياته لا السلام المعنوي كما وقع في مناظرة فيني فان فيه انشأ
 الدعا بالسلامة على وجه التعظيم

سورون ، **القول الفنى** لبعيد الأكبر ، ١٢

بينهما في شريعته واحدا فيمض أن يقال ان كلا منهما كان متحققا في ذلك الزمان
 التحية بالسجود كانت للملوك والتحية بالسلام كانت لعموم الناس فما زعم
 صاحب **التثقيحات** ان سجد التحية لم يكن وجوده في زمان من

الازمنة وقد كان نسخ آيات السلام كما قال فيها جب اوم عليه السلام
 كے زمانہ ہی میں سجدہ تحیہ نہ رہا تو حدیث نسخ اور عدم نسخ دفتر گاؤ خور دہو گیا زعمہ
 فاسد و قوله باطل لا اعتبار له عند ذوي الافهام وقد ظهر لكهما
 قدرنا ان سجود التحية والتعظيم كان في تلك الايام جائزا جوازه الاعلى
 في ضمن استحبابه وكونه مندوبا في ذلك الزمان مع سقوط الوجوب بالامر
 عن الملائكة بعد ما سجدوا لا يشهد شهادة ظاهرة بان جوازه جواز اصلي لا
 جواز في ضمن الوجوب بالامر فان الجواز الذي يكون في ضمنه لا يبقى بعد سقوطه
 في ضمن الاستحباب كيف يبقى في ضمنه وليس له البقاء بذات الوجوب لكونه
 ضميا فالجواز الذي يكون في ضمن الاستحباب لا بد ان يكون اصليا سواء كان
 بمعنى ما لا يمتنع عقلا او بمعنى ما لا يمتنع شرعا اما على الاول فلان العقل مستقل
 بادراك ان بذاتك السجود يحصل معنى التعظيم عادة كما يستقل بادراك
 ان بالقيام وغيره من الاعمال المعتادة للتعظيم عرفا يحصل ذلك التعظيم عادة
 اما على الثاني فلان جوازه بقى في تلك الايام بعد سقوط الوجوب
 عن امر الملائكة بالسجود بامثالهم به وامثالهم بذاتك الامر ليس
 بنسخ له بل ادوة في موداه بالايتما ربه ووجه سقوط الوجوب عن

قوله: بينهما الى اى بين السلام وبين سجود التحية ١٢ عبید

قوله: يستقل الى لما يجوز العقل التعظيم بالسجود علم ان فيه جوازا
 اصليا عقليا ١٣ (العبید)

(٢) قوله بقى الى ولما بقى الجواز بعد سقوط الوجوب بحكم الشرع علم ان
 فيه جوازا اصليا شرعيا ١٤ (عبید)

امر الملائكة اى امر اسجدوا لادم عليه السلام هو عدم احتمال الامر المطلق
 للتكرار كما علمت ولما بقى الجواز بعد سقوط الوجوب علم ان فيه جوازا اصليا لا
 ضميا فانه لا بقاء للضماني بعد سقوط ما هو في ضمنه فتبين ان في التعظيم -

بالسجود جواز أصلي عَقْلِيٌّ من حيث ان العقل يجوز التعظيم به وجواز أصلي شرعي من حيث ان الشرع يحكم بكونه جائزاً في الأصل بالنظر الى بقاءه في ضمن الاستحباب بعد سقوط الوجوب وكان الملائكة سجدوا له مرتين السجدة الأولى لإدائه ما وجب عليهم بالامر والثانية لشكر الفراغ عن اداء ذلك الواجب فالثانية ولو كانت سجدة الشكر لكنهما كانتا على وجه التعظيم لأدم عليه السلام فهو انما وقع منهم بالنظر الى بقاء جوارحه الأصل بعد سقوط وجوبه بالامر ولا موجب لعدم بقاءه فان ادهم لذلك السجود بامتنال الامر ليس نسخاً له حتى ينسخ ذلك الجواز فلما بقي جواره كان في شرع من قبلنا من حيث كونه متضمناً لمعنى التَّحِيَّةِ مستحباً فلا بد ان يكون حجة لنا لما تقر في الاصول ان شرع من قبلنا حجة لنا اذا قصده الله تعالى در رسولاً من غير تكيد ولم يظهروا نسخه ففائدة نزول الآية تقرير

قوله: شرع من قبلنا الى لا يلزم من كون شرعهم شرعاً لنا ان يكون ما هو الواجب في شرعهم واجباً في شرعنا وكذا المستحب مستحباً والمباح مباحاً فان اصل الدليل في هذا الباب هو ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الموافقة اصل الكتاب فيما لم يورثه وكان اهل الكتاب يستدلون اشعارهم وكان المشركون يفسرون رؤسهم ففسد النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد متفق عليه مشكوة الإقيهم منه انه صلى الله عليه وسلم يحب اتباع كل ما في شرعهم سواء كان واجباً أو مستحباً أو مباحاً فكل منه حكم الاستحباب في شرعنا بالنظر الى انه يحب اتباعه فلا يلزم كون الواجب في شرعهم واجباً في شرعنا ١٢

القول المفتي لبعيد الأكبر

الحكم الثابت ان ادائه لا يحتاج الى قيام الدليل على بقاءه وهذا اصل كبير لابي حنيفة رضي الله عنه يتفرع عليها اكثر الاحكام الفقهية لانه اذا اقتضت في كتابنا صارت جزءاً

من ديننا الى المراد بالآية في قوله ففائدة نزول الآية جميع آيات كتابنا سواء كانت من القصص او الاحكام فإن اللآثم فيما لا يستغفرت كما هو المتبادر فيشمل امر الملائكة بسجود آدم عليه السلام ايضاً فانه مباحص الله تعالى به في كتابنا فيكون امر الملائكة بالسجود حجة لنا فذلك احتج به قاضي خان حيث قال اذا سجد للسلطان للتحية والتعظيم لا للعبادة لا يكون ذلك كفراً واصل امر الملائكة بسجود آدم عليه السلام وسجود اخوة يوسف عليه السلام (انتهى) وفي السراجية اذا سجد سجدة التحية لا يكفر الا وفي الكافي قال الصدوق والشهيد من سجد لغير الله تعالى ويريد التحية لا يكفر الا وفي الكنز لو قبل رجل الارض بين يدي اخذ من اصحاب السلطان تعظيماً له لا يكفر لانه يريد به التحية لا العبادة الا بل اتفق الفقهاء على انه لا يكفر بسجود التحية كما في عانة الكتب ومافي بعض الروايات من الكفر بطلاق السجود فقد رده صاحب الخلاصة بقوله اختار بعض العلماء انه يكفر بطلاق السجود اقول وهو خلاف الاظهر الا بل يظهر بقول عامة الفقهاء ان هذا القول بما لا يجوز ان يعمل به ولا يخفى ان مقتضى السجود لغير الله تعالى هو الكفر قوله: وهو خلاف الاظهر الا اقول ظهر بهذا بطلان مافي مناظرة فنى من قوله: اس من غير الله كاسم مطلقاً مع كثر ما يجتهدوا وما استدلل عليه بقوله تعالى اَيُّ اَمْرٍ كُفُّمُ بالكفر بعد اذ انتم مسلمون فهو فاسد وفساده غير خفي فان المطلق من حيث كونه مطلقاً لا وجود له الا في ضمن افرادة فالسجود عند التحقق لا بد ان يكون عبادة او تحية فانه لا وجود له سواهما فلو حكم بالكفر بالسجود المطلق لزم ان يحكم بالكفر بسجود التحية واللازم باطل لانه خلاف المذهب فيحكم بالضرورة ان المراد به ليس سجود التحية كما لا يخفى ١٢

القول المغنى لعبيد الاكبر ١٢

لا الاثم فلما انتفى الكفر تيسر دل به على انه يجوز بحيث لا يكون تركه اثماً لعل هذا هو المراد بما علوا لغتم الكفر بقوله لانه يريد به التحية لا العبادة فان اصل التحية

কোন কাজে আসবেনা। তার এই ধারণা ফাসেদ তথা বাতিল আর তার উক্তি বাতিল, তার এই কথা বিজ্ঞ লোকের নিকট কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই।

এখন আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যা আমি উপস্থাপন করেছি যে, তাজিমী সজিদা যা আগেকার ধর্মে জায়েজ ও বৈধ ছিল মৌলিকভাবে সজিদা তাহিয়্যাহ্ জায়েজ হওয়ার দিক দিয়ে এবং যা মোস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা তখনকার সময়ে মানদুব হিসাবে প্রচলিত ছিল। ফিরিশতাগণের পক্ষ থেকে আমার মাধ্যমে ওয়াজিব আদায় করার পর ইহা দ্বারা প্রমান হয়ে গেল যে, সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ মূলতঃই জায়েজ। আমার মাধ্যমে ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা যে বৈধতা ইহা (ওজুব বিল আমর) এর অন্তর্ভুক্ত থাকে তা রহিত হওয়ার পর মোস্তাহাব এর অন্তর্ভুক্ত হয়েও অবশিষ্ট থাকে না। কি ভাবে থাকবে? কারণ ওজুব ব্যতীত ইহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহা জম্নী হওয়াতে।

সুতরাং জায়েজ যা মোস্তাহাবের মাঝে নিহিত তা মূলভাবে বৈধ হওয়া আবশ্যিক। আর ইহা এ অর্থে হউক যা আকল তথা বিবেক দ্বারা বর্জিত নয় অথবা ইহা এ অর্থে হউক যা শরীয়তেও বর্জিত নয়।

(প্রথম মত তথা আকলের দিক দিয়ে) কেননা আকল তথা বিবেক নিজেই বুঝতে পারে যে ঐ সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ যা দ্বারা অভ্যাসগত সম্মানের অর্থ বুঝায়, যেমনিভাবে দাঁড়ানো ও অন্যান্য কার্যাদি দ্বারা সাধারণভাবে সম্মান করা বুঝা যায়, আর সাধারণের মাঝে উহা সম্মান হিসেবে বিবেচিত।

কেননা (দ্বিতীয় মতের পরিপ্রেক্ষিতে) উহা জায়েজ ও বৈধ হওয়া অবশিষ্ট রয়েছে আগেকার ধর্ম সমূহে ওয়াজিব রহিত হওয়া সত্ত্বেও ওয়াজিবের নির্দেশ ফিরিশতাগণ কর্তৃক আদায় দ্বারা তা সাক্ষিত বা দায়িত্বমুক্ত হয়েছে। আর ফিরিশতাগণের হুকুম পালন করা দ্বারা সজিদা তাহিয়্যাহ্ এর বিধান রহিত হয় নাই বরং উহা যথাযথ আদায় করা হয়েছে নির্দেশ পালনের মাধ্যমে এবং ফিরিশতাদের প্রতি নির্দেশ যা ওয়াজিবকে রহিত করল; অর্থাৎ 'উছ্যুদু' আমর আদম (আঃছাঃ) এর উদ্দেশ্যে যা 'আমরে মতলক' এর বারংবার হওয়াকে চায় না। যা আপনিও জানেন। ওয়াজিব রহিত হওয়ার পর যখন উহার বৈধতা অবশিষ্ট রইল ইহাতে বুঝা গেল সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ মূলতঃ জায়েজ। 'জম্নী' অন্তর্ভুক্ত নয়; কেননা অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি অবশিষ্ট থাকেনা যখন তার মূল আহকাম রহিত হয়ে যায়। এখন স্পষ্ট হয়ে গেল তাজিমী সজিদা মূলতঃ বিবেক সম্মতভাবে জায়েজ, এ হিসেবে যে আকলী তথা বিবেকের রায়েও সজিদা তাহিয়্যাহ্ মূলতঃ ও শরীয়ত সম্মতভাবে জায়েজ এ হিসেবে শরীয়তে তাজিমী সজিদা মূলতঃ বৈধ হওয়ার পক্ষে নির্দেশ প্রদান করতেছে যা মোস্তাহাবের মাঝে অবশিষ্ট আছে ওয়াজিব রহিত হওয়ার পর।

টীকা : (ক) ক্বাওলিহি বাইনাহুমা -----। উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ ছালাম ও সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ তথা তাজিমী সজিদার মধ্যে।

(খ) ক্বাওলিহি, ইয়াহুতাকিন্তু -----। সজিদার মাধ্যমে সম্মান করা বিবেক দ্বারা জায়েজ সাব্যস্ত হয়। অতএব বিবেকের রায়েও ইহা জায়েজ।

(গ) ক্বাওলিহি বক্বা ----। শরীয়তের হুকুম দ্বারা যখন ওয়াজিব চলে যাওয়ার পর জায়েজ বাকী থাকে, উহা হতেও সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ তথা তাজিমী সজিদা শরীয়তের দলিল মতে জায়েজ বুঝা গেল।

-- ক্বাওলে মুগনি- মমতাজুল মোহাদ্দেহীন মৌলানা ওবাইদুল আকবর (রহঃআঃ) এম.এম। উপরন্তু ফিরিশতাগণ আদম (আঃছাঃ) কে দুইবার সজিদা করেছেন। প্রথম তারা “আমর” এর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াজিব হিসেবে আদায় করেছেন; আর দ্বিতীয় সজিদা ওয়াজিব আদায় করার অবকাশ পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। দ্বিতীয় সজিদা যদিও সজিদায়ে শোকর ছিল কিন্তু ঐ সজিদাটি আদম (আঃছাঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই ছিল। আর ফিরিশতাগণের দৃষ্টিতে সম্মানী সজিদা যে মূলতঃ জায়েজ এরই ভিত্তিতে দ্বিতীয় সজিদা আদায় করেন, কিন্তু ওয়াজিব রহিত হওয়ার পর উহার বৈধতা অবশিষ্ট রইল। সজিদায়ে তাহিয়াহ্ অবশিষ্ট না থাকলে তা আদায় করার কথাও আসে না কেননা ফিরিশতাগণ কর্তৃক সজিদা করন আদম (আঃছাঃ) কে যা আমরের ওয়াজিব বিধান পালন দ্বারা সজিদা তাহিয়াহ্ রহিত হয় না, যে বৈধতাকে পর্যন্ত রহিত করে দেবে। যেহেতু অবশিষ্ট আছে অতএব ইহা আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত হিসেবে গন্য হবে এই হিসেবে যে যা তাহিয়াহ্ অর্থ সম্বলিত ও মোস্তাহাব। তা হলে ইহা আমাদের জন্যও দলিল যেমন, ‘উসুলের’ মধ্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে যে আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহ আমাদের জন্য দলিল স্বরূপ যখন ঐ সমস্ত শরীয়ত সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দরুদ শরীফ) বর্ণনা করেছেন কোন প্রকার ইনকার ছাড়া যতক্ষণ না উহার বিধান রহিত করন সম্পর্কিত কোন আয়াতে স্পষ্ট পাওয়া না যায়।

আয়াত অবতীর্ণের উপকারিতা হল স্থিরকৃত বিধানকে স্থাপন করা, অন্য উপকারিতা হল যা অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে অন্য দলিল স্থাপন করা প্রয়োজন হয় না। আর ইহাই “আস্লে কবির” বা মূল দলিল ইমাম আবু হানিফা (রাঃআঃ) এর মতে। এর উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ফক্বীহ আহকামে ও তার শাখা প্রশাখা বাহির হয়েছে। যদি ইহা আমাদের কিতাবে বর্ণিত হয় উহা ধর্মের একটা অংশে পরিণত হবে।

“আয়াতের অবতীর্ণের উপকারিতা” দ্বারা বুঝানো হয়েছে আমাদের কিতাব তথা কোরআন শরীফের সমস্ত আয়াতে কারীমা যা কাহিনীমূলক কিংবা আহকাম তথা বিধিবিধান মূলক হউক। কেননা “লাম” যা আল আয়াত এ রয়েছে ইস্তেগরাক এর জন্য যা খুবই স্পষ্ট। উহা ফিরিশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আদম (আঃছাঃ) এর সজিদাকে ও শামিল তথা অন্তর্ভুক্ত করেছে। যার বর্ণনা আল্লাহ তা’লা কোরআন শরীফে করেছেন। সুতরাং ফিরিশতাদের প্রতি সজিদার নির্দেশ আমাদের জন্য দলিল স্বরূপ।

টীকা : ক্বাওলিহি, শরা-আ-মিন ক্বাবলিনা ----- ।

“পূর্বকার শরিয়তের আমল আমাদের শরিয়তে অনুমোদিত হওয়ার অর্থ এই যে, পূর্বকার শরিয়তে যা ওয়াজিব ছিল তা আমাদের জন্য ওয়াজিব- এভাবে তাদের জন্য যা মুস্তাহাব এবং মুবাহ, উহা আমাদের জন্যও অনুরূপভাবে মুস্তাহাব ও মুবাহ। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃআঃ) এর বর্ণিত হাদিছ শরীফই দলিল। “ক্বালা কানান্ নাবিয়্য হাদ্বালাহ্ আলাইহি ওয়াছাদ্বাম ইয়ুহিক্বুল মাওয়াফিক্বাতা আহলুল কিতাবি ফিমা লাম ইউমারু ফিহি ----- ।” অর্থাৎ যে বিষয়ে আমাদের শরিয়তে কোন কিছু করার নির্দেশ হয় নাই, সেই বিষয়ে নবী করিম (দরুদ শরীফ) পূর্বকার আহলে কিতাবদের অনুকরণ করাটা ভালবাসতেন। আহলে কিতাবগণ তাদের চুলকে ‘হদল’ করতেন এবং মুশরিকগণ তাদের মাথাকে ‘ফরক’ করতেন। অতঃপর নবী করিম (দরুদ শরীফ) নিজ নাছিয়ত কে হদল করতেন।

অতঃপর ---

এই হাদিছ শরীফ মিশকাত শরীফে আছে এবং ইহা ছহীহ মুছলিম ও বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে। এতে বুঝা যায়, নবী করিম (দরুদ শরীফ) প্রত্যেক ব্যাপারে পূর্বকার শরিয়ত অনুসরণ করাটা ভালবাসতেন। ইহা ওয়াজিব/মুস্তাহাব/অথবা মুবাহ যাই হউক না কেন। গভীর দৃষ্টি করলে বুঝা যায়, পূর্বকার শরিয়তের প্রত্যেক আমল আমাদের জন্য মুস্তাহাব; কেননা নবী করিম (দরুদ শরীফ) উহার অনুসরণ করাটা ভালবাসতেন। পূর্বকার শরিয়তের আমলাদি আমাদের শরিয়তে ওয়াজিব হওয়াটা বাধ্যতামূলক না হলেও উহা মোস্তাহাব আমল হিসাবে আমাদের শরিয়তে অবশ্যই থাকে।

--ক্বাওলে মুগনি- মমতাজুল মোহাদ্দেহীন মৌলানা ওবাইদুল আকবর (রহঃআঃ) এম.এম। এতে করে “ফতোয়ায়ে কাজি খাঁ” এর সম্মানিত লিখক দলিল গ্রহণ করে বলেছেন যে, বাদশাহ্ তথা সোলতানকে উদ্দেশ্য করে কেউ যদি তাজিমী সজিদা করে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয় ইহা কুফরী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং কুফরী না হওয়া এর বৈধ হওয়ার আমল, ফিরিশতাদের প্রতি আদম (আঃছাঃ) কে সজিদা করার নির্দেশ এবং ইউসুফ (আঃছাঃ) কে তাঁর ভাইগন কর্তৃক সজিদা করা। “ফতোয়া এ ছেরজিয়ায়” উল্লেখ আছে যদি কোন ব্যক্তি সম্মনসূচক সজিদা করে কুফরী কাজ করে নাই। আল্লামা ছদরুশ শহীদ (রাঃআঃ) তদীয় ফতোয়া “আল কাফী” তে বর্ণনা করেন, “মান ছাজাদা লি গাইরিল্লাহি তায়ালা ওয়া ইউরীদুত তাহিয়াতা লা ইয়াকফুরু” অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে তাজিমী সজিদা করে সে কাফির হবে না। “কনজুল ইবাদ” নামক কিতাবে আছে কোন ব্যক্তি বাদশাহ্‌র দরবারে বাদশাহ্‌র সম্মানার্থে মাটিকে চুম্বন করে সে ব্যক্তি কাফের হবে না। কেননা ইহার দ্বারা সেই ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে সম্মান করার খেয়াল করেছেন ইবাদত তথা বন্দেগীর উদ্দেশ্যে করেন নাই।

সমস্ত ফক্বীহগণ এই কথাতে ঐক্যমত পোষন করেছেন যে, তাজিমী সজিদা করলে কোন ব্যক্তি কাফির হবে না। যেমন ফোকাহ এর সব কিতাবে উহা পরিলক্ষিত। কতক বর্ণনায় ‘মতলক’ তথা শর্তহীনভাবে সজিদা করাকে কুফরী বলা হয়েছে; আর “খোলাছা” কিতাবের লিখক ইহার বিপক্ষে বলেছেন যে, কোন কোন আলেম মতলক সজিদা কে কুফরী বলেছেন। তিনি বলেন উহা খেলাফুল আজহার বরং আলেমগণের মতামতের দ্বারা স্পস্ট হয়ে যায় যে ইহা এমন কাজ যার উপর আমল করা জায়েজ হবে না। আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সজিদা করা উহাই কুফরী, কেবল পাপ নয়। যখন তাজিমী সজিদা কুফরী নয়, ইহা দ্বারা প্রমাণ করে যে, উহা জায়েজ হয়। এ হিসেবে উহা আদায়কারী কখনো গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে না। সম্ভবতঃ ইহাই উদ্দেশ্য যাকে কুফরী না হওয়ার দিকে বিশ্লেষণ করা হল কেননা সজিদা দ্বারা তাহিয়াহ্ তথা সম্মানই উদ্দেশ্য, ইবাদত উদ্দেশ্য নয়।

উপরন্তু আসলে তাহিয়াহ্ তথা সম্মানের মূলে কোন পাপ নাই বরং উহা “আমরে মানদুব” তথা পুণ্যমূলক কাজ যা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। এ বিশ্লেষণ দ্বারা উদ্দেশ্য খুবই দূরে নয় যে তাজিমী সজিদা কোন প্রকার গুনাহ ও পাপ ব্যতিরেকে শরীয়তে জায়েজ।

টীকা : ক্বাওলিহি, ওয়াহয়া খিলাফুর আজহার -----। আমি বলতেছি ইহা ফেনী মোনাজেরায় তথা ধর্ম বিতর্ক সভায় বাতেল হিসাবে প্রমানিত হয়েছে। তনকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ কিভাবে লিখক বলেন, “ইহা দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সজিদা করা মতলক তথা শর্তহীনভাবে কুফরী প্রমানিত হয়েছে যার স্বপক্ষে তিনি দলিল হিসাবে আল্লাহর বাণী : “আইয়ামুরকুম বিল কুফরি বাদা ইজ আনতুম মুহলিমুন” অর্থ : তোমরা মুসলমান তথা আত্মসমর্পনকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন?” কে উল্লেখ করেন। ইহা তার অপব্যাখ্যা, তার যুক্তি যে ভুল তা পরিষ্কার, কেননা মতলক তথা শর্তহীন কে অবশ্যই মতলক তথা শর্তহীন হিসাবে বুঝতে হবে, কেননা উক্ত আয়াতে তাজিমী সজিদা কুফরী হওয়ার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। যেহেতু মতলক সজিদা অবশ্যই বিশ্লেষণের ব্যাপার, ইহা কি ইবাদতের, না সম্মানের। এই দুই প্রকার ছাড়া সজিদার আর কোন প্রকার নাই। যদি তিনি (তনকিহাতিছ ছুন্নিয়ার লিখক) মতলক তথা শর্তহীনভাবে সজিদা করাটা কুফরী বলেন, তা হলে তাজিমী সজিদাও কুফরী হওয়ার সম্ভাবনা বরং তার এই কথা অবশ্যই বাতেল কেননা ইহা ইসলামী মায়হাবের বিপরীত মত। অর্থাৎ ইসলামী মায়হাবের মত অনুযায়ী সজিদায়ে তাহিয়াহ কুফরী নয়। তাই বলতে হবে, আয়াতে উল্লেখিত কুফর শব্দ দ্বারা তাজিম বুঝায় না যা স্পষ্ট প্রমান বিদ্যমান আছে।

-- ক্বাওলে মুগনি- মমতাজুল মোহাদ্দেছীন মৌলানা ওবাইদুল আকবর (রহঃআঃ) এম.এম। নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর বাণী “লাউ কুনতু আমরতু আহাদান্ আই-ইয়াহুদা লি আহাদিন্ লা আমরতুল্ মারআতা আন্ তাসযুদা লি যাওযিহা” অর্থাৎ নবী করিম (দরুদ শরীফ) ইরশাদ করেন, আমি যদি অন্য কাউকে সজিদা করার নির্দেশ দিতাম অবশ্যই আমি স্ত্রীদের কে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীকে সজিদা করার জন্য। এ হাদীছ শরীফ দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ মোবাহ। আর যা কিছু মূলতঃ মোবাহ তার জন্য নির্দেশ প্রদান না করাতে তা মাকরুহ বুঝা যায় না, তাহলে হাদীসের উক্তি দ্বারা তা হারাম বুঝায় এ জাতীয় মত পোষণ করা কিভাবে বিপুল হবে? যদিও মানা যায় যে হাদীসের বাহ্যিক উক্তি দ্বারা তা অপছন্দনীয় ও মাকরুহ বিবেচিত হয় কিন্তু যখন তার মূল জায়েজ হিসেবে প্রমান আছে, তা-হলে মূলগত ভাবে তা মাকরুহ এমন অর্থ পোষণ করা যায় না। তখন হাদীছ শরীফকে ধরে নিতে হবে যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ বাহ্যিকভাবে অপছন্দনীয়, উপরন্তু অনেক বস্ত্ত বিদ্যমান আছে যার সূরত তথা বাহ্যিক দিক অপছন্দনীয় কিন্তু তার অর্থ ও উদ্দেশ্য অপছন্দনীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত নয় বরং হাদীছ শরীফের প্রেক্ষাপট নবী করিম (দরুদ শরীফ) তখনকার সময়ের কল্যাণের দিকে নজর রেখে ইহা ইরশাদ করেছেন, ইহা নিতান্তই মাকরুহ তথা নাজায়েজ, এ হিসেবে নয়। এতে করে বুঝা যায় যে সজিদায়ে তাহিয়াহ আদায়কারী গুনাহগার হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।

টীকা : ক্বাওলিহি, ওয়াতাহরিমু -----। তার কথা, “ইহা হারাম” চট্টগ্রাম, হাটহাজারী মাদ্রাসার জনাব মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেব তার “আল ফায়হালা” নামক রেহালায় নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর হাদীছ : “লাউ কুনতু আমারতু আহাদান্ আই ইয়াহুদা লি আহাদিন্ লা আমারতুল্ মার- আতা আন্ তাহুদা লিজাওজিহা” অর্থাৎ নবী করিম (দরুদ শরীফ) ইরশাদ করেন, আমি যদি কাউকে অন্য কাউকে সজিদা করার

নির্দেশ দিতাম অবশ্যই আমি স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীকে সজ্জিদা করার জন্য - এই হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, 'স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য অধিক প্রয়োজন বুঝায় এবং ইহার দ্বারা সজ্জিদা তাহিয়াহ হারাম হবে কিনা তাহা বিশ্লেষণের দরকার। আমি বলতেছি, ইহার বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই; কেননা নির্দেশ যখন অনেক উচ্চস্তরের সম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে, তাই সম্মানী ব্যক্তিদের সম্মান ব্যতীত অন্য কিছু বুঝায় না। ইহা দ্বারা সম্মানী ব্যক্তিদের অধিক সম্মান করা জায়েজ্‌ যা মূলতে মুবাহ।

-- ক্বাওলে মুগনি - মমতাজুল মোহাদ্দেহীন মৌলানা ওবাইদুল আকবর (রাহঃআঃ) এম.এম।

قال في التفتيحات اگر کوئی اچھا آدمی اچھا خواب دیکھے تو اگر گنہگار ہو تو راست کر دیا جائے جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر سجدہ کرایا جس کو مدعی نے صفحہ ۲۵ میں ابن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اپنے لئے مفید سمجھ کر نقل کیا ہے قد اقر صاحب التفتيحات ان تلك الرويا حسنة ولو كانت قبيحة لم يصدقها النبي عليه السلام فان الرويا القبيحة لا يجوز تصديقها وانما كانت حسنة بالنظر الى ان ذلك السجود في الاصل لا حسنة فلما كان حسنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على جبهته الشريفة وذلك السجود وان

كان في الظاهر لتأويل الرويا قصد يقفها لكنه في المعنى لتعظيمه صلى الله عليه وسلم
فلذلك كان حسناً فان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم حسن جداً الا يرى انه لو لم
يكن ذلك السجود لتعظيمه صلى الله عليه وسلم وظاهر انه لم يكن لعبادة الله تعالى
فانه لا معنى لعبادته تعالى على جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مراد ان يكون ذلك
السجود امراً لغواً فانه ليس قسم ثالث للسجود سواء كونه للتخية والعبادة والامر
الذي يكون لغواً لا يكون حسناً قط فلما تحقق انه لتعظيمه صلى الله عليه وسلم مع
كونه في الظاهر لتأويل الرويا وقد وجد فيه التقرير بل الامر منه لفعله وقد
اختار الكلفة على بدنه الشريف لفعل ذلك السجود فقد حصل الدليل على انه لا يتم
في سجد التعظيم بل حصل الدليل على جوازه فان ذلك السجود كان لتعظيم جسده
الشريف فجواز السجود على الجسد لتعظيم الجسد يفيد جوازه الى الجسد لتعظيم
الجسد وكونه لتأويل الرويا لا ينافي هذا الجواز فان خصوص النص بحسب محله
ومورده لا ينافي ثبوت الحكم منه على العموم كما في الاصول وقد ذكر في هذا الج
النبوة ان عكمه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع عن ذلك -
السجود ولو وجد نص للجواز والف نص لعدم الجواز يؤول نصوص عدم الجواز
الى ما استفيد من نص الجواز افادة الغرالى في **الاحياء** وتمسك بعض المانعين
بقوله تعالى : **لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ**
إِنْ كُنْتُمْ رِيبًا كَاتِبُونَ هـ اس آيات میں فرماتا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب
کو سجدہ مت کرو و ظاہر ہے کہ اسمیہ سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے کیونکہ کفار کو اکابر اور
اصنام کو خالق اور معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے بلکہ ان کو سجدہ بوجہ عظمت اور تقریب کرتے
اور حصول مرام کے لئے انکو وسیلہ جانتے جیسا کہ اس زمانے میں پیر پرست لوگ کرتے ہیں،
یہ چونکہ اس آیت میں سجدہ کے قسم نہیں بیان کئے گئے مطلق سجدہ مراد لینا ہوگا پس آیت میں
مطلق سجدہ کے حرمت کا حکم ہے لہذا اس آیت سے غیر اللہ کو تعظیماً بھی سجدہ کرنا حرام ثابت ہوا

قال هذا القائل أولاً المراد بالسجود في الآية هو سجد التعظيم خاصة كما يشهد به قوله اسجدك سجد من مراد سجد تعظيمي به، ثم قال بعد ذلك ثانياً انه لما لم يبين فيها قسم السجود يراد به فيها مطلق السجود كما ينطق به قوله يزجركم آيت من سجد في قسم بيان ليس كمنى مطلق سجد مراد لينا هو كما، فهو ادعى كونه لمطلق السجود بعد دعواه كونه لخصوص التعظيم ففي دعواه ظاهر التناقض وهو دليل لبطلانه ولو سلم صحة دعواه لكن لا ضرر فيه فانه اراد من مطلق السجود اطلاقه عن سجود العبادة وسجود التحية فلو سلم صحة ما اراده لكن النهي عن السجود مطلقاً فيها اي تلك الآية لا يخلوا اما ان يفيد حرمة ضد فقط او يفيد حرمة جميع - اضداده على الاول يلزم ان يفيد حرمة السجود مطلقاً لهما اي للشمس والقمر، فقط لا غيرهما وعلى الثاني يفيد حرمة سجود العبادة لله تعالى وهذا مما يستحيل العقل فلا بد ان يكون المراد هو الاول اي افادة حرمة ضد فقط فحينئذ يكون معنى الآية لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مطلقاً فقط واسجدوا لله الذي خلقكم ان كنتم ايتاء تعبدون على هذا لا يفهم من الآية حرمة سجود التحية لغيرهما اصلاً بل ارادة اطلاق السجود غير جائزة اصلاً بقريظة اسجدوا فان هذا الامر وقع في مقابلة ذلك النهي فيكون المراد بالسجود المذكور فيهما سجوداً واحداً ليصح التقابل بينهما والمراد بالسجود في اسجدوا وهو سجود العبادة فان سجود التحية غير جائز لله تعالى فانه بمعنى السلام والسلام لا يجوز لله لانه في معنى الدعاء لمن يسلم عليه مع تعظيمه ولا يجوز الدعاء لله تعالى والتحية لله ليس في هذا المعنى فيكون المراد بالسجود في لا تسجدوا ايضاً هو سجود العبادة فانه ان امر به في عموم السجود يلزم ان يكون بهذا العموم معتبراً في اسجدوا فيلزم ما يلزم وارادة عموم السجود - في لا تسجدوا وارادة خصوصه بالعبادة في اسجدوا مما لا وجه له اصلاً بل لا يجوز ان يراد عموم السجود في لا تسجدوا فان الآية نزلت في منع الاشرار

بأنه بسجود الشمس والقمر وإنما يحصل معنى الاشتراك بالله بسجودهما للعبادة لا
لتحيتهما بالسجود وحرمته التحية لهما لا بالنظر إلى أن فيه معنى الاشتراك بالله بل بالنظر
إلى أن نفس التحية لها حرام ثم قال ذلك القائل أيك آيت اور ملاحظه ہو، قوله تعالى
أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ^٥ اس آيت پاک سے غیر اللہ کا سجود موجب کفر
ثابت ہوا اس لئے کہ سب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو سجد کرنے کی اجازت مانگی اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے یہ آرٹ صرف تعظیم کے لئے تھی نہ عبادت
کے لئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس آیت میں صراحت کے ساتھ مخلوق کو سجدہ کرنے کو کفر ٹھہرایا گیا
اقول انه لو اراد بالسجود في قوله غير الله كما سجد موجب كفر ثابت ہوا، مطلق السجود
فہو خلاف الاظهر لما قد ہناہ عن الخلاصۃ وان اراد به سجود العبادۃ فلا كلام فيه
وان اراد به سجود التحية بالخصوص فہو خلاف المذهب فانه لم يقل احد من
علماء المذهب ان سجود التحية كفر فكيف يكون كفراً وقد ورد به الامرد الامر
لا يرد بالكفر بل كان سجود التحية مندوباً في شرع من قبلنا والكفر لا يجوز ان يكون
مشروراً بمعنى مباح في شريعة من الشرائع فضلاً ان يكون مندوباً فيها
وقوله تعالى أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ^٥ لا تدل على
كون سجود التحية كفراً فانه يظهر بعد النظر فيه انه تعالى منع فيه عن اتخاذ

قوله ان سجود التحية كفر :- سجود التحية لما لم يكن كفر عند الجمهور وعلم ان مافي النزلية من
قوله السجدة لہؤلاء کفر الخ ان كان المراد به هو سجود التحية فہو خلاف ما ذهب اليه علماء المذهب
وان كان المراد به غير ذلك السجود فلا كلام فيه بل الصواب ان يقال ان الاشارة بهذا الى
الجبارة من السلاطين بقونية ان مثل هذا القول وقع في العالمگیریہ وقد اشار به فيها
الى الجبارة كما سيأتي لكن كان على صاحب النزلية ان يقول انه كسيرة من الكبار
كما وقع فيها فما قال انه كفر فہو خلاف المذهب فما استدلل به على كفره
في مناظرة فينى بذلك القول فہو باطل ۱۰

في عبید الاکبر

سورة النحر

الملائكة والنبيين ارباباً كما يشهد به ما في تلك الآية من قوله تعالى وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فالمراد بالكفر هنا هو اتخاذ الملائكة والنبيين ارباباً لا سجود التحية كما قال ذلك القائل فلو سلم ان نزول تلك الآية لمنع سجود الصحابة للنبى صلى الله عليه وسلم حين ارادوا ان يسجدوا له لكن يفهم بعد التعق في منع الآية انه لم يكن ذلك السجود سجود تحية والا لم يطلق عليه لفظ الكفر وسجود التحية ليس بكفر عند احد كما علمت بل كان سجوداً فيه معنى ما يتحقق به اتخاذ ارباباً بدليل قوله تعالى وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ايضاً بدليل ان الكفار من النصارى واليهود كانوا يعبدون للجبوت والطاغوت ويتخذون اربابهم ورهبانهم ارباباً ويسجدونهم بسجود الربوبية قال الله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجُبُوتِ وَالطَّاغُوتِ أَتُخَذُوا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِينَ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ قَالَتِ الْيَهُودُ غَرِيبٌ إِنَّ اللَّهَ وَالنَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ الو فهذه النصوص تشهد بمفاهيمها انهم كانوا يجعلون اربابهم ورهبانهم ارباباً ويسجدون لهم بسجود الربوبية فلما رى ذلك بعض

* قوله سجود الربوبية ذلك الخ لان النصارى يعتقدون ان اللاهوت تحل في ذوات اربابهم كمال رياضتهم فلهم ارباب لهم فيسجدونهم بذلك الاعتقاد واليهود يزعمون ان الاشياء تحل بتحليل اربابهم وتحرم بتحييتهم فيطيعون لهم في ذلك زعماً منهم انهم ارباب لهم فيسجدونهم بذلك الاعتقاد وهذا معنى قوله تعالى أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فالمراد يا ايها المسلمون ايأمركم ان تعتقدوا في حق النبي كما يعتقد النصارى واليهود في حق الاحبار والرهبان حتى يسجدوا له سجود الربوبية كما يسجدونهم بذلك السجود وقوله تعالى لَا تَتَّبِعْ بَعْضًا مِنْهُمْ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى فَظَهَرَ بطلان ما في مناظرة فيني، (باقي آئدة صفح ٥٨ من

من الصحابة تمنى في حضرته ان يسجد له كما يصح حديث سعد بن قيس رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله ^{صلى الله عليه وسلم} احق ان يسجد لله فأتيت رسول الله فقلت اني أتيت الحيرة فرايتهم يسجدون لمرزبان لهم فأتيت ابا عبد الله فقال لي ارايت لو مررت بقبري اكنت تسجد لله فقلت لا فقال لا تفعل لو كنت امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لارواحهن لما جعل الله لهم عليهن من حق مشكوة عن ابي داود وهذا الحديث وكن الاحاديث التي وردت في منع السجود كلها ضعيفة ودليل ضعفها ان ذكرها وقع في الفصل الثالث من المشكوة وما وقع ذكره فيه من الاحاديث ضعيف ولو لم ينظر الى ضعف الحديث فوجه منع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن القيس عن السجود له مما لا يخفى على ارباب النظر وذلك ان سعدا لما رأى ان النصاري يسجدون لمرزبان لهم تمنى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسجد له وقد كان في الاسلام جديداً فخاف النبي صلى الله عليه وسلم بانه ان اجازة في السجود يمكن ان يجعله رياءاً ويسجد له سجود الرب كما ان النصاري واليهود اتخذوا اعبادهم ورهبانهم ارباباً ويسجدونهم بذل السجود - فلذلك قال له ارايت لو مررت بقبري اكنت تسجد له معناه لو تريت ان تسجد لي كما يسجدون لاهبارهم ورهبانهم فهم يتخذونهم ارباباً ويسجدونهم بسجود الرثوية حتى يسجدون لقبورهم ايضاً زعماء منهم انهم ارباب لهم فهل انت ترى ان تجعل لي رياءاً وتسجد قبوري فقال لا اري ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الامر كما قلت فلا تفعل كما يفعلون وفيها

كذبة صفة كما - من ان سجود النجاسة يستحقه تعالى ايا مكرم بال كفر بعد اذ انتم مسلمون وقوله تعالى لا تتخذ بعضنا بعضا الؤولم يقل احد من اهل التماسير بذل لك اي يستغفر

اموالكم بالسجود بها تين الايتين بل كعني لشغفه بها كما سياتي في قول المؤلف *

القول المغني لعين الاكبر

عن مطلق الفعل لا عن خصوص السجود ليتحقق به التهي عن جميع ما يفعله النصارى
 في تعظيم احبارهم من اتخاذهم ارباباً وسجودهم بذلك الاعتقاد فمعنى تفعل في الحديث
 لا تجعل لي رقباً ولا تسجد لي في حياتي وبعد مماتي في قبري كما يسجدون لاجبارهم
 في حياتهم وبعد مماتهم في قبورهم فالتهي يرجع الى هذا التقييد لا الى خصوص السجود
 فقط. بهذا يعلم ان سجود ابن القيس لم يكن لمجرد التحية والاله يقل النبي صلى الله
 عليه وسلم له لو مررت لقبري اكنت تسجد له الا ولا يعنى لكون سجود التحية
 للقبر فلما قال له ذلك يفهم منه ان سجوداً له ولو كان للتعظيم لكن كان فيه معنى
 ما يؤدى الى اتخاذ ربا وقد كان السجود با اتخاذ المسجود رباً شأنه في ذلك شأن
 كما يظهر ذلك من سجود النصارى للاجبار وكان سجودهم لغير سجود الربوبية.
 فلذلك قال له لا تفعل اى لا تسجد لي كما يسجد النصارى للاجبار وايضاً كان
 غرضه من السجود له اطاعته به ولو لا ذلك لم يقل له لو كنت امرت احد ان
 يسجد لاحد الا فأت سجد المرأة لزوجها انها يكون لاطاعتها له لا للتعظيم فان
 اطاعته واجبة عليها لا تعظيمه والاطاعة وان كانت عامة من العبادة لكن عند
 تقيدها به تكون بمعنى العبادة فان المقصود به حينئذ يكون تقرب من يطاع
 له به وهو معنى العبادة فتأمل ووجه عدم اجازته للسجود له ولو على وجه
 التحية هو ان من كان يدخل في دائرة الاسلام كان في اعتقاده قبل اسلامه ان
 السجود يجوز للاجبار وهم ارباب وقد كان يسجد للجبوت والطاغوت فلو اجاز
 النبي صلى الله عليه وسلم بسجود التحية له كان فيه خوف ان يسجد بالسجود
 الذي كان يسجد به للاجبار بل للجبوت والطاغوت وهو سجود الربوبية
 فلذلك لم يجز له للسجود مطلقاً كما لم يجز لمطلق الشرب من الخمر والذبا
 خوف ان يميلوا الى شرب الخمر فانها اواني لشربه فاطلاق عدم الاجازة
 بالسجود مبنى على المصلحة كما بينا وسجود التحية وان كان للتعظيم لكن

التعظيم به دون التعظيم بسجود الربوبية توضيحه ان التعظيم وان كان فعلاً من الافعال لكن الناس لا يعظمون عادة لمن لا تكون له العظمة حاصله بالفعل والعظمة في مرتبة طبيعتها عرض يكون مشتقاته من المشككات فيكون بعض العظماء اعظم من البعض فلما كان في مشتقاتها تشكيك علم ان في التعظيم من حيث كونه متنسبا اليهم ايضاً تشكيك بحيث ينتزع العقل من الازيد منه امثال انقضه فالتعظيم بسجود الربوبية يكون ازيد من التعظيم بسجود التحية وهو بالاول في اقصى المراتب منه وازيد هاو بالثاني في انقصها وادقها فالاول مختص بالله تعالى لو كان لغيره يكون كفر ومن كان اراد ان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود لعله اراد ان يعظمه بالاول فلذلك قال الله تعالى لا يا مكرم ان تتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً يا مكرم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون الآية ويا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الايها الذين كفروا اليتيم اتخاذهم ارباباً وسجودهم بسجود الربوبية لا سجودهم بسجود التحية فانه ليس بكفر عند احد من علماء المذهب كما علمت فلما لم يجز ارادة سجود التحية بخصوصه من الكفر في اليتين علم انه لا يجوز ان يراد منه مطلق السجود ايضاً فانه لا يبقى حينئذ على اطلاقه بل يخص بنفذه الذي هو غير سجود التحية وهو سجود الرب كما لا يخفى فلو سلم صحة ما قال ذلك القائل اور ظاهره كصوابه في آرزو من تعظيم كنهه في نكر عبادت كنهه لكن لا يجوز ان يكون ذلك حجة على منع سجود التحية لما علمت بل لو سلم ان مرادهم بذلك التعظيم كان سجود التحية ايضاً لا يجوز ان يكون حجة المنع له فانه كان مشتبهاً بسجود الربوبية في ذلك الزمان لكونه زمان ابتداء الاسلام فالحكم بالكفر به في ذلك الزمان بالنظر الى هذا الاشتباه لا بالنظر الى خصوص سجود التحية فانه خلاف المذهب كما علمت بهذا تبين وجه عدم اجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالسجود حين استاذنوه ان يسجدوا

له كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والانصار فجاء يعير فسجد له فقال اصحابه يا رسول الله تسجد لك البهايم والشجر فحن احق أن تسجد لك فقال ولعبد واريكم واكرموا اياكم لو كنت امرت احدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ايتها

ان تنقل من جبل ابيض الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل ابيض كان ينبغي لها ان تفعله الا بل يظهر عند التأمل ان الاكرام بالسجود جائز من هذا الحديث فان واعبد واريكم لجنس العباد فينبغي ان يكون واكرموا اياكم لجنس الاكرام كما يحكم به اطلاقه فيفيد خصوص الاكرام بالسجود لان الخاص يكون تحت العام وقوله عليه ^{الصلوة} السلام لو كنت امرت احدا الا ينافي هذا المعنى فان مثل هذا الكلام ربما يتأق في محل التهديد لما قبله في المحاوراة ففيه نوع تأكيد على ما ادعينا على هذا يكون معنى الحديث اكرموا اياكم بكل ما يكرم به عادة -

والاكرام بالسجود داخل تحت هذا العموم وتقيده بغير السجود تقييد للمطلق والاصل ان يبقى المطلق على اطلاقه كما في الاصول فان قيل ليس ذلك تقييد للمطلق بل تقرير لما هو مراد الحديث فان الاكرام بالسجود حرام لقوله عليه ^{الصلوة} السلام لسلمان حين اراد ان يسجد له لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد

له قوله : ولعبد واريكم الا يفهم بظاهرة انه يتقرر قسوى السجود في اعبد واريكم تقرير لسجود العباد وفي اكرموا اياكم تقرير لسجود التكرمة وذلك لان هذا الحديث وقع جوابا لما تمنى الصحابة عند من السجود له وانت تعلم ان الجواب ينبغى ان يكون موافقا للسؤال فلما كان جوابا لتمنى السجود يكون مغناه واعبد واريكم بكل ما يعبد به واكرموا اياكم بكل ما يكرم به وسجود التحية من جملة ما يكرم به والصحابة لم يركبوا الاكرام بالسجود لابلانظر الى انه حرام بل بالنظر الى انه لا يوجد فيه اذن صريح ويجوز ان لا يكون المباح ما ذواته فيه لصلحته او عامته وما لا يكون ما ذواته لو كان مباحا في اصله يكون تركه أولى فبالنظر الى هذا المعنى امتنع الصحابة عن السجود له ^{صلى الله عليه وسلم}

القول المخفى لعبيد الاكبر ،

الا الله او ما يكون حراماً لا يكون داخل تحت الامر فليس هنا تقييد للمطلق بل تقرير لما هو مراد الحديث اقول ان مفاد قوله عليه السلام لسان لا ينبغي لمخلوق ان يستعمل الا في طلب شيء يحرم الاكرام بالسجود فان لفظ لا ينبغي المذكور فيه لا يستعمل الا في طلب شيء يفوت فيه معنى الاستحقاق ينبغي ان يعلم انه يظهر بالنظر الى افادة كلمة الا للاحصاء ان المستحق لمطلق السجود هو الله تعالى لا غيره سواء كان لله بدلاً من لاهل او مستثنى منه وفيه نظر فان الله تعالى لا يستحق لسجود التحية كما علمت فلا بد ان يقال ان كلمة الا هنا ليس لحصر استحقاقه لمطلق السجود بحكم الاستثناء بل لافادة استحقاقه له بطريق الاضرب عن الحكم المتني بلا ينبغي فيكون معناه - لا يحق لمخلوق ان يسجد لاحد بل ينبغي له ان يسجد لله في معنى الا هنا مستعار عن معنى بل مع هذا ايراد من استحقاق مطلق السجود استحقاق خصوصه للعبادة باعتبار تحقق ذلك المطلق في ضمن تحقق هذا المخصوص وهذا المعنى لا يجوز ان يراد في صورة الاستثناء فان المعنى حينئذ يكون انحصار المطلق لله تعالى كما هو مفاد الاستثناء وهو يضاد ان يراد من عمومه معنى المخصوص منه نصاً مراد الحديث ان الله تعالى لما كان مستحقاً للسجود فليس الا في ان يستجد لغيره بل الا في ان يسجد له والمراد بالاولى ما يعم الواجب من سجود تعالى وما يعم المحرم من السجود لغيره والقول بان السجود مطلقاً انما يكون للعبادات باطل كما لا يخفى فلما علمت مراد الحديث فقد ظهر لك انه لا يجوز ان يكون ذلك الحديث نصاً للتحريم فان مفاده ان تركه لغيره او في لا تحريمه وما يكون تركه اولى ببقی الجواز في ضده انما الاختلاف في ان جازة هل هو مع الكراهة فعند البعض مع الكراهة وعند العامة بدونها ولما لم يصح ان يكون ذلك الحديث نصاً للتحريم لا بالنظر الى معنى لا ينبغي ولا بالنظر الى معنى الا وليس نصاً لغيره التحريم سواء ذلك الحديث يكون امراً هو الا كما لوجوب الاكرام بحيث لا يوجد

لا يوجد فيه السجود فيكون ذلك الامر لا باحة
بالضرورة فإنه لا يفيد الوجوب بالنظر الى نفس الاكرام كما هو ظاهر ولا بالنظر الى
كونه بحيث لا يكون فيه السجود فإنه قد تحقق ان تركه أولى وما يكون تركه أولى لا يدخل
تحت وجوب ضداً فيكون مراده يباح لكم ان اكرموا ائمتنا كما هو سواء كان بالسجود او بدونه
لكن الاكرام بغير السجود أولى والصحابة رضى الله عنه لم يسجدوا عليه الصلوة
والسلام بالنظر الى هذا المعنى اى بالنظر الى كون الاكرام بغير السجود أولى
لا بالنظر الى كونه محرماً فإنه لا دليل على حرمة أصلاً حاصل ما في الباب انه لما
كان الاكرام بغير السجود أولى لوقيد به امر اكرموا ائمتنا كما يكون معناه اكرموا
ائمتنا بغير السجود الذى يكون تركه أولى فالسجود الذى يكون تركه أولى لا يجوز
أن يوجد الاكرام بحيث يجب أن لا يوجد فيه السجود كما لا يخفى فلما انتفى
هذا الوجوب علم ان حمل ذلك الامر على معنى النهي بمعنى لا تكموا ائمتنا
بالسجود باطل ووجه بطلانه ان الامر الذى لا يكون للوجوب فان كان للنهي
فعند البعض وان كائيد كراهة ضداً لكن يحكم على ضداً انه جائز مع الكراهة
وما يفيد جواز ضده مع الكراهة لا يجوز ان يستعار به ما يفيد معنى تحريم ضده
وهو النهي لذلك الضد فتأمل وان كان ذلك الامر لا باحة فيبطلان حمل على
معنى ذلك النهي ظاهر فوض من ذلك ان حمل اكرموا ائمتنا على الاكرام بغير
السجود ليس فيه تقرير ما هو مراد الحديث بل تقييد للمطلق ببعض محتملات
فلما ثبت ذلك فاقول انه يظهر بالملاحظة بين الحديثين ان معنى ان كتبت

له قوله حمل ذلك فلما لم يجز حمل ذلك الامر على معنى النهي علم ان من قال انه لا فائدة بوجوب
عدم السجود في الاكرام فقوله مما لا يجوز ان يعتمد عليه فإنه لو كان لا فائدة بوجوب عدم
في الاكرام لصح حمل على معنى نهى الاكرام بالسجود وحمله على ذلك غير جائز لما
قلنا انه انما يجوز حمله على ذلك اذا كان امر الاكرام بغير السجود للوجوب وهو
ممنوع فان اكرام الاخر بغير السجود ليس بواجب أصلاً

القول المعنى لعبيد الاكبر

أمرت للاكرام بالسجود لامرت المرأة أن تسجد لزوجها للاكرام لحق له عليهما
 لكن الاولى لمخلوق ان لا يسجد لاحد من دون الله فان تكرموا الخاكم فالاولى ان
 يكون ذلك الاكرام بغير السجود فامر اكرامها بما يعنى الخبر فيفهم من فحواه ان
 اكرام الاخ بالسجود عند من يقول ان النذب يتضمن كراهة ضداً مكره صورة انما
 قلنا انه مكره عنده صورة لما علمت ان سجود الاكرام في الاصل مباح ويكون مباحاً في
 اصله لا يجوز ان يكون مكروهاً في معناه من غير ان يوجد فيه ما يورث الى كراهته من
 العوارض واما من لا يقول يكون النذب متضمناً لكراهة ضداً فلا وجه لكونه
 مكروهاً عنده معنى ايضاً كما لا يخفى وقد ورد التصريح في الاحاديث التي وردت في
 هذا الباب انما صلى الله عليه وسلم يأمر بالسجود لمن طلب الاجازة عنده أن
 يسجد له فيجوز ان يكون عدم امره به كعدم امر الضيف للذبح حين قال له مضيه
 اريد أن اذبح لك فقال لا ينبغي ان تذبح لي فعدم الامر انما يكون بالنظر الى المصلحة
 لا بالنظر الى كون الذبح مكروهاً ويتوجه اليه قوله عليه الصلوة والسلام لا بن القيس
 فلا تفعل حين اراد ان يسجد له فان النهي هنا شخصي فيجوز ان يكون لمصلحة خاصة
 له كما هو مقتضى الشخصيات من الافعال فلا يفيد التحريم المطلق فإن النهي الشخصي
 لا يفيد ذلك فلما تبين ما ذكرنا ان سجود التسمية مباح في اصله فقد وضح ان
 القول بانه حرام قطعاً مما لا يلتفت اليه بل هو قول من لا يقدر على ادراك حقائق

له قوله حرام قطعاً له اذ لم يوجد نص قطعي للحرمه لا يجوز اطلاق الحرام لما في الهداية الا
 انه لم يجد نصاً قطعياً لم يطلق عليه لفظ الحرام ولما كان في تلك الاحاديث ضعف صريح مع ما
 فيها من احتمال كون السجود سجود الاطاعة او الربوبية او مطلق السجود لا يفيد حرمة
 سجود التسمية بخصوصه قطعاً فانه يجوز ان ينصرف اطلاقه الى غير فبطل به ما في مناظره فينى
 من قوله ان حرمة قطيعته لانه ثابتة بالاجماع والاجماع دليل قطعي لانه لا دليل على انعقاد
 الاجماع على حرمة حتى يكون قطعياً ١٢ القول المقتضى العبيد الاكبر

ষষ্ট পরিচ্ছেদ

সিজদা সম্পর্কিত আল্ কোরআনের আয়াত ও

হাদিস শরীফ সমূহের অপব্যাখ্যা খন্ডন

অনুবাদ : (তানকিহাতিছ ছুন্নিয়ার লেখক বলেন) যদি কোন ভাল লোক ভাল স্বপ্ন দেখে যদি সুযোগ থাকে তা-হলে উহাকে বাস্তব করে দেওয়া হয়, যেমন রাসুলুল্লাহ (দরুদ শরীফ) এর কপাল মোবারকের উপর সজিদা করেছিলেন যাকে সজিদা তাহিয়া এর জায়েজের দাবীদার তাঁর লেখনীর ২৫ পৃঃ উল্লেখ করেছেন হযরত ইবনে খাজিমা বিন ছাবেত (রাদিঃআঃ) হতে নিজের দলিলের স্বপক্ষে লাভ হবে মনে করে বর্ণনা করেছেন। আমি বলি “তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ” এর লেখক নিজে স্বীকার ও মেনেছেন যে ঐ জাতীয় স্বপ্ন উত্তম আর উহা যদি মন্দ স্বপ্ন হত নবী করিম (দরুদ শরীফ) উহাকে কখনো সত্য বলে স্বীকৃতি দিতেন না - কেননা খারাপ স্বপ্ন হতে খারাপ স্বপ্ন উহা সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া জায়েজ নহে। উপরন্তু উহা ছিল উত্তম এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে, ঐ সজিদা ছিল মূলতঃ উত্তম। সজিদা যখন উত্তম বলে বিবেচিত হল এ কারনে নবী করিম (দরুদ শরীফ) স্বীয় মোবারক কপালে সজিদা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন আর ঐ সজিদা যদিও প্রকাশ্যে স্বপ্নের তাবির ও সত্য বলে স্বীকৃতির জন্য ছিল কিন্তু মূলতঃ তার অর্থ নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর প্রতি সম্মান দেখানো আর এতে করেই উহা উত্তম হল; কেননা রাসুলে পাক (দরুদ শরীফ) কে সম্মান করা সর্বাধিক উত্তম কাজ। তিনি কি ভাবেন নাই যে, যদি এ সজিদা নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর সম্মানের উদ্দেশ্যে না হত এবং ইহাও প্রকাশ্যে যে উহা ইবাদতের সজিদাও ছিল না, কেননা নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর কপাল মোবারকের উপর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সজিদা করার কোন অর্থ হয় না, তা হলে নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর নির্দেশ মোবারক অযথা ও অনর্থক পরিনত হওয়া অবশ্যক হয়ে পড়ে; কেননা সজিদার তৃতীয় কোন প্রকার নাই; সেটা হয়ত তাহিয়া কিংবা ইবাদতেরই হবে। আর নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর নির্দেশ অনর্থ ও অযথার জন্য হতে পারে না।

এতে করে স্পষ্ট হয়ে গেল যে এ সজিদা নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর তাজিম তথা সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল। সাথে সাথে উহা দ্বারা প্রকাশ্যে স্বপ্নের তাবিরও হয়ে গেল। ইহা হতে ইহার বৈধতা প্রমানিত হল বরং নবী করিম (দরুদ শরীফ) হতে উহা সম্পাদন করার নির্দেশ এবং নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর শরীর মোবারকে (কালফা) কষ্ট মেনে নিয়াছেন ঐ সজিদার কাজ সম্পাদনের করার জন্য।

এখন দলিল পাওয়া গেল যে তাজিমী সজিদা আদায় করনে কোন প্রকার গুনাহ হয় না, বরং উহা যে জায়েজ তাই প্রমানিত হল কেননা ঐ সজিদা নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর শরীর মোবারকের সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল। অতএব শরীরের সম্মানার্থে শরীরের উপর সজিদায়ে তাজিমী করা জায়েজ হওয়া; শরীরের সম্মানের উদ্দেশ্যে শরীরের দিকে সজিদা জায়েজের দলিল গ্রহণ করে এটাই স্বপ্নের তাবিরের জন্য হওয়া; এই বৈধতা অস্বীকার করে না।

কেননা “খসুসুন নস” তথা নসের স্থান ও পাত্র বিশেষের জন্য খাস হওয়া সাধারণভাবে সার্বজনীন প্রক্রিয়ায় ইহার বিধান ছাণিত করা নিষিদ্ধ করে না, যেমন উসুলের কিতাবে উল্লেখ আছে। “মদারেজুন নবুয়ত” কিতাবে বাংলা পাক ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় হাদিসবেত্তা শাহ আবদুল হক মুহাম্মেস দেহলভী (রহঃআঃ) এই হাদিছটি

বর্ণনা করেছেন, “ইন্না আকরামাতা ছাজাদা রাছুলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াহাল্লাম ওয়ালাম ইয়াম্ না’হ্ আন্ জালিকা” অর্থাৎ হযরত ইকরামা (রাদিঃআঃ) রাসুলুল্লাহ্ (দরুদ শরীফ) কে সজিদা করলেন অথচ রসুলে পাক (দরুদ শরীফ) তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নাই। যদি সজিদায়ে তাহিয়া জায়েজের পক্ষে একটি নছ/দলিল পাওয়া যায় আর নাজায়েজের পক্ষে হাজারো ‘নস’ পাওয়া যায় তাহলে নাজায়েজের সব ‘নস’ গুলিকে তাবির করা হবে জায়েজের ‘নসের’ প্রাপ্য অর্থের দিকে। ইমাম গাজ্জালী (রাহঃআঃ) “ইহয়াউল উলুমুদীনে” উল্লেখ করেছেন, তাজিমী সজিদা নাজায়েজের পক্ষের কতক সংখ্যক লোক আল্লাহ্ তা’লার এই বাণী দ্বারা তাজিমী সজিদা নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে মত পোষন করেন, যেমন আল্লাহ্ তা’লার বাণী “লা তাছজুদু লিস শামসি ওয়ালা লিল ক্বামরি ওয়াছজুদু লিল্লাহিল লাজি খালাকাহুনা ইন কুনতুম ইয়াহা তা’বুদুন” অর্থাৎ তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সজিদা করিও না আল্লাহকে সজিদা কর। যিনি সেগুলো সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা খাস করে তারই ইবাদত করে থাক। তনকিহাতিছ ছুন্নীয়াহ্ কিতাবের লিখক এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এই আয়াতে আল্লাহ্ তা’লা ইরশাদ করেছেন যে সূর্য ও চাঁদকে সজিদা করিও না প্রকাশ থাকে যে, এই সজিদা তাজিমের উদ্দেশ্যে ছিল; কেননা কাফিরগণ নক্ষত্র রাজিকে এবং মূর্তি সমূহকে সৃষ্টিকর্তা এবং উপাস্য বুঝে সজিদা করত না বরং উহাদেরকে মহান এবং নৈকট্য লাভের মাধ্যমে এবং উদ্দেশ্য সফল করার মাধ্যম মনে করে সজিদা করত যেমন এ যুগে পীর পূজারী ব্যক্তির পীরকে অনুরূপভাবে সজিদা করে থাকেন। আরো উল্লেখ্য যখন উক্ত আয়াতে কারীমায় কোন্ প্রকারের সজিদা তা উল্লেখ না করে মতলক সজিদা গ্রহন করা হল সুতরাং আয়াতের মধ্যে মতলক সজিদা করা হারাম বলে হুকুম হল, এ কারণে এ আয়াতে গায়রুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে তাজিমী সজিদা করা হারাম বলে প্রতীয়মান হল।

(আত তওজিহাতুল বাহিয়াহ্‌র সম্মানিত লিখক তানকিহাতিছ ছুন্নীয়াহ্‌র লিখকের উপরোক্ত অপব্যখ্যা খন্ডনে বলেন) “প্রথমতঃ তনকিহাতিছ ছুন্নীয়াহ্‌র লিখক বললেন আয়াতে সজিদা দ্বারা সজিদায়ে তাজিমীই উদ্দেশ্য, যেমন তার লিখনী উহার স্বাক্ষ্য বহন করে “এই আয়াতে সজিদা দ্বারা সজিদায়ে তাজিমী উদ্দেশ্য।” এরপর দ্বিতীয়বার তিনি বললেন আয়াতে কোন্ প্রকারের সজিদা তা স্পষ্ট নয়। এতে করে উহা দ্বারা ‘মতলক’ সজিদাই উদ্দেশ্য; যেমন তানকিহাতিছ ছুন্নীয়াহ্‌র লিখক বলেন, আয়াতের মধ্যে সজিদা কোন প্রকার তা বর্ণনা করা হয় নাই তাই মতলাক সজিদা উদ্দেশ্য করতে হবে। তিনি আয়াতে উল্লেখিত সজিদাকে ‘মতলক সজিদা’ দাবী করেছেন অন্যদিকে এই সজিদাকে তাজীমের জন্য নির্দিষ্ট করনের পর। এতে করে তাদের দ্বিবিধ দাবীর দ্বারা বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়। আর ইহাই তার ভ্রান্ততার প্রমাণ। যদিও তাদের দাবীকে বিগুহ্ব বলে মানা যায় কিন্তু এর মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা নাই কেননা তিনি ‘মতলাক’ সজিদা বলে ইবাদত ও তাহিয়া উভয় সজিদাকে উদ্দেশ্য করেছেন। যদি ইহা বিগুহ্ব বলে মানা যায় যা তিনি আয়াতে কারীমা থেকে উদ্দেশ্য করেছেন, উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় ‘মতলাক সজিদা’ থেকে নিষেধ অর্থাৎ ঐ আয়াত শরীফ দু’টো অর্থ থেকে খালি নয়; আয়াতে কারীমা দ্বারা শুধুমাত্র উহার বিপরীত ধর্মী হারাম হওয়াকে সাব্যস্ত করে। অথবা আয়াতের দ্বারা সমস্ত বিপরীত ধর্মী হারাম হওয়াকে সাব্যস্ত করে।

প্রথমতঃ ধরে নিলে আবশ্যক হয়ে পড়ে মতলক সজিদা করা হারাম হয়ে যায় সূর্য ও

চন্দ্রকে; শুধুমাত্র অন্যদের জন্য এই হুকুম প্রবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়টির বিবেচনায় আবশ্যক হয়ে পড়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদতের সজিদা করাও হারাম কিন্তু এই জাতীয় অর্থ বিবেক বর্জিত। এতে করে প্রথম অর্থই উদ্দেশ্যে করা জরুরী অর্থাৎ শুধুমাত্র ঐ মতলক ভাবে সূর্য এবং চন্দ্রকে সজিদা করিওনা। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সজিদা কর। যিনি উহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন যদি তোমরা খাস করে তাঁরই বন্দেগীকারী হও। এরই ভিত্তিতে আয়াতে কারীমা দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়া সূর্য ও চন্দ্রকে ছাড়া অন্যদেরকে করা মূলতঃ হারাম বলে বুঝা যায় না বরং মতলাক সজিদা বলে উদ্দেশ্য করা মূলতঃ জায়েজ হবে না “উহুজুদু” আয়াতাংশ দ্বারা; কেননা এই আমর “লা তাহুজুদু” নাহি তথা নিষেধ জ্ঞাপক শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতে কারীমায় উল্লেখিত সজিদা দ্বয় দ্বারা একই প্রকারের সজিদা উদ্দেশ্য হবে যাতে তাদের উভয়ের বিপরীত মুখীটা বিস্তৃত হয়। “উহুজুদু” শব্দে সজিদা দ্বারা ইবাদতের সজিদা উদ্দেশ্য, কেননা সজিদায়ে তাহিয়া আল্লাহ তা’লার জন্য জায়েজ নহে কেননা সজিদায়ে তাহিয়াহু সালাম অর্থ বহন করে। আর সালাম আল্লাহর জন্য জায়েজ নয় কেননা সালাম সম্মান সহকারে দোয়া অর্থ বহন করে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে দোয়া করা জায়েজ নয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহিয়াহু এ অর্থের বিবেচনায় নয়।

তাহলে “লা তাহুজুদু” আয়াতাংশ সজিদা দ্বারা সজিদায়ে ইবাদত উদ্দেশ্যে হবে; কেননা যদি এ অংশে ‘মতলক’ সাধারণভাবে সজিদার অর্থ গ্রহণ করা হয়; তা-হলে উহুজুদু আয়াতাংশেও সজিদা সাধারণ তথা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হবে তখন যা ঘটর তাই ঘটবে। ‘লা তাহুজুদু’ আয়াতাংশ থেকে ‘আম’ তথা সাধারণ সজিদা উদ্দেশ্য করা এবং উসুযুদু আয়াতাংশ থেকে খাস করে ইবাদতের সজিদাকে উদ্দেশ্য করা এ যুক্তির মূলত কোন ভিত্তি নাই বরং “লা তাহুজুদু” আয়াতাংশ থেকে ‘আম’ তথা সাধারণ সজিদা উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না। কেননা আয়াতে কারিমা আল্লাহর সহিত সূর্য ও চন্দ্রকে শরীক তথা অংশীদার করা থেকে বিরত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে; কেননা শরীকের অর্থ অর্জিত হয়, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সজিদা করা হয়। তাহিয়া তথা সম্মানের উদ্দেশ্যে উভয়কে সজিদা করা শিরিক হওয়ার অর্থে হারাম নয় বরং শুধু সম্মানার্থে হারাম।

অতঃপর ‘তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ’ কিতাবের লিখক তাজিমী সজিদার বিপক্ষে পবিত্র কোরআনের অন্য এক আয়াত শরীফ যেমনঃ “আ ইয়া” মুক্কুম বিল কুফরি বা’দা ইজ আনতুম মুছলিমুন” (সুরা আলে ইমরান ৮০ নং আয়াতাংশে) অর্থ তোমরা মুসলমান তথা আত্মসমর্পন কারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন, কে দলিল স্বরূপ উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন যে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সজিদা করা কুফরী সাব্যস্ত হল। উক্ত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে সজিদা করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি চেয়েছিলেন, ইহাই স্পষ্ট যে সাহাবায়ে কেরাম এর এই ইচ্ছা আকাংখা শুধুমাত্র তাজিমের জন্যই ছিল ইবাদতের জন্য নহে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াতে কারিমায় প্রকাশ্য শব্দ কুফর দ্বারা সৃষ্টিজীবকে সজিদা করাকে কুফরী বলা হয়েছে। (আততওজিহতুল বাহিয়াহু এর সম্মানিত লিখক মুফতীয়ে আজম আল্লামা হৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃআঃ) তনকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ কিতাবের লিখকের উপরোক্ত আয়াতে কারীমের অপব্যাক্যাসহ অন্যান্য যারা উক্ত আয়াতের অপব্যাক্য করেছেন তা খণ্ডন করে বলেন) ‘আমি বলিতেছি’ তার কথায় (তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ কিতাবের লিখকের কথায়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে

সজিদা করা যদি কুফরী বুঝায়; ইহা যদি মতলক তথা অনির্দিষ্টভাবে সজিদা ধরে নেয়া হয় তা হলে ইহা সর্বসাধারণ মুসলিম ফতোয়া বিশারদদের মতের বিপরীত হবে। যা আমি পূর্বে “খোলাছা” কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া বলেছিলাম; আর যদি তিনি ইহা দ্বারা নির্দিষ্টভাবে সজিদা-এ-ইবাদত বুঝায়; তাহলে তখন সে ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নাই অর্থাৎ ইবাদতের সজিদা বুঝালে অবশ্যই ইহা কুফরী। আর যদি তিনি দ্বারা নির্দিষ্টভাবে তাজিমী সজিদা বুঝায়, তখন ইহা সর্বজন গৃহীত ইসলামী মায়হাবের বিপরীত হবে; কেননা ইসলামী মায়হাবের কোন বিজ্ঞ আলেম ওলামা তাজিমী সজিদা কুফরী বলেন নাই।

কুফরী কিভাবে হবে? কারণ আল্লাহ তা'লার হুকুম তাজিমী সজিদার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে প্রবর্তিত হয়েছে ইহা কুফরী হতে পারে না। অর্থাৎ ইহা কোন মতেই কুফরী নয়; কেননা আল্লাহ তা'লার হুকুম কুফরী সম্পাদন করার ব্যাপারে জারী হয় না। বরং তাজিমী সজিদা আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহে মোস্তাহাব ছিল। কুফরী কাজ কোন শরীয়তে জায়েজ হতে পারে না। আর আল্লাহ তা'লার বাণী “আ ইয়া'মুরুকুম বিল কুফরী বা'দা ইজ্ঞ আনতুম মুছলিমুন” অর্থাৎ তোমরা মুসলমান তথা আত্মসমর্পনকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? এই আয়াতের দ্বারা তাজিমী সজিদা কুফরী বুঝা যায় না। কেননা উক্ত আয়াতে কারীমার অর্থ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে প্রকাশ হয়ে যায় যে

টীকা : কাওলিহি আন্বা ছযদাত তাহিয়্যাতি কুফরুন ----- ।

“অবশ্যই তাজিমী সজিদা কুফরী” তাজিমী সজিদা মুসলিম বিশ্বে সর্বজন গৃহীত ওলামাদের মতে কুফরী নয়। তাফসীরে বাজজাজিয়া হতে জানা যায় “আহছজিদাতু লি হা উলায়ি কুফরুন” অর্থাৎ তাদেরকে সজিদা করা কুফরী। যদি ইহা দ্বারা তাজিমী সজিদা বুঝানো হয়, ইহা কিন্তু মুসলিম বিশ্বের সমস্ত ময়হাবের আলেমদের ব্যাখ্যার বিপরীত হবে। আর যদি ইহা দ্বারা ইবাদতের সজিদা বুঝায় আর সে ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নাই বরং ইহা সর্বজন গৃহীত সঠিক। তাফসীরে বজজাজিয়াতে “হা-উলায়ি” অর্থাৎ তাদেরকে দ্বারা জবাবের তথা আল্লাহ দ্রোহী রাজা বাদশাহদের বুঝানো হয়েছে তদ্রূপ ব্যাখ্যা ফতোয়ায় আলমগীরিতেও আছে অর্থাৎ ইহা দ্বারা জালিম ও আল্লাহ দ্রোহী বাদশাহদের প্রতি ইংগিত করা হইয়েছে। যা সামনে বর্ণিত হবে। ফতোয়া-এ-বজজাজির লিখকের উচ্চ ছিল, উহাকে কবীরী গুনাহ সমূহের একটি হিসাবে বর্ণনা করা। যেইরূপ এই বি ষয়ে বিদ্যমান। তিনি যে সম্মানি সজিদাকে কুফর বলেছেন ইহা ফক্বিহদের মতামতের পরিপন্থী। অতএব ফেনীর ধর্মীয় বিতর্ক সভাতে এই উক্তি দ্বারা সজিদা কুফরী হওয়ার পক্ষে যেই দলিল গ্রহন করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বাতিল ও ভিত্তিহীন।

-- কাওলে মুগনি--- মমতাজুল মুহাদ্দেহীন মওলানা ওবায়দুল আকবর (রাহঃআঃ) এম.এম.।

আয়াতে করীমায় আল্লাহ তা'লা ফিরিশতা ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে বা আল্লাহ হিসেবে গ্রহন না করার জন্যই নিষেধ করেছেন যা উক্ত আয়াতের প্রথমার্শে স্বাক্ষী প্রদান করে; যেমন আল্লাহর বাণী “ওয়ালা ইয়া'মুরুকুম আন তাত্বাখিযুল মালায়িকাতা ওয়ান্নাবিয়্যা আরাবাবান আ ইয়া'মুরুকুম বিল কুফরী বা'দা ইজ্ঞ আনতুম মুছলিমুন”

(সূরা আলে ইমরান ৮০নং আয়াত) অর্থাৎ তিনি আদেশ করেন না যে তোমরা ফিরিশতাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান তথা আত্মসমর্পনকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? আলোচ্য আয়াতে কুফরী শব্দ দ্বারা ফিরিশতা ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে বা আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে, তাজিমী সজিদাকে কুফরী বুঝানো হয় নাই। তানকিহাতিছ ছুন্নিয়া কিতাবের লিখকের কথামত সাহাবী কর্তৃক নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে সজিদা করার নিষেধ ব্যাপারে অবতীর্ণ হওয়া আলোচ্য আয়াতকে যদিও ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে আলোচ্য আয়াত যে তাজিমী সজিদা নিষেধ ব্যাপারে নয় তা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়। কারণ যদি তাজিমী সজিদা নিষেধ ব্যাপারে হত আয়াতে করীমায় শব্দ “মতলক” কুফর ব্যবহৃত হত না, কেননা তাজিমী সজিদা কাহারো মতে কুফরী নয় যা আপনিও অবগত আছেন বরং উক্ত আয়াতে তাঁদেরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যেমন আল্লাহর বাণী “ওয়ালা ইয়ামুরুকুম আন্ তাব্বাখিজুল মালায়িকাতা ওয়ান নাবিয়্যিনা আরবাবান” অর্থ তিনি নির্দেশ করেন না যে তোমরা ফিরিশতাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর। আরো অন্যান্য আয়াত তথা কোরআনী দলিল আছে। যে আয়াত সমূহে বলা হয়েছে নাছারা এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা ‘জবৃত’ তথা প্রতিমা এবং তাগুতের তথা শয়তানের ইবাদত করত; আর তাদের আহবার তথা পাদ্রী এবং রোহবান তথা সাধুপুরুষদের রব তথা প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করত এবং তাদেরকে রবুবিয়তের তথা প্রতিপালক রূপে সজিদা করত; যেমন আল্লাহর বাণী “আলাম তারা ইলাল্লাজীনা উতু নাছিবাম মিনাল কিতাবি ইয়ুমিনুনা বিল্জুবতি ওয়াত তাগুতি ইত্তাখাজু আহবারাহম ওয়া রুহবানাহম আরবাবান মিন দুনিয়াহু” অর্থাৎ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে। তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তাদের আহবার তথা পাদ্রী ও রোহবান তথা সাধুপুরুষকে প্রতিপালক স্থির করে নিয়াছে। ঐ সমস্ত লোকেরা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা মছিহু ইবনে মরিয়ম তথা মরিয়ম নন্দন মসীহকে আল্লাহ বলেছেন, ঐ সমস্ত লোকেরা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা আল্লাহ তিনের মধ্যে তৃতীয় বলেছে, ইয়াহুদীরা বলেছে ওয়াইর আল্লাহর পুত্র খ্রীষ্টানেরা বলেছে মরিয়মের পুত্র মসীহ আল্লাহর পুত্র। যেমন আল্লাহর বাণী “লাক্বাদ কাফারাল্লাজিনা ক্বালু ইন্নাল্লাহা ছালেছু ছালাছাতিন” (সূরা মায়েদা ৭৩নং আয়াত) “লাক্বাদ কাফারাল্লাজিনা ক্বালু ইন্নাল্লাহা ওয়াল মসীহু ইবনে মরিয়ম” (সূরা মায়েদা ৭২নং আয়াত) “লাক্বাদ কাফারাল লাজিনা ক্বালু ইন্নল্লাহা ছালেছু সালাছাতিন” (সূরা মায়েদা ৭৩নং আয়াত) “ক্বালাতিল ইয়াহুদু ওয়াইরু ইবনুল্লাহি ওয়া ক্বালাতিন নাছারা আল মাছিহু ইবনুল্লাহি জালিকা কাউলুহম বি আফওয়া হিহিম ইয়ুদা হিউনা ক্বাউলুল লাজিনা কাফারু মিন কাবলু কাতালাহমু ল্লাহ আন্না ইয়ুফাকুন” (সূরা তাওবা ৩০নং ও ৩১ আয়াত) অর্থাৎ যারা বলে মরিয়ম নন্দন মসীহ-ই আল্লাহ নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী হয়েছে; যারা বলে যে আল্লাহ তিনের মধ্যে তৃতীয় নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী হয়েছে এং ইহুদীরা বলে যে ওজায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানেরা বলে যে সমীহ আল্লাহর পুত্র ইহা তাদের নিজেদের মুখের কথা তারা পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের কথার অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন! তারা কোথায় ফিরে যাবে। তারা

আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তাদের 'আহবার' তথা পাদ্রী ও রোহবানদেরকে তথা সাধুপুরুষদেরকে এবং মরিয়ম নন্দন ঈসাকে প্রতিপালক স্থির করে নিয়েছে এবং তাদেরকে এতদ্ব্যতীত আদেশ করা হয় নাই যে তারা একমাত্র উপাস্যের আরাধনা করবে, তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই; তাদের অংশী স্থির করা হতে তিনি পবিত্র। উল্লেখ্য পবিত্র কোরআনের 'নছ' তথা দলিল দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তারা সবাই তাদের আহবার (পাদ্রী) কে এবং রোহবান (সাধুপুরুষ) কে প্রতিপালকরূপে সজিদা করত।

টীকা : কাওলিহি ছুজুদার রববিয়্যাতি যালিকা ----- ।

“তাদেরকে রববিয়াতের সজিদা করত” কেননা নাছারাগণ বিশ্বাস করে যে তাদের আহবার তথা পাদ্রীর মধ্যে আল্লাহ সমাহিত তাদের অধিক সাধনার দরুন। অতএব তারাই তাদের প্রভু তথা প্রতিপালক, তাই তারা তাদের পাদ্রীকে সেই হিসাবে সজিদা করে থাকে। আর ইয়াহুদীদের ধারণা যে তাদের পুরোহিত বা ধর্মগুরু যা হালাল করে তা তাদের জন্য হালাল এবং যা হারাম করে তা তাদের জন্য হারাম। এইভাবে তারা তাদের অনুকরণ করত। মোট কথা তাদের ধারণা হল তারাই তাদের প্রভু। তাই তাদেরকে ইবাদতের সজিদা করত। ইহাই আয়াতে কোরআনের অর্থঃ যেমন আল্লাহর বাণী “আঁ ইয়া মুরুকুম বিল কুফরী বা’দা ইজ আনতুম মুছলিমুন” অর্থ : তোমরা মুসলমান তথা আত্মসমর্পনকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? অর্থাৎ হে মুসলমানগণ তোমাদেরকে কি নবী করিম (দরুদ শরীফ) সম্পর্কে ঐ ধরনের আক্দিদা পোষন করার হুকুম দিয়াছেন যে ধরনের আক্দিদা নাছারা ও ইয়াহুদীগণ তাদের আহবার ও রোহবান সম্পর্কে পোষন করে? এমন কি তারা তাদের আহবার ও রোহবানকে রব্ব তথা প্রতিপালক হিসাবে সজিদা করে থাকে এবং আল্লাহর বাণী “লা ইয়াত্তাখিজু বা’দুনা বাদান” এর অর্থই স্পষ্ট প্রমান। অতএব ফেনী মোনাজেরায় তথা ধর্মবিতর্ক সভায় সজিদায়ে তাহিয়াহর বিরোধীদের দাবী যে উপরোক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা তাজিমী সজিদা রদ তথা রহিত হয়ে গিয়াছে, তা যে অগ্রাহ্য ও বাতেল তা স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে গেল। অর্থাৎ তাজিমী সজিদার বিরোধীদের দাবী “তাজিমী সজিদা রহিত হয়ে গিয়াছে” আল্লাহর বাণী “আঁ ইয়া মুরুকুম বিল কুফরী বা’দা ইজ আনতুম মুছলিমুন” অর্থ তোমরা আত্মসমর্পনকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? এবং আল্লাহর বাণী “লা ইয়াত্তাখিজু বা’দুনা বাদান” আয়াতদ্বয় দ্বারা তা যে অগ্রাহ্য ও বাতেল তা স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে গেল। বরং আয়াতদ্বয় দ্বারা ইহা রহিত হওয়ার কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসতেছে।

— ক্বাওলে মুগনি— । -মমতাজুল মুহাদ্দেছীন মওলানা ওবাইদুল আকবর (রাহঃআঃ) এম.এম.।
অতঃপর যখন কোন কোন সাহাবী এরূপ সজিদা করতে দেখলেন তারা নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে সজিদা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যা হযরত সা’দ বিন কায়স (রাঃআঃ) এর বর্ণিত হাদিসে প্রকাশ পায়। মিশকাত শরীফের তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩১২৭নং হাদীস শরীফ; অর্থ : হযরত সাদ বিন কায়স (রাঃআঃ) বলেন আমি হীরা শহরে গিয়াছিলাম। দেখলাম তারা তাদের মোড়ল মিরজাবানকে সজিদা করে। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, নিশ্চয় আল্লাহর রাসুল ছাড়া আল্লাহই ওয়াছলাম সজিদা

পাওয়ার অধিক উপযোগী। অতঃপর আমি রাসুলুল্লাহ (দ.) এর নিকট আসলাম এবং বললাম হুযুর আমি হীরায় গিয়ে ছিলাম। দেখলাম তারা তাদের মোড়লকে সজিদা করে। আমি মনে করি, হযরত সজিদা পাওয়ার অধিক উপযোগী। তখন তিনি আমাকে বললেন কায়স! যদি তুমি আমার কবরের নিকট পৌছ তবে কি তুমি উহাকে সজিদা করবে? আমি বললাম না। হুযুর বললেন, করিও না। আমি যদি কাকেও অন্য কারো প্রতি সজিদা করার নির্দেশ দিতাম তবে আমি স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদেরকে সজিদা করার নির্দেশ দিতাম সেই অধিকারের কারণে যা তাদের উপর উহাদের রয়েছে। - আবু দাউদ। উপরোক্ত হাদিছ শরীফ এবং ইহার মত আরো যত হাদিছ শরীফ সজিদা নিষেধ ব্যাপারে উল্লেখ আছে তা সবই জঙ্গিফ তথা দুর্বল হাদিছ এবং এগুলির দলিলও দুর্বল; কেননা এইগুলি মিশকাত শরীফের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ হয়েছে। আর মিশকাত শরীফের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে সমস্ত হাদিছ শরীফ সমূহ উল্লেখ হয়েছে তা সবই জঙ্গিফ তথা দুর্বল।

আর যদিও হাদিছটির জঙ্গিফ তথা দুর্বলতার দিকে নজর করা না হয় কায়স বিন সা'দ (রাঃআঃ) কে নবী করিম (দরুদ শরীফ) সজিদা করতে নিষেধ করার কারণ অন্য ব্যাপার যা জ্ঞানীদের নিকট সুস্পষ্ট। কায়স (রাঃআঃ) যখন দেখলেন নাছারা সম্প্রদায় তাদের মোড়ল মিরজাবানকে সজিদা করতেছে, তখনই তিনি নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে তাদের অনুকরণে সজিদা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর কায়স (রাঃআঃ) তখন সবেমাত্র নব মুসলমান হয়েছিলেন। তাই নবী করিম (দরুদ শরীফ) আশংকা করেছিলেন যে যদি তাকে অনুমতি দেওয়া হয় হয়ত তিনি রব্ব তথা প্রতিপালক হিসাবে রবুবিয়াতের সজিদা করতে শুরু করবেন যে রূপ নাছারা ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় তাদের পাদ্রী ও সাধুপুরুষকে প্রতিপালক মনে করে সজিদা করত। এইজন্যই নবী করিম (দরুদ শরীফ) তাকে ইরশাদ করলেন, যদি তুমি আমার কবরের নিকট পৌছ তবে কি তুমি উহাকে সজিদা করবে? ইহার সঠিক অর্থ এই যে যদি তুমি আমাকে এইভাবে সজিদা করার ইচ্ছা প্রকাশ কর যেইভাবে নাছারা ও ইয়াহুদীরা তাদের পাদ্রী ও সাধুপুরুষকে প্রতিপালক মনে করে সজিদা করে থাকে। এমনকি তারা এখনও তাদের কবরে তাদেরকে প্রতিপালক তথা আল্লাহ হিসাবে সজিদা করে। অতএব তাদেরকে ঐ রকম দেখে তুমি আমাকে প্রভু বানাবে এবং প্রভু তথা প্রতিপালক হিসাবে আমার কবরে সজিদা করবে? উত্তরে কায়স (রাঃআঃ) বলিলেন 'না' আমি ঐ ধরনের ধারণা করি নাই। অতঃপর নবী করিম (দরুদ শরীফ) ইরশাদ করলেন, যেই রকম তুমি বলিয়াছ সেই রকম যদি ইচ্ছা করে থাক তা করিও না, যা উল্লেখ করে নবী করিম (দরুদ শরীফ) তাকে মতলক (অনির্দিষ্টভাবে) কাজ না করার জন্য নিষেধ করেছেন। ইহা নয় যে নির্দিষ্টভাবে সজিদা না করার জন্য নিষেধ করেছেন বরং নবী করিম (দরুদ শরীফ) এই নিষেধ বাণী দ্বারা ঐ সমস্ত কার্যাদি না করার জন্য নিষেধ প্রমানিত হয় যেই সমস্ত কার্যাদি নাছারাগণ তাদের আহবার তথা পাদ্রীগণকে প্রতিপালক হিসাবে ধরণাকরে করত। আলোচ্য হাদীছ শরীফে যে "লা তাফ-আল" শব্দ অর্থাৎ তুমি করিও না; উল্লেখ আছে উহার প্রকৃত অর্থ হলো "লা তাজআ লি রাব্বান ওয়ালা তাহজুদলি ফি হায়াতী ওয়া

বা'দা মামাতি ফি কাবরী কা'মা ইয়াহজুদানা লি আহবারিহিম ফি হায়াতিহিম ওয়া বা'দা মামাতিহিম ফি কুবুরিহিম" অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রতিপালক বানাইও না। আমার জীবিত অবস্থায় এবং আমার ওফাতের পর আমার কবরে সজিদা করিও না; যেভাবে ইয়াহুদী ও নাছারাগণ তাদের কবরে রব্ব তথা প্রতিপালক হিসাবে সজিদা করত; অতএব নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর নিষেধ সূচক হুকুমটি ইয়াহুদী ও নাছারাদের নির্দিষ্ট আক্বীদার প্রতি সম্পর্কিত বরং শুধুমাত্র সজিদার ব্যাপারে নয়। এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে কায়স (রাদিঃআঃ) এর সজিদার অনুমতি চাওয়া আসলে তাজিমের জন্য ছিল না। নতুবা নবী করিম (দরুদ শরীফ) তাঁদের এ রকম বলতেন না যে তুমি যখন আমার কবরের নিকট পৌছ তখন কি তুমি উহাকে সজিদা করবে? যখন নবী করিম (দরুদ শরীফ) তাঁকে সেই রকম বললেন তা হতে বুঝা যায় কায়স (রাদিঃআঃ) এর সজিদার অনুমতি চাওয়া যদিও সম্মানের জন্য ধরে নেওয়া হয়, তবু উহাতে নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ নিহিত ছিল কেননা সেই সময়ে যাদেরকে সজিদা করা হত তাদেরকে প্রতিপালক হিসাবে সজিদা করা হত যা স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে নাছারাদের সজিদা যা তারা তাদের পাদ্রীকে প্রতিপালক হিসাবে করত। এই কারণেই নবী করিম (দরুদ শরীফ) কায়স (রাদিঃআঃ) কে ইরশাদ করলেন "লা তাফআল" অর্থ তুমি করিও না অর্থাৎ তুমি আমাকে সজিদা করিও না যেভাবে নাছারাগণ তাদের পাদ্রীকে সজিদা করে। আর সজিদা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যও নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর আনুগত্যের খেয়াল বা এতায়াত ছিল যদি ইহা না হত নবী করিম (দ.) কায়স (রাদিঃআঃ) কে এ রকম বলতেন না "আমি যদি কাকেও অন্য কারো প্রতি সজিদা করার নির্দেশ দিতাম তবে আমি স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদেরকে সজিদা করার নির্দেশ দিতাম সেই অধিকারের কারণে যা তাদের উপর উহাদের রয়েছে; কেননা স্ত্রী স্বামীকে সজিদা করা মানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ সম্মানের বহিঃপ্রকাশ নহে, যেহেতু, স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব (শরীয়তের পরিভাষায়) সম্মান বা তাজিম করা ওয়াজিব নহে। আনুগত্য করা সাধারণতঃ ইবাদতের অংশ হিসাবে গন্য হয়ে থাকে আর আনুগত্য যখন স্বামীর সাথে মুকাইয়াদ তথা নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট হয় তখন ইহা অবশ্যই ইবাদত হিসাবে বুঝতে হবে; কারণ আনুগত্য দ্বারা যার আনুগত্য করা হয় তার নৈকট্য লাভই উদ্দেশ্য। ইহাই (নৈকট্য) ইবাদতের অর্থ।

অতএব হে পাঠকবৃন্দ! এখন গভীরভাবে চিন্তা করুন, নবী করিম (দরুদ শরীফ) কায়স (রাদিঃআঃ) কে সজিদা করার অনুমতি না দেওয়ার কারণ।

যদিও উহাকে তাজিমী সজিদা ধরে নেওয়া হয় কায়স (রাদিঃআঃ) অবশ্যই নব মুসলিম ছিলেন, সেই কারণে তাঁর আক্বীদা বিশ্বাস এ ব্যাপারে মুসলিম হওয়ার পূর্বে যে রকম ছিলেন সেই রকমই ছিলেন অর্থাৎ পাদ্রীকে সজিদা করা জায়েজ। মুসলিম হওয়ার পূর্বে তারা সর্বদা প্রতিমা এবং শয়তানকে প্রতিপালক হিসাবে সজিদা করত। এমতাবস্থায় নবী করিম (দরুদ শরীফ) যদি কায়স (রাদিঃআঃ) কে তাজিমী সজিদা করার অনুমতি প্রদান করতেন তাতে অবশ্যই এই আশংকা ছিল যে কায়স (রাদি.) মুসলিম হওয়ার পূর্বে প্রতিমাও শয়তানদেরকে প্রতিপালক হিসাবে যেভাবে সজিদা করত সেই সজিদায় ধরে নিতেন। এই কারণেই নবী করিম (দ.) কায়স (রাদিঃআঃ) কে সাধারণভাবে

সজিদার অনুমতি দেন নাই। যেমন ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থায় হিন্তিম ও দুব্বা নামক মদ শরাবের জন্য ববহৃত পাতে কোন কিছু পান করা জায়েজ ছিল না। কারণ পাত্র দেখলে তাদের ইচ্ছা মদ-শরাবের প্রতি পুনঃপ্রায় ধাবিত হবে এই আশংকায়। কেননা ঐ নামের পাত্র সমূহে অমুসলিম থাকা অবস্থায় তারা অবৈধ মদ-শরাব পান করত। অতএব নবী করিম (দরুদ শরীফ) কায়স (রাদিঃআঃ) কে সাধারণভাবে সজিদা করার অনুমতি না দেওয়া ইহা উপস্থিত আকীদা বিশ্বাস সঠিক থাকার উপর নির্ভর করে। যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর সজিদায়ে তাহিয়া যদিও তা তাজিমের উদ্দেশ্যে আদায় করা হয় কিন্তু তাহিয়া দ্বারাই তাজিম তথা সম্মান প্রদর্শন করা যায়। সজুদে রবুবী তথা প্রতিপালকের সজিদা দ্বারা তাজিম তথা সম্মান প্রদর্শন করা যায় না।

উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাজিম তথা সম্মান যদিও তা কাজের মধ্যে একটি কাজ কিন্তু লোকেরা অভ্যাসগতভাবে কাকেও তাজিম তথা সম্মান করে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির নিকট কর্মের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া না যায়। সুতরাং শ্রেষ্ঠত্বের স্তর রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রাসঙ্গিক অবস্থা যা সংকলিত করা হয়েছে বহুবিধ সন্দেহ প্রবন বিষয়াদি হতে। এতে করে কতক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্য কতক ব্যক্তিবর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। সুতরাং যখন শ্রেষ্ঠত্বের গঠনের মূল সন্দেহ জেনে রাখুন, সম্মানের মধ্যে অনুরূপ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এ হিসাবে যে বিবেক উৎপাটিত হয় আকলের আধিক্য প্রকাশ উপমা সমূহের অথবা নগন্যতা প্রকাশে।

সুতরাং রবুবিয়াতের সজিদা দ্বারা সম্মান প্রদর্শন ইহা সজিদায়ে তাহিয়াহু দ্বারা সম্মান প্রদর্শন হতে অধিকতর সম্মান আদায় হবে। প্রথম রবুবিয়াতের সজিদা যা সজিদা তাহিয়াহু থেকে অনেক নৈকট্য ও অধিক্য মরতবাসম। আর সজিদায়ে তাহিয়াহু উহা সজিদায়ে রবুবিয়াতের তুলনায় অনেক অনুন্নত ও অসম্পূর্ণ। সুতরাং রবুবিয়াতের সজিদা আল্লাহ তা'লার জন্য খাস তথা নির্ধারিত। ইহা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে করা কুফরী। যদি কোন ব্যক্তি নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে সজিদা দ্বারা সম্মান করতে চায়। তিনি যেন সর্বপ্রথম নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে সম্মান করেন।

এই কারণে আল্লাহ তা'লা ইরশাদ ফরমান :

“ওয়ালা ইয়ামুরুকুম আন তাওয়াখিজুল মালায়ীকাতা ওয়ান্নাবিয়্যিনা আরবাবান আ ইয়া'মুরুকুম বিল কুফরী বা'দা ইজ আনতুম মুছলিমুন” অর্থাৎ তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফিরিশতাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান তথা আত্মসমর্পনকারী হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? এবং আল্লাহর বাণী “ইয়া আইয়ুহান্নাবীনা আমানু লা তাত্তাখিজু” উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের কুফর শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ফিরিশতা এবং নবীগণকে “আরবাব” তথা প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে রবুবিয়াত তথা প্রতিপালকরূপে সজিদা করা, সম্মানী সজিদা হিসাবে নহে, কেননা সম্মানী সজিদা করা কোন মযহাবের আলেমদের মতে কুফরী নয় যা আপনি অবগত আছেন। উপরন্তু উল্লেখিত আয়াতে কারীমাদ্বয়ে যখন “কুফরী” শব্দ খাস করে, সজিদা তাহিয়াহুকে উদ্দেশ্য করা বৈধ হচ্ছে না। এতে আরো জানা গেল যে, “কুফরী” দ্বারা “মতলক” সজিদা বলার অবকাশ থাকে না, বরঞ্চ তখন “কুফরী” শব্দ

কোন এক প্রকার সজিদার সাথে খাস হয়ে যায় এবং উহা তাজিমী সজিদা ভিন্ন সজিদায়ে রবুবিয়াত বা ইবাদত হিসাবে পরিচিত যা খুবই স্পষ্ট।

তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহু কিতাবের লিখকের কথা যদিও মানা যায় যেমন তিনি বলছেন, ইহা স্পষ্ট যে সাহাবায়ে কেরামগনের ইচ্ছা শুধুমাত্র সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। (ইহার উত্তরে “আত তাওজিহাতুল বাহিয়াহু” এর সম্মানিত লিখক বলেন) ইহা দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহুকে বারন করতেছে এমন দলিল গ্রহন করা জায়েজ হবে না। যা আপনি অবগত আছেন এবং যদি মানা যায় যে সাহাবায়ে কেরামগনের উদ্দেশ্যে তাজিম করা ছিল, ইহা দ্বারাও সজিদা তাহিয়াহু যে নিষিদ্ধ এমন দলিল গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা সজিদায়ে তাহিয়াহু ঐ সময়ে সজিদায়ে রবুবিয়াতের মতই ছিল আর ইহা ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ের অবস্থা। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় এই সামঞ্জস্যতার কারণে ঐ সময়ে ইহা কুফরী হওয়ার সম্ভবনা ছিল। এটা শুধুমাত্র খাস করে সজিদায়ে তাহিয়াহু এর জন্য নয়, কেননা এই রকম বিধান প্রত্যেক মাযহাবের বিপরীত যা আপনি অবগত আছেন এতে করে নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর অনুমতি প্রদান না করা সাহাবায়ে কেরামগণকে যখন তাঁরা নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে সজিদা করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল স্পষ্ট হয়ে গেল যেমন হযরত আয়েশা (রাদিঃআঃ) হতে বর্ণিত “আন আয়েশাতা (রাদিঃআঃ) আনু রাসুলান্নাহি ছান্নান্নাহি আলাইহি ওয়াছান্নাম কানা ফি নাফরিন মিনাল মোহাজিরীন ওয়াল আনছার পা-জায়া বায়িরুন ফা-হাজাদা লাহু ফা-ক্বালা আসহাবুহু ইয়া রাসুলান্নাহি তাসজুদু লাকাল বাহেয়েমু ওয়াশ শাজারু পা-নানু আহককু আন নাসজুদা লাকা ফাক্বালা ওয়াবুদু রাব্বাকুম ওয়া আকরিমু আখাকুম লাউ কুনতু আমারতু আহদান আই ইয়াসজুদা লি আহাদিন লা-আমারতুল মারআতা আন তাসজুদা লি জাউজিহা ওয়া লাও আমরাহা আন তানকুলা মিন জাবালি আবইয়াদিন ইলা জাবালে আসউয়াদিন ওয়া মিন জাবালি আসওয়াদীন ইলা জাবালে আবইয়াদ কানা ইয়ামবাগী লাহা আন তাপ-য়ালাহু” (মিশকাত তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৩১৩০নং হাদিছ) অর্থ : হযরত আয়েশা (রাদিঃআঃ) বলেন একদিন রাসুলুল্লাহ (দরুদ শরীফ) মুহাজির ও আনসারদের একটি দলে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে (দ.) সজিদা করলে সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (দ.) আপনাকে চতুস্পদ জন্তু এবং বৃক্ষ সজিদা করেন অথচ আমরাই আপনাকে সজিদা করার অধিক হকদার। উত্তরে নবী করিম (দরুদ শরীফ) বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর। আমি যদি কাউকে অপরের জন্য সজিদা করার হুকুম দিতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সজিদা করে। অথচ সে (স্বামী) যদি তাকে (স্ত্রীকে) সাদা পাহাড় হতে কালো পাহাড়ে এবং কালো পাহাড় হতে সাদা পাহাড়ে পাথর স্থানান্তর করার হুকুম দেয় তার জন্য তা করা উচিত। -আহমদ।

গভীরভাবে চিন্তা করলে ইহা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সজিদা সহকারে সম্মান জ্ঞাপন অত্র হাদিছ শরীফ দ্বারা জায়েজ প্রমাণিত হয়; কেননা হাদিছ শরীফের ভাষায় “ওয়াবুদু রাব্বাকুম” অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর উক্তিটি ইবাদত জাতীয় বিষয়ের জন্য আর “আকরিমু আখাকুম” অর্থাৎ তোমাদের ভাইকে সম্মান কর উক্তি সম্মান প্রদর্শন জাতীয় হওয়া যথোচিত; যেমনটি উহাকে ‘মতলক’ বা শর্তহীন বর্ণনা করা

দ্বারা নির্দেশ করে। অতএব এ নির্দেশের আওতায় সজিদা সহকারে সম্মান বিশেষ তথা খাস সাব্যস্ত কেননা ‘আম’ বা ঢালাও বিষয়ের আওতায় খাস বা বিশেষ শ্রেণীও অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর বাণী “লাউ কুনতু আমরতু আহাদান” অর্থাৎ আমি যদি কাউকে নির্দেশ দিতাম, উক্তিটি এ সম্মানার্থে প্রতিবন্ধক হয় না, কেননা শুরুতে এ ধরনের বক্তব্য তখনই অধিক প্রচলিত যখন উত্থাপিত বিষয়টি অনুমোদনের পক্ষে জোর দেয়াই উদ্দেশ্য হয়; পক্ষান্তরে এতে আমাদের দাবীর পক্ষেই এক প্রকার শক্তির যোগান বিদ্যমান। এতে করে হাদিসটির অর্থ দাড়ায় “আকরিমু আখাকুম বি কুন্নি মা ইউকরিমু বিহি আদাতান” অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের সকল নিয়মের যে কোন নিয়মের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সম্মান কর।

টীকা : কাওলিহি ওয়াবুদু রাব্বকুম। (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর পূর্ণ হাদীস শরীফ) এর দৃশ্যপটে বুঝা যায় যে, রাসূল পাক (দরুদ শরীফ) এখানে সজিদার দুটি প্রকারই বর্ণনা করেন। (১) “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর” বাক্যটি ইবাদতের সজিদার বর্ণনায় এবং (২) “তোমাদের ভাইকে সম্মান কর” বাক্যটি সম্মানের সজিদার বর্ণনায়। উহা এজন্যই যে হাদিসটি হাযাযে কেরামগণ নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর নিকট তাঁকে (দরুদ শরীফ) সজিদা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে প্রত্যুত্তরে বিবৃত। আপনার জ্ঞানা কথা যে জবাবটা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব সজিদা করার আকাঙ্ক্ষার জবাবে হওয়াতে ইহার অর্থ হইবে “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যে সব আমল দ্বারা তাঁহার ইবাদত করা যায়, আর তোমাদের ভাইয়ের সম্মান কর যে সব কাজ দ্বারা সম্মান করা যায়। আর সম্মানের সজিদা সে সবে মধ্য অন্তর্ভুক্ত যা দ্বারা সম্মান করা যায়। সাহাবাগণ সজিদা দ্বারা সম্মান জ্ঞাপনে লিপ্ত হয়নি তা হারাম হওয়ার কারণে নহে বরং সরাসরি অনুমতি পাওয়া যায় নি বিধায় কোন বিশেষ কারণে অথবা সাধারণতঃ মোবাহের অনুমতি না দেওয়া বৈধ। আর যেই ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয় না তা মূলতঃ মোবাহ্ তথা জায়েজ হলেও তা থেকে বিরত থাকা উত্তম দৃষ্টে সাহাবাগণ তাঁকে (দরুদ শরীফ) সজিদা করা থেকে বিরত থাকেন।

--কাওলে মুগনি- মমতাজুল মোহাদ্দেসীন জনাব মৌলানা ওবাইদুল আকবর (রহঃআঃ) এম. এম.। আর সজিদার মাধ্যমে সম্মান করা এই “আম” তথা ঢালাও নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বিধায় সম্মানকে সজিদা ব্যতীত বলে শর্তারোপ করা মানে শর্তহীনকে শর্তযুক্ত করারই নামান্তর। অথচ বিধান হচ্ছে ‘মোতলক’ বা শর্তহীন তা শর্তহীন অবস্থায় থাকা যেমন উছুল অর্থাৎ শরীয়তের নীতি নির্ধারনী শাস্ত্রের কিতাব সমূহে স্বীকৃত। আর যদি কেউ আপত্তি করে যে, উহা শর্তহীনকে শর্তযুক্ত করা নহে বরং হাদিহটির উদ্দেশ্যই বিবরণ মাত্র। কেননা সজিদার মাধ্যমে সম্মান করা নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর ঐ বাণীর কারণে হারাম যেমন নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর বাণী “লি সালমানা হিনা আরাদা আই ইয়াছুদা লাছ লা ইয়ামবাগী লি মাখলুকিন আই ইয়াছুদা লি আহাদিন ইল্লাল্লাহ” অর্থাৎ যখন হযরত সালমান (রাঃআঃ) হযুর আব্দদাস (দরুদ শরীফ) কে সজিদা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি ইরশাদ ফরমালেন “কোন সৃষ্টির জন্য উচিত হবে না যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সজিদা করা”।

যা হারাম বা নিষিদ্ধ হয় তা নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হয় না, অতএব এখানে শর্তহীনের জন্য শর্তারোপ করা হয় নাই বরং হাদিছটির উদ্দেশ্যের জন্য বিবরণই হয়েছে।

প্রত্যুত্তরে বলব হযরত সালমান (রাঃ আঃ) উদ্দেশ্যে নবী করিম (দরুদ শরীফ) এর বাণী 'কোন সৃষ্টির জন্য উচিত হবে না' মর্মে পূর্ণ হাদিছটি সজিদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন হারাম হওয়ার মর্মার্থবোধক নহে। কেননা হাদিছে উল্লেখিত 'লা ইয়াহ্মাগী' অর্থাৎ উচিত হবে না কথাটি এমন নেতিবাচক যাতে তৎবিষয়ে (সজিদার বিষয়ে) অধিক হকদার হওয়ার অর্থকেই হাতছাড়া করে মাত্র। আর জ্ঞাত থাকা উচিত, 'হাছর' অর্থাৎ সীমাবদ্ধতার অর্থবোধক শব্দ 'ইল্লাহ' (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া) এর কার্যকারিতার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রকাশ পায় যে 'মোতলাক' অর্থাৎ শর্তহীন সজিদার যোগ্য হকদার ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ নহে বুঝা যায়। এখানে চাইতো "আল্লাহ" শব্দটি 'বদল' (অর্থাৎ পূর্বাগর অনুসৃত ও অনুগামী শব্দদ্বয় দ্বারা একই সত্ত্বা উদ্দেশ্য হওয়ার ভিত্তিতে হউক) কিংবা 'মুস্তাছনা মিনহ' (অর্থাৎ আল্লাহকে অন্যান্য পর্যায় থেকে বহিঃকৃত করে দেখানোর) ভিত্তিতেই হউক উক্ত অর্থই প্রকাশ করে।

অথচ এহেন অর্থ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তার ব্যাপার রয়েছে; কেননা পরিজ্ঞাত যে আল্লাহ তা'লা সম্মানের সজিদার হকদার নহে। এতে করে এই না বলে উপায় নাই যে ওখানে "ইল্লা" শব্দটি এমন 'হাছর' বা সীমাবদ্ধতার জন্য নয় যে এসতেছনার উক্তরূপ বিধানানুসারে 'মোতলাক' বা শর্তহীন সজিদার (অর্থাৎ সকল প্রকার সজিদার) হকদার একমাত্র তিনিই (আল্লাহই) হওয়ার অর্থ দেয়। বরং এখানে "লা ইয়াহ্মাগী" (অর্থাৎ উচিত হবে না) শব্দযোগে আরোপিত নেতিবাচক হুকুম থেকে "এদরাব" অর্থাৎ পট পরিবর্তনের নীতিমালা অনুসারে মানুষের সজিদার জন্য তিনিই (আল্লাহ) অধিক হকদার হওয়ার অর্থে শব্দটির (ইল্লা শব্দটি) প্রয়োগ বলতে হবে। এতে করে হাদিছটির অর্থ হবে- 'মানুষের জন্য যথোচিত হবে না কাউকে সজিদা করা বরং তার জন্য যথোচিত যে আল্লাহকেই সজিদা করা'। এখানে ইল্লা শব্দটি 'বাল্' অর্থাৎ বরং অর্থে ব্যবহৃত। এতদসঙ্গেই শর্তহীন সজিদার হকদার হওয়া মানে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সজিদারই হকদার হওয়া অর্থটি অত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের সাব্যস্তকরনের আওতায় সেই শর্তহীনেরই সাব্যস্তি বিবেচনায় অর্থায়ন করা যাবে। আর এসতেছনার আকারে হলে (অর্থাৎ অন্যান্যদের থেকে পৃথক করতঃ সীমাবদ্ধ করনের আকারে হলে) এহেন অর্থ লওয়া বৈধ হবে না; কেননা এসতেছনার চাহিদা অনুসারে শর্তহীনভাবে সকল প্রকারের সজিদা আল্লাহর জন্য সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। উহা তার ব্যাপকত্ব হতে নির্দিষ্টত্বের অর্থ লওয়ার মত বিরোধ সৃষ্টি করে। অতএব হাদিছটির অর্থ দাঁড়াল- "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই যখন সজিদার অধিক হকদার, তাই তিনি ছাড়া অন্য কাউকে সজিদা করা উত্তম নহে বরং তাঁকে সজিদা করাই উত্তম" আর উত্তম হওয়া অর্থটি আল্লাহ তায়ালা ওয়াজিব সজিদাকে শামিল করবে না, অতএব তিনি ছাড়া অন্যের জন্য হারাম সজিদাকে ও শামিল করবে না। এতে সুস্পষ্ট যে, 'শর্তহীন সজিদাটি' ইবাদতের জন্যই হয়ে থাকে কথাটি বাতিল। অতএব হাদিছটির মর্মার্থ পরিজ্ঞাত হওয়াতে আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উক্ত হাদিছ হারাম সাব্যস্তের জন্য দলিল হওয়া বৈধ নহে। কেননা হাদিছটির ভাষ্য হইতেছে- আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যকে সজিদা করাটা ছেড়ে দেওয়া উত্তম, আদৌ হারাম নহে। আর যাহা ছেড়ে দেওয়া উত্তম তার বিপরীতে জায়েজ হওয়াটা থেকেই যায়।

এ জায়েজের ক্ষেত্রে শুধু এটুকু মতানৈক্য যে, জায়েজটা কি মাকরুহ সহকারে? তবে কারো মতে মাকরুহ সহকারে হলেও, ব্যাপক মতানুসারে মাকরুহ বিহীন জায়েজ।

অতএব উক্ত হাদিছটির যখন হারামের জন্য দলিল হওয়া কোনভাবে সঠিক হচ্ছেনা 'লা ইয়াযাগী' (উচিত হইবে না) কথাটির অর্থের দিকে দৃষ্টি দিলেও নহে, 'ইল্লা' শব্দটির অর্থের দিকে দৃষ্টি দিলেও নহে তবে হারাম সাব্যস্তের জন্য ফলপ্রসূ অপর কোন দলিলও তো নাই; 'তোমরা তোমাদের ভাইকে সম্মান কর' নির্দেশটি বাধ্যতামূলক পর্যায়ে হিসাবে পাওয়া না যাওয়ার কারণে এটি সম্মান করাকে ওয়াজিব সাব্যস্তের জন্য হবে না। স্বয়ং সম্মান করা বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিলেও যেমন সুস্পষ্ট যে তা ওয়াজিব জনিত ব্যাপার নহে, সজিদা করা হয় না এমন পর্যায়ের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি দিলেও নহে। কেননা স্বল্প আগে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তা পরিহার করা উত্তম এবং যা পরিহার করা উত্তম উহার বিপরীতটা ওয়াজিব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। অতএব উহার অর্থ দাড়াই, সজিদার মাধ্যমে হউক কিংবা সজিদা ব্যতীত হউক তোমাদের ভাইয়ের সম্মান করা তোমাদের জন্য জায়েজ কিন্তু সজিদামুক্ত সম্মান করাই উত্তম আর সাহাবা কোরামগণ এ অর্থের দিক বিবেচনা করতঃ অর্থাৎ সজিদা মুক্ত সম্মান উত্তম হওয়ার দিক বিবেচনা করেই নবী করিম (দরুদ শরীফ) কে সজিদা করেননি; হারাম হওয়ার কারণে নহে। কেননা তা হারাম হওয়ার পক্ষে মূলতঃ কোন দলিলই নাই।

মোদাকথা - সজিদা বহির্ভূত সম্মান উত্তম হিসাবে উহা দ্বারা 'তোমরা তোমাদের ভাইকে সম্মান কর' নির্দেশটিকে শর্তযুক্ত করা হলেও অর্থ হবে- 'তোমরা তোমাদের ভাইকে এমন সজিদা বিহীন সম্মান কর যেই সজিদা ছেড়ে দেওয়া উত্তম হবে। এতে সুস্পষ্ট যে, সজিদাটি যেখানে ছেড়ে দেওয়া উত্তম, সেক্ষেত্রে সজিদা বিহীন সম্মান ওয়াজিব হিসাবে পাওয়া যাওয়ার বৈধতা নাই। অতএব এই ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়াটা বাধ্যতামূলক হওয়াতে জানা গেল সেই নির্দেশকে নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ। তোমরা তোমাদের ভাইকে সজিদা সহকারে সম্মান করোনা অর্থে প্রয়োগ করা বাতিল। কারণ যেই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য না হয়ে মোস্তাহাবের জন্য হয়ে থাকে তার বিপরীতটা কতিপয়ের মতে মাকরুহের পর্যায়ে পড়লেও হুকুম বর্তায় যে উহা মাকরুহ সহকারে জায়েজ। আর চিন্তা করুন, যেই বিপরীতটা মাকরুহ সহকারে জায়েজ সেটার জন্য নিষেধাজ্ঞা টেনে এনে হারাম বলাটাই না-জায়েজ, তদুপরি উক্ত নির্দেশ-মুবাহের জন্য হলে সেই নিষেধাজ্ঞার অর্থে অপপ্রয়োগ যে বাতিলই তা সুস্পষ্ট। এতে করে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, 'তোমরা তোমাদের ভাইকে সম্মান কর' নির্দেশকে সজিদা ব্যতীত সম্মান অর্থে প্রয়োগটা হাদিছটির মর্মার্থের বিবরণ নহে বরং কতিপয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি সহকারে শর্তহীন নির্দেশকে শর্তযুক্ত করারই প্রচেষ্টা যা শরীয়তের মূলনীতি কোরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াছের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতএব উহা প্রমানিত হওয়াতে আমি বলব - উভয় হাদিছ সংযোগ পর্যালোচনায় মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'আমি যদি সজিদা যোগে সম্মানের নির্দেশ দিতাম, তা হলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে অধিকারের সম্মানার্থে সজিদা করে, কিন্তু মানুষের জন্য উত্তম যে আল্লাহকে ছাড়া কাউকে সজিদা না করে, তোমরা তোমাদের ভাইকে সম্মান করলে তবে সেই সম্মান সজিদা ব্যতীত হওয়াই উত্তম।' অতএব 'সম্মান কর' নির্দেশটি এখানে 'খবর' বা বর্ণনামূলক অর্থ প্রদানকারী। উহার ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, সজিদা যোগে সম্মান করাটা, যিনি মোস্তাহাবের বিপরীতটাকে মাকরুহের অন্তর্ভুক্ত বলেন, তার মতে মাকরুহে ছুরী (অর্থাৎ দেখতে মাকরুহ মত হলেও আসলে মাকরুহ নহে) ছাড়া কিছু নহে। আপনার জানা যে, সম্মানের সজিদা মূলতঃ মোবাহ্ তথা জায়েজ; যা মৌলিকভাবে মোবাহ্ তাকে মাকরুহ পরিগণিত করে এমন কোন কারণ বা দোষত্রুটি পাওয়া যাওয়া ব্যতীত অর্থগত মাকরুহ হওয়া অবৈধ। আর মোস্তাহাবের বিপরীতটাকে মাকরুহের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মত পোষনকারীর মতানুসারে তা অর্থবহ মাকরুহ হওয়ার যে কোন কারনই নাই তাতে সুস্পষ্ট।

টীকা : কাওলিহি হামালা যালিকা ----। সজিদা সহকারে সম্মান কর না অর্থে প্রয়োগ। উক্ত নির্দেশকে নিষেধাজ্ঞার অর্থে প্রয়োগ যখন বৈধ হয় নাই তবে জানা গেল যে, যেই ব্যক্তি উহাকে (নির্দেশকে) সম্মানের বেলায় সজিদা না করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় বলবে, তার এই বলার পক্ষে নির্ভরযোগ্য বৈধতা নাই। কেননা সম্মানের বেলায় সজিদা না হওয়া যদি ওয়াজিবার্থক হত হবে সজিদা সহকারে সম্মান নিষেধ হওয়ার অর্থে প্রয়োগ অবশ্যই সঠিক হত। অথচ ঐ অর্থে প্রয়োগ জায়েজই নহে। তাইতো আমরা বলি সজিদা বিহীন সম্মানের নির্দেশ যদি ওয়াজিবের জন্য হত তবেই ঐ অর্থে প্রয়োগ বৈধ হইত অথচ ভাইয়ের সম্মান সজিদা বিহীন হলেও আদৌ ওয়াজিব নহে।

--“কাওলে মুগনি” মমতাজুল মুহাদ্দেহীন মাওলানা ওবাইদুল আকবর (রাহঃআঃ) এম.এম। এ বিষয়ে যেই সমস্ত হাদিস শরীফ সমূহ বর্ণিত হয়েছেন তা হতে অবশ্যই এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম এর সজিদা করার অনুমতি চাওয়ার প্রক্ষিপ্তে নবী করিম (সাঃ) সরাসরি সজিদা করার অনুমতি না দেওয়ার মধ্যে ও সম্মানী সজিদা জায়েজ প্রমান হয়ে যায়। যেমন- ধরুন, কোন অতিথি আসলে অতিথির নিকট যদি কেউ এভাবে জিজ্ঞাসা করেন আপনার জন্য কোন কিছু জবেহ বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করব কি? আর উত্তরে অতিথি যদি বলেন “লা ইয়ামবাগী” অর্থাৎ উচিত হবে না অথবা দরকার হবে না। ইহা দ্বারা অতিথির জন্য কোন কিছু জবেহ করলে তা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলে নাজায়েজ হবে না, জায়েজ হবে অর্থাৎ এ ধরনের বারণ করা দ্বারা অতিথির জন্য কিছু জবেহ করলে বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলে তা মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় হবে না। অনুরূপ ভাবে নবী করিম (দ.) এর উপরোক্ত হাদিস সমূহের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা উচিত। এক হাদিসে সাদ বিন কায়েস নবী করিম (দ.) কে সজিদা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, উত্তরে নবী করিম (সাঃ) বলেছিলেন “লা তাফ আল” অর্থাৎ ভূমি করো না। এখানে এ বারণ করাটা শুধুমাত্র একক সাদ বিন কায়েস এর জন্যই ছিল। অতএব মুছলেহত বা ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ এ বারণ যা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা করে থাকি। এর দ্বারা কোন মতেই মতলক বা অনির্দিষ্টভাবে সিজদায়ে তাহিয়া হারাম বুঝা যায় না। কেননা নিষেধবানীটি ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই ছিল। এর দ্বারা সবার জন্য সিজদায়ে তাহিয়া নিষেধ বুঝা যায় না। আমরা যা বর্ণনা করেছি তা হতে যখন স্পষ্ট হয়েছে যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ মুবাহ বা জায়েজ। অতএব ইহা অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তানকিহাতিছ ছুন্নিয়ায় সংকলকের কথা “বি-আনহ হারামুন কতআন” অর্থাৎ সজিদায়ে তাহিয়াহ হারামে কাত্বী (মূলতঃ হারাম)- এ কথা কোন বিজ্ঞ জ্ঞানীর কথা নয় বরং ইহা ঐ ধরনের অজ্ঞ ব্যক্তির কথা যারা কোন কথার মূল উদ্দেশ্য ও সত্যতা বুঝবার শক্তি রাখে না।

টীকা : কাওলিহি হারামুন কতআন(মূলতঃ হারাম)

যখন ইহার (সিজদায়ে তাহিয়াহ) হারামের জন্য কোন অকাটা নহ বা দলিল পাওয়া যায় নি, তখন ইহাকে হারাম বলা কোন মতে জায়েজ হবে না। যার বর্ণনা ফিকহ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাব হেদায়া নামক কিতাবে আছে। অর্থাৎ যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন অকাটা নহ বা দলিল পাওয়া যাবে না তার জন্য হারাম শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যখন সিজদা বিষয়ে প্রত্যেক হাদিসই জঙ্গফ তথা দুর্বল অর্থাৎ ইহাতে ইবাদতের সিজদা/রুবুবিয়াতের সিজদা/ অনির্দিষ্ট সজিদার অর্থ নিহিত তা সন্দেহ আছে। তাই ইহা দ্বারা অকাটা হিসেবে সম্মানের সজিদা হারাম বলা যাবে না। তাই ফেনী মোনাযেরায় তিনি যে বলেছেন “ইহা ইজমা দ্বারা অকাটা হারাম” তা বাতেল বা অগ্রাহ্য হিসেবে প্রমানিত হলো।

--কাওলে মুগনি মমতাজুল মোহাম্মেসীন জনাব মৌলানা ওবাইদুল আকবর (রাহঃ) এম.এম।

الامور غايت القول ان الاجماع على انه حرام والاجماع دليل قطعي لافادة الحكم فيفيد
 كونه حرام قطعاً اقول قد ثبت بنص القرآن ان سجود الاكرام مباح في اصله ولم
 يتحقق بفعله الحديث انه حرام قطعاً حتى يثبت به نسخ الكتاب فلو سلم ان
 الاجماع انعقد على كونه حرام في اصله قطعاً فلا شك ان ذلك الاجماع في محل
 المعارضة لما يشهد به الكتاب والاجماع الذي يعارض نص القرآن ليس باجماع
 وليس بدليل قطعي فانه لا يجوز ان ينسخ به الكتاب فالترجيح لما ثبت بنص القرآن
 وهو اباحة السجود في اصله بل الدعوى بان الاجماع انعقد على حرمة اصله
 باطلة لما فيه من اختلاف العلماء كما سيأتي قال في التفتيحات اگر آب حنفيت
 كه مدعي من توروايت فقه كومانيس في الشامية اختلفوا في سجود الملائكة فقيل كان
 لله تعالى والتوجه الى آدم للتشريف كاستقبال الكعبة وقيل بل لادم على وجه
 التحية ثم نسخ بقوله ^{عليه السلام} لو امرت احداً ان يسجد لإحدى الامرت المرأة ان تسجد
 لزوجها تارة ثانية قال في تبين المحارم والصحيح الثاني ولم يكن عبادة له بل
 تحية واكراماً اقول ان نسخ امر الملائكة بالسجود بذلك الحديث هو قول بعض
 الفقهاء المتأخرة لأقول اهل التماسير ولا قول القدماء من الفقهاء وقد عدّ
 صاحب التفسير الاحمدى جميع النواسخ والمنسوخات في ذلك التفسير
 وقد قال فيه انه لا مزيد عليه في كتب الحنفية لكن لم يعد ان ذلك الامر

له قوله التفسير الاحمدى له قال في التفسير الاحمدى صاحبه والمحققون على انه غير
 منسوخ اذ النسخ انما يكون في الاحكام دون الاخبار انتهى وفي التوضيح فاعلم ان الحكم
 اما لا يحتمل النسخ في نفسه كلاحكام العقلية مثل وحد مشيته تعالى وامثالها وما يحرمها
 كالامور الحسية والاخبارات عن الامور الماضية والحاضرة والمستقبلية ،
 انتهى القول المغنى لعبيد الاكبر

نسخ بالحديث المذكور وما اوردته فيه بل قال فيه ان قوله تعالى اسجدوا لآدم
 من قبيل الاخبار ولا يجوز للنسخ له وايضا لم يعلم كون ذلك الامر منسوخا
 به عند احمد والمالك ولا ينسخ كلام الله بكلام الرسول عند الشافعي و
 ايضا ذلك الحديث من احاديث الاحاد فلذلك ذكره في الفصل الثالث
 من المشكوك وما فيه من الاحاديث ضعيف فلا يجوز به نسخ الكتاب ولو سلم
 كون معناه مشهورا متواترا في القرون المتأخرة وكون حديث الاحد في حكم
 المتواتر عند انتشاره بكثرة النقل لكن ذلك في حق جواز العمل به لا في حق ان يجوز
 به نسخ الكتاب كما زعمه صاحب التنقيحات ولو سلم لكن لانما جواز
 بهذا الحديث فان في سجود الملائكة لآدم اقوالا مختلفة واحتمالات كثيرة
 وذلك ينافي في النسخ ويبانه الا يري ان من قال ان ذلك السجود كان سجودا
 لغويا بمعنى الخضوع والانقياد فلا وجه للنسخ على قوله فيه ومن قال انه
 كان لله وادم كان كالقبلة فلا يتوجه النسخ على قوله ايضا فان السجود على
 هذا القول كان لله تعالى ولا احتمال للنسخ فيه فانه يجوز ان يجعل غير الله
 تعالى قبلة لسجوده كما هو مشاهد في البيت غايه القول ان جعل الانسان

له قوله الاحاديث في تفسير كلامي المذكور مستوافق قواعد اصول شرائع من قبلنا هجت
 ما لم يظهر لنا نسخ في شريعتنا وبجدة تحت در شريعت حضرت يعقوب عليه السلام به
 نفس كتاب وخراله سجدا جائز بود پس در شريعت ما ينزجائز باشد وناسخ اين جواز را در شريعت
 ما غير از خبر واحد نيست لو كنت امرت الخ وناسخ نص كتاب را بايد كه خبر متواتر باشد نه خبر واحد
 مع هذا اين خبر واحد محتمل است كه بنظر اشتباه سجدة تحت با سجدة عبادت داده شد زيرا كه مردم
 قريب العهد بالكفر بودند وعبادت غير الله مقاد و اگر در آن وقت منع مطلق فرمودند كانهي
 من الختم والمرقت انتهى كذا في البهاكمبير ١٣ القول المعنى لعبد الاكبر
 له قوله ضعيف له المراد بالضعيف لامعناه الاصطلاحى بل معناه اللغوى اى ما
 لا يجوز نسخ الكتاب ١٢ مجيد الاكبر

قبلة لسجود انساأنا اخر قد نسخ بذلك الحديث اقول ولو سلم لكن لا يلزم منه كون المنسوخ من اصله منسوخاً فان السجود لم ينسخ من اصله فانه كان لله تعالى ومن قال انه كان لا دُم على وجه الحقيقة هذا هو الحق نقوله يجب الى كون السجود المذكور في الحديث هو سجود التوبة فانه قد تعين على ما هو الحق ان المراد بسجود الملائكة هو هذا السجود فان لم يكن المراد من سجود الحديث هذا السجود يكون القول بالنسخ باطلاً وفي كون سجود الحديث سجود التوبة بحث فان معناه يكون حينئذ لو امرت احدا ان يحصى بالسجود احدا لا امرت المرأة ان تحصى به زوجها ولم يرد الحديث التوبة المرأة بالسجود بل ورد لبيان كمال اطاعة المرأة لزوجها كما يدل عليه قوله لما جعل الله لهم عليهن من حق ولو امرها أن تنقل من جبل ابيض الى جبل اسود الحديث قال في اللغات ان قوله عليه الصلوة والسلام لو امرت المرأة بمالعة وبيان كمال وجوب اطاعة الزوجة للزوج الخ وبيان كمال المبالغة من قبيل المجاز ولا يجوز بالمجاز أن ينسخ حقيقة القرآن وبيان كمال المبالغة به انما يتحقق اذا اريد بالسجود سجود التعظيم على وجه الاطاعة لا اذا اريد به سجود التعظيم على وجه التوبة فانه بمعنى السلام فليس فيه معنى الاطاعة اصلاً حتى يصح ارادة كمالها به ولو كان امر النبي عليه والصلوة والسلام للمرأة ان تسجد لزوجها الامر بالنظر الى ان الزوج في حقها ممن يجب اطاعتهم فلا بد ان يكون سجودها سجود الاطاعة لا سجود التوبة فان سجود التوبة لا يكون لحق يجب به اطاعة الساجد للمسجود بل اما يكون لمحض الاكرام ولو امر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لسجود زوجها الامر لحق له

للزوجة لسجود زوجها الامر لحق له عليها كما يشهد به فحوا الحديث بخلاف سجود التوبة للمشايخ والوالدين وغيرهم فانه ليس بالنظر الى انهم

من اهل الحقوق الذين يجب اطاعتهم بل باعتبار انهم ممن يحق أن
يكرموا كراماً محضاً وايضاً بسجود التحيّة انما يكون في اول الملاقات
قد اقره صاحب التنقيحات حيث قال تحت تو اول ملاقاتين دستور
الى اخره ،

اول اللقاء بين الزوجين انما يكون في الزفاف الاول وبعد ذلك دام اللقاء ولو
وقع الفصل بينهما في حين من الاحيان باقتضاء الضرورة فهو في حكم الوصل
بحكم الزوجة فثبت ان النبي عليه الصلوة والسلام لو كان امرها بالسجود
له كان نظراً الى وجوب اطاعة عليها فلا بد ان يكون ذلك سجود الاطاعة
بالضرورة بمعنى ان تطيع المرأة لزوجها بذلك السجود وانت تعلم ان
الاطاعة وان كانت عامة من العبادة لكن عند تقيدها بالسجود تكون بمعناها
فان المقصود بها حينئذ يكون طلب القربة بالسجود الى من يطاع له وهذا
معنى العبادة وقد بيناه لعل الصحابة رضی الله عنه سئلوا النبي عليه
الصلوة والسلام عن رأيه في ذلك اى في ان يطعوه بالسجود ولو لا ذلك لم
يقبل لهم لو كنت امرت الله ، فان الجواب بعدم الامر بسجود الاطاعة
انما يليق للسؤال به اى للسؤال بسجود الاطاعة كما لا يخفى ففي الحديث
ليس علم الامر بسجود التحيّة بل عدم الامر بسجود الاطاعة فلا يجوز حملها
على نسخ الكتاب فان ما فيه من السجود هو سجود التحيّة على الخصوص كما تقدم
ولما كان الغرض منه بيان كمال المبالغة في اطاعة الزوجة لزوجها على وجه
المجاز لا وجوب السجود في الواقع لا ضرر في تلك الارادة فأمّا ،

له قوله في تلك الارادة الله ، هذا جواب ما قيل ان ارادة سجود الاطاعة منه في غاية
العبد فأنه في المعنى سجود العبادة جوابه لا ضرر فيه فان الغرض منه بيان كمال
المبالغة في الاطاعة لا السجود في الواقع وارادة سجود الاطاعة بطريق التجوز
غير ممنوع ۱۳ القول المغني لعبيد الأكبر ،

حاصل ما في الباب أن المراد بالسجود في قوله **لَوْ كُنْتَ أَحَدًا** الخ أن كان سجود التَّحِيَّةِ
بقريته **أَكْرَمُوا** أَخَاكُمْ فففيه ما فيه كما قد مناه في محله وإن كان سجود الإطاعة
على وجه المجاز هذا هو الحق فهو غير السجود للتَّحِيَّةِ فلا يجوز به نسخ الكتاب أيضًا
مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به

له قال بعض اخوة الزمان أن النبي عليه السلام أراد بأخاكم في أمر أكرموا أخاكم ذاته الشريفة فيكون
أمر أكرموا للوجوب لأن أكرموا واجب والمراد بالأكرم بغير السجود كما في المرات من قوله وأعبدوا
ركبوا بالسجود وأكرموا أخاكم بالمحبة القلبية والإطاعة بغير السجود الخ وقد دلت القرينة
على أن المراد بالأكرام الأكرام بغير السجود فإن الحديث مسوق لمنع الصحابة عن السجود حين
سألو أن يسجد له فلذلك ما سجد له أحد منهم ومعنى الحديث يجب أن لا يوجد السجود في
الأكرام فيكون الأكرام بالسجود حراماً لأن ضد الوجوب حرام هذا هو مراد صاحب المرات
لهذا قيد الأكرام بغير السجود، أقول أن توكير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واجب
بنص القرآن فلا حاجة إلى حمل هذا الأمر على الوجوب بل ذكر أخاكم فيه ينافي الحمل عليه
فإن لو سلم أنه أراد بأخاكم ذاته الشريفة لكن لم يبطل بأرادة هذا الخصوص صحة محله
على معنى عمومته فلما بقي ذلك لزم بحمله على الوجوب أن يكون تعظيم عموم الأخوة واجباً
الأيضاً أنه لو هو أرادة ذاته الشريفة من أخاكم كان من قبيل ذكر العام وأرادة الخاص
منه وظاهر أن الخاص إنما يراد من العام إذا كان من بعض احتمالاته على هذا لو كان أمر
أكرموا للوجوب لكان لوجوب الكرام عموم الأخوة البتة والأكرام يجوز أرادة خصوص وجوب
أكرام النبي عليه السلام منه وكونه لوجوب الكرام عموم الأخوة غير جائز بهذا تبين أن أمر أكرموا للندب
والأمر المندب يكون للندب بجميع قيوده أنه فعلم أن القيد بغير السجود الذي وقع في المرات إنما
هو لاستحباب الأكرام بل وأنه لا تعميم الأكرام عند كونه مقيداً به فلما كان الأكرام بغير السجود
مستحباً يكون الأكرام بالسجود غير مكروه فإن ضد المندوب جائز من غير كراهة عند الأكثرين
وفي قوله أمر أكرموا للوجوب لأن أكرامه واجب مصادرة وليس معنى الحديث وجوب عدم كون
السجود في الأكرام فإن الأمر مختص من طلب الفعل بالمصدر نحو ضرب مختص من اطلب منك
الضرب كذلك أكرموا أخاكم مختص من اطلب منك أكرامه فلا بد أن يكون لوجوب الأكرام
على القول بوجوب أمر أكرموا أخاكم فيكون معنى الحديث على هذا القول أن تعظيم
عموم الأخوة واجب وبطلانه ظاهر وأيضا طلب عدم كون السجود في الأكرام ليس بمختص
من طلب الفعل من مصدر أمر أكرموا فلا يجوز أن يفيد وجوبه فلا يكون عدم كون

بأى الله منه بر

لكن عدم الامر بما يكون مباحاً في اصله لا يفيضي الى كونه منهيّاً فان عدم الامر ليس نهياً بل هو كف عن الامر والكف عن الامر خبر لا يصلح ان يكون ناسخاً فانه لا يفيد الوجوب ولا التحريم ولا بدّ للناسخ ان يكون ما يفيد الوجوب كالامر مثلاً او التحريم كالنهي مثلاً كما سياتي ولما افاد الكف عن الامر هنا انتفاء الوجوب وانتفاؤه لا يستلزم انتفاء الندب والاباحة علم ان الندب او الاباحة هنا باقية ولو قطع النظر عن ذلك كله وحمل الحديث المذكور مع نظائره من الاحاديث على نسخ الملائكة بالسجود فلا يخلوا ان يحمل على نسخ وجوبه الذي كان على الملائكة او على نسخ استحبابه الذي كان في شرع من قبلنا او على نسخ جواز الذي كان في ضمن ذلك الوجوب او كان في ضمن ذلك الندب اما على الاول فلا يكون النسخ معنى فان وجوبه قد كان تنقطع عن الملائكة بسجود آدم عليه السلام مرة لان الامر المطلق لا يحتمل التكرار فلم يبق بعد ذلك حتى يحتاج الى نسخ فلا معنى لحمل الحديث على نسخ الوجوب واما على الثاني فلوسم صحة النسخ لكن لا يلزم منه نسخ الجواز على ما هو المختار فان نفى الندب لا يستلزم نفى الجواز عند اكثرهم كما تقدم فلما بقي ندب باعده سقوط وجوبه عن الملائكة في شرع من قبلنا علم ان جوازها اصلي فان الجواز الذي يكون في ضمن الندب يكون اصلياً فلو حمل الحديث على نسخ هذا الجواز فاقول ان الجواز الاصلي هو الاباحة الاصلية للاشياء فهو من اوصافها الاومة لها بل من ماعياها فلا يجوز ان ينفك من الاشياء من غير ضرورة

بكمية صفة كذا شيء
السجود في الاكرام ضد للوجوب كما زعم ذلك القائل فلا يكون طراً ولو سلم ان القرينة سياق الحديث على المنع الصحابة عن السجود لكنه غير مفيد للتحريم فلان ما هو الثابت بذلك القرينة يبقى فيه احتمال ضد وهو من المشبوت التحريم ويجوز ان يكون المنع الصحابة عن السجود لمصلحة خاصة فلا يثبت به التحريم (٢) قوله ايضا منهم الحديث ان هذا التوجيه انما يصح اذا اريد بالسجود في الحديث سجود التحية للسجود الاطاعة فان سجود الاطاعة ليس بمباح في اصله ١٢

(في صفحة هذا) (١) قوله فلو سلم انما قال ذلك لان القول بالنسخ على هذا التقدير ايضا باطل فان الندب لا يكون داخل تحت التكليف ولا يكون داخل تحت التكليف لا يقبل النسخ فلا يصح القول بكون المندوب منسوخاً

القول المعنى لعبيد الاكبر

وَالْأَيْلَازُ انْقِلَابُ الْحَقَائِقِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَلَا بَدَّ لِلنَّسَخِ ذَلِكَ الْجَوَازُ مِنَ الْمَبَاحَاتِ مِنْ
 عَارِضٍ مُحَرَّمٍ دَاعٍ إِلَيْهِ وَذَلِكَ الْعَارِضُ الَّذِي لِلنَّسَخِ لَا يَكُونُ فِي مَا هِيَ وَلَا فِي وَصْفِهِ الْأَلَا
 نَأَنَّ الشَّيْءَ بِالْأَوَّلِ يَكُونُ حَرَامًا لِعَيْنِهِ وَبِالنَّشْأَةِ يَكُونُ مَلْحَقًا بِهِ كَمَا فِي الْأَصُولِ ، وَ
 الْمَبَاحُ مُشْرَعٌ بِجَوَازٍ أَصْلِي فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةَ نَوِيَّةٌ مِنَ الشَّرْعِيَّاتِ فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ
 بِالْأَمْرِ لِلتَّخْيِيرِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ وَلَا مَلْحَقًا بِهِ لَلْأَيْلَازِ ائْتَلَا
 الشَّيْءُ فِي حَقِيقَتِهِ وَلَوْ مِنْ حَيْثُ انْقِلَابُ وَصْفِهِ فَلَوْ نَسَخَهُ نَاسِخٌ وَجِبَ
 أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّاسِخُ عَارِضًا بِمَجَاوِرٍ قَدْ تَحَقَّقَ فِيمَا مَرَّانِ سَجُودَ التَّحِيَّةِ
 مَبَاحٌ فِي أَصْلِهِ فَلَوْ سَلَّمَ أَنْ نَسَخَ بِالْحَدِيثِ فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ نَسَخُهُ بِذَلِكَ
 الْعَارِضِ الْمَجَاوِرِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النَّاسِخَ أَمَا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا أَوْ يَكُونَ نَهْيًا
 فَإِنْ كَانَ أَمْرًا فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْوَجُوبِ فَإِنْ غَيْرُ الْوَجُوبِ لَا يَفِيدُ النَّسَخُ
 بغيره وَإِنْ كَانَ نَهْيًا فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ لِلتَّحْرِيمِ فَإِنْ غَيْرُ التَّحْرِيمِ لَا يَفِيدُ ،
 ذَلِكَ أَيْضًا كَمَا فِي الْأَصُولِ نَأَنَّ كَانَ الْأَمْرُ نَسَخًا لِلْجَوَازِ فَإِنْ كَانَ الْجَوَازُ فِي
 ضَمَنِ الْوَجُوبِ بِالْأَمْرِ يَبْقَى إِذَا نَسَخَ الْوَجُوبُ بِلِ نَسَخٍ عِنْدَ كَوْنِهِ مَنسُوخًا بِذَلِكَ
 الْأَمْرِ عِنْدَ تَأْخُلَا فَالِلشَّافِعِيِّ وَيَكُونُ النَّاسِخُ حَيْثُ نَسَخَ مَتَضَمِّنًا لِلْحَرَمَةِ جَمِيعٍ -
 أَضْلَلَهُ كَالْأَمْرِ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْبَيْتِ نَسَخَ بِهِ جَوَازُ التَّوَجُّهِ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ مَعَ أَفَادَتِهِ
 حَرَمَتُهُ التَّوَجُّهُ إِلَى جَمِيعِ أَضْدَادِهِ مِنَ الْبُيُوتِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ جَوَازَ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا كَانَ

(١) قَوْلُهُ انْقِلَابُ الْحَقَائِقِ الْمُرَادُ بِالْحَقَائِقِ الْأَصْلِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لَا الْحَقَائِقِ الْعَنْصَرِيَّةِ

(٢) أَتَوَلَّى لِلْوَجُوبِ الْوَيْفِيدُ أَنْ كُلِّ مَا يَفِيدُ الْوَجُوبَ سِوَا مَا كَانَ أَمْرًا أَوْ خَيْرًا - نَحْوُ كِتَابِ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ
 يَجُوزُ بِهِ النَّسَخُ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَيُفِيدُ التَّحْرِيمَ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْوَجُوبِ وَكَذَلِكَ الْمُرَادُ بِغَيْرِ التَّحْرِيمِ مَا لَا يَكُونُ
 لِلتَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ لَا يَفِيدُ ذَلِكَ الْإِ) يَسْتَفَادُ مِنْهُ بِمُطْلَاقٍ مَا فِي مَنَافِعِهِ فَلَنِي عَنْ تَفْسِيرِ الْمَلِكِ وَ
 الْحَادِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ كَانَ سَجُودَ التَّحِيَّةِ فِيمَا مَضَى ثُمَّ نَسَخَ بِقَوْلِهِ لَسَلَّمَ حِينَ ارَادَ أَنْ يَسْجُدَ
 لَا يَنْبَغِي لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَمُتَلَ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَفِيدُ التَّحْرِيمَ بَلْ يَبْقَى فِي ضِدِّ الْجَوَازِ وَأَيْضًا لَا يَنْبَغِي
 خُصُوصَ سَجُودَ التَّحِيَّةِ بِنَسَخِ الْهَلَاكِهَ فَإِنَّ سَلْبَ الْكُلِّيِّ لَا يَنْبَغِي تَحَقُّقَ الْجُزْئِيِّ ١١١ الْقَوْلُ لِلْفَرِيقِ

ثابتاً في ضمن الوجوب بالامر فنسمة بنسخه وإن لم يكن الجواز في ضمنه أي الوجوب
 بل كان جوازاً أصلياً فحينئذ يبقَى ذلك الجواز إذا نسمة الوجوب وثاقاً أي باتفاق بيننا
 وبين الشافعي خلافاً للفرق إلى فان عندنا على ما في المسلم لا يبقَى الجواز الأصلي ايضاً
 عند نسمة الوجوب فلا بد للجواز عندنا من نص جديد وعندنا وعند الشافعي لأحاجة
 إلى نص جديد فان الإباحة الأصلية قائمة مقام النص كما في الأصول فما في المسلم
 من قوله يبقَى الجواز إذا نسمة الوجوب ناظر إلى هذا المعنى يبقَى الجواز -
 الأصلي إذا نسمة الوجوب كما في قوله مبنى على مذهب الشافعي قال في حاشية
 نور الأنور قوله صفة الجواز أنه فان بطلان المتضمن يدل على بطلان ما في
 ضمنه فالجواز لو ثبت بدليل آخر أو بالإباحة الأصلية فان الأمر يفيد الجواز -
 الذي هو في ضمن الوجوب بالامر كما الجواز الذي في ضمن النّدب أو الإباحة فاذا
 نسمة الوجوب ففي هذا الجواز أما الجواز الذي هو الإباحة أو في ضمن النّدب
 فهو حكم آخر ألا يكون الناسم حينئذ أي حين كون الإباحة أصلية متضمناً
 لحرمة ضدّها فقط لا لحرمة جميع أمثلة مثل صوم رمضان نسمة به وجوب
 صوم الأيام الأبيض الجواز فانه أصلي لا مساع للنسمة فيه ولا يلزم انقلاب حقيقة
 الأصلية فهو ممنوع وإن كان الناسم نهياً بمعنى مفيد للتّحريم فنسمة جوازاً وعلم
 نسمة جوازاً كما ذكرنا في جواز المنسوخ بالامر فان جواز المنسوخ إن كان حكماً أصلياً
 على قوله الأصل في الأشياء الإباحة فعند نسمة الوجوب بالامر لا ينسمة الجواز
 بل لا بدّ للنسخة من عارضٍ محرمٍ مجاورٍ للسجود للتحية

(١) فإذ نسمة الوجوب فإذ ان سقوط الوجوب لا يستلزم بطلان ما في ضمنه بل انما
 يستلزم نسمة فلو سلم ان جواز سجود التحية ضمنى لا يجوز الحكم ببطلانه
 بهذا السري في الشرائع السالفة مع سقوط وجوبه فلما بقى جواز بدون الوجوب
 لم يصح القول بنسخه بالحدث فانه غير داخل تحت التكليف وما لا يكون دخلاً
 تحته لا يجري النسمة فيه ، الجيد الأكبر ،

اذا قلنا ان وجوبه قد نسخ بالناسخ وان لم يكن الجواز حكماً أصلياً بل شرعياً بمعنى
 انه ثبت في ضمن الوجوب بالامر فان كان ذلك الجواز للضرورة فلا يبقى عند زوال الضرر
 بل يعود الحرمة الاصلية عند زوالها وزوال الضرورة نسخ ذلك الجواز ويكون النص
 الذي ورد في تحريمه بياناً له كمنهى نكاح الأخت الذي كان في شريعة آدم وان
 كان الجواز حكماً مبنياً على التشديد كقطع الاعضاء الخاطئة فالرخصة فيه تخفيفاً
 نسخ الجواز فلا يبقى الجواز فاقه مع كونه حواشياً في الأصل على قولهم الأصل في
 النفس الحرمة كان واجباً بأمر التشديد في شريعة موسى عليه السلام فلما زال
 التشديد تخفيفاً لنا عاد الحرمة فالجواز هنا لم يكن أصلياً بل كان في ضمن الوجوب
 بالامر الذي كان على التشديد وزوال التشديد نسخ ذلك الجواز ونص حرمة
 القطع وقع بياناً له وجواز التعظيم ليوم السبت ونحوه لم يكن أصلياً فلذلك نسخ
 من أصله بالاسلام بعد اكله مما تمسك به صاحب التنقيحات السنية
 لاثبات فناء الجواز اذا نسخ الوجوب وقد علمت مما ذكرنا ان فناء الجواز في هذا
 كله ليس بنسخ الوجوب بل لعدم كونه أصلياً فظهر ان ما تمسك به كله باطل
 فحاصل ما في الباب ان الجواز ان لم يكن شرعياً ثابتاً في ضمن الوجوب بل الامر
 بل كان أصلياً سواء كان الناسخ مما يفيد الوجوب كالامر مثلاً او مما يفيد التحريم
 كالمنهى مثلاً لا ينسخ اذا نسخ الوجوب بل يبقى فكان اباحتها الاصلية نص لذلك الجواز و
 وجه بقائه ان كل حقيقة هي اصلية كالوجوب الاصل والحرمة الاصلية والاباحة
 الاصلية لا يجوز ان ينسخ من اصلها عن الاشياء التي يكون قوامها بتلك الحقائق
 كالإنسانية مثلاً عن افراد الانسان والاي لازم انقلاب الحقائق ولو في حكم الاوصاف

(١) قوله اذا قلنا ان هذا على تقدير القرض بطريق التمثيل والوجوب سجود التحية قد
 سقط سجود التحية قد سقط سجود الملائكة مرة بدفعة واحدة لعدم احتمال الامر بالطلاق
 تكرار كما تقدم فلا حاجة الى القول بانه نسخ بالناسخ ١٢ القول الغني لعبد الأبر

واللأنهم باطل فالملزوم كذلك فإما لم يجوز نسخها لا يحتاج إلى
نص جديد للحكم بالجواز فيها بل باحتقائها الأصلية نص لجوازها هذا
هو مراد صاحب المسلم فيما قال يبقى الجواز إذا نسخ الوجوب، الغرض
فهو لم يقتد للجواز الذي يكون وجوده في ضمن الوجوب بالامر
لأنه جواز ضمنى لا وجود له بدون الوجوب فلهذا لم يتعرض
له ومراده أن الجواز الأصلي يبقى إذا نسخ الوجوب وما هو المشهور
من أن مذهب الحنفية عدم بقاء الجواز إذا نسخ الوجوب فهو حكم
مخصوص للجواز الذي يكون في ضمن الوجوب بالامر فتدبر وما
ذكرنا من أن الحقائق الأصلية لا تجوز أن تنقلب في نفسها ولا
تتسخ من أصلها فلهذا إن اجراء كلمة الكفر في اللسان وتكلمة في
حاله الإكراه إنما يرخص شرعاً في حق سقوط الأثر فقط لا في
حق كونه مباحاً بالإكراه بل يبقى حرمة في حالة الإكراه أيضاً فلهذا
يكون الغزمية فيه أولى من الرخصة حتى لو أكره على أن يسجد للملك
سجود العبادة يكون الصبر أولى من السجود له بناءً على أن الغزمية
فيه بالنظر إلى حرمة أصله أفضل من الرخصة وإن أكره على
سجود التحية له يكون فعله أولى من الصبر بناءً على أن الرخصة فيه
أفضل من الغزمية لأنه في الأصل مباح وإنما يحرم لعارض مجاور وكل
امر مباح تعرضه الحرمة بالعارض المجاور يكون الرخصة فيه أولى
من الغزمية مع بقاء عارض الحرمة فلهذا قال في العالم كبرية
لو أكره على أن يسجد للملك فإن أمره بالسجود للعبادة
فالأفضل أن لا يسجد وإن أمره بالسجود للتحية فالأفضل
أن يسجد فتأوى ..

قاضيخان إلا فلما ثبتت أن السجود للتحية أفضل في حالة الاكراه
علم أن ذلك السجود ليس بحرام لعينه ولا بحرام لوصفه بل حرام لمجاوره
وما يكون حراماً للمجاورة يكون مباحاً في أصله فثبت أن سجود التحية
مباح في أصله انتهى حرم في بعض الاحياء بعارض مجاور بهن
سقط قول من قال أنه حرام من أصله بالتسليم بالاحاديث فإنه
لو كان حرام لعينه بنسخ أصله بالاحاديث مثل نكاح الاخت لم
يكن التخصيص فيه أفضل من العزيمة في حالة الاكراه فلما كانت
حرمته بعارض مجاور لا يمينه ان يكون في بعض الاحوال مشروطاً.
اي في صورة لا يوجد فيه ما ذلك العارض بل لا يمينه ان يكون مشروطاً
مع بقاء ذلك العارض عند الضرورة، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ فُضِّلَ لَكُمْ
مَآخِرُ عَلَىكُمْ إِلَّا مَا ضَلَّكُمْ الآية ٤

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সিজদায়ে তাহিয়াহর বিরুদ্ধবাদীদের দলিল ও নাসেখ-মনসুখ বিধানের যুক্তিখন্ডন

(আত তানকিহাতিচ ছুন্নিয়াহ সংকলক বলেন) নিঃসন্দেহে সজিদায়ে তাহিয়াহ ইজমায়ে ওলামায়ে কেরামদের মতে হারাম। আর 'ইজমা' হল দলিলে কতরী বা অকাটা দলিল কোন বিধান বাস্তবায়নের জন্য, তাহলে 'ইজমা' দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ অকাটাভাবে হারাম বিবেচিত হয়।

(আততানকিহাতিচ ছুন্নিয়াহ লিখকের উপরোক্ত কথা খন্ডনে আত-তাওজিহাতুল বহিয়াহ কিতাবের সম্মানিত লিখক-আল্লামা ফরহাদাবাদী (রাহঃ) বলেন) "নসুসে কোরআন তথা কোরআনের আয়াত দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ মুবাহ তথা জায়েজ হওয়া স্পষ্ট। কোরআনে করিমের অন্য কোন আয়াত দ্বারা যতক্ষণ হারাম হওয়ার দলিল পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ শুধু হাদীস শরীফ দ্বারা কোরআনের কোন বিধানকে অকাটা হারাম বলা যাবে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মূলতঃ অকাটাভাবে সজিদা তাহিয়াহ হারাম হওয়ার বিধান 'ইজমা' দ্বারা নির্ধারিত হয়, তখন কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ 'ইজমা' কোরআনের শুধুমাত্র ঐ বিষয়ে প্রযোজ্য হবে, যে বিষয় কোরআনের আয়াত পাওয়া না যায়, আর যেই 'ইজমা' কোরআনের কোন আয়াতের বিপক্ষে হবে তাকে তো 'ইজমা' বলা যায় না এবং এই জাতীয় 'ইজমা' দলিলে কতরী ও না, পরন্তু 'ইজমা' দ্বারা কোরআনের কোন আয়াতের বিধান নসুখ বা রহিত হয় না। এতে তরজীহ তথা প্রাধান্য হচ্ছে যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ পবিত্র কোরআনের 'নস' বা দলিল দ্বারা মূলতঃ মুবাহ

তথা জায়েজ। অতএব 'ইজমা' এর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সজিদায়ে তাহিয়াহ হারাম হওয়ার দাবী বাতিল বলে বিবেচিত হল। উপরন্তু সজিদায়ে তাহিয়াহ এর ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামগণের মত ভিন্নতা দেখা যায়, সামনে এর আলোচনা আসতেছে।

তানকিহাতিচ ছুন্নিয়াহ কিতাবের সংকলক বলেন, 'যদি আপনারা হানাফী মাজহাব মানেন, তাহলে ফিকাহবিদগণের মতকে মান্য করুন। ফতোয়ায়ে শামীর 'শামীয়া' নামক কিতাবের মধ্যে আছে, ফিরিশতাদের সজিদা করার ব্যাপারে মত ভিন্নতা আছে, কেউ বলেছেন, সজিদা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল, আদম (আঃ) কে সম্মানার্থে সামনে রাখলেন যেমন কাবা শরীফকে সামনে রাখা হয়, আর কেউ বলেন, সজিদা আদম (আঃ) কে করেছিলেন তাহিয়াহ তথা সম্মানার্থে, অতঃপর নবী করিম (দ.) এর নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারা রহিত হয়েছে :-

নবী করিম (সাঃ) এর বাণী : 'লাউ কুনতু আমরতু আহাদান আইইয়াহুদা লি আহাদিন্ লা আমরতুল্ মিরআতা আন্ তাসযুদা লি যাওযিহা' অর্থাৎ নবী করিম (সাঃ) বলেন, 'আমি যদি অন্য কাউকে সজিদা করার নির্দেশ দিতাম অবশ্যই আমি স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীকে সজিদা করার জন্য। যা তাতার খানিয়া নামক ফতোয়ার কিতাবে ও তাবযীনুল মহারেম কিতাবেও উক্তরূপ উল্লেখ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় মতই সঠিক কারণ উক্ত সজিদা ইবাদতের উদ্দেশ্য ছিল না বরং আদম (আঃ) কে তাহিয়াহ ও সম্মানের উদ্দেশ্যেই ছিল।

(আত-তাওজিহাতুল বহিয়াহ কিতাবের সম্মানিত লিখক- ও ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহঃ) উপরোক্ত কথা খন্ডন করে বলেন) আমি বলছি যে, ফিরিশতাদেরকে সজিদা করার নির্দেশ নসখ তথা রহিত হয়েছে এই হাদীস দ্বারা ইহা পরবর্তী কতক ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত। এটা কিন্তু মোফাচ্ছেরীনে কেরামদের মত নয়, উপরন্তু অগ্রবর্তী ফোকাহায়ে কেরামদের মতও নয়। তাফসীরে আহমদীর লিখক, সমস্ত নাসেখ ও মনসুখ আয়াতে কারীমা সমূহ তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতে কারীমা সমূহ ব্যতীত অন্য কোন আয়াতে কারীমা হানাফী মাযহাবের অন্য কোন কিতাবে নেই।

টীকার অনুবাদ :

কাউলিহি : তাফসীরে আহমদী

তাফসীরে আহমদীর গ্রন্থকার এবং মোহাক্কেক ধর্ম বিশারদগণ বলেন যে, সিজদায়ে তাহিয়াহ এর আয়াতে কারীমা মনসুখ তথা রহিত হয় নাই উপরন্তু 'আহকামের' আয়াত সমূহে নাসেখ মনসুখের বিধান প্রযোজ্য হয়, বিভিন্ন সংগঠিত ঘটনাবলী তথা আখবাবে আয়াতে নাসেখ মানসুখের বিধান প্রযোজ্য হয় না।

'আততৌজীর' এর মধ্যে আছে, জেনে রাখুন যে সমস্ত শরীয়তের হুকুম বা বিধান মূলতঃ রহিতকরণের সম্ভাবনা রাখে না, যেমন-'আহকামে আসলীয়া' এবং আল্লাহ তাঁলার 'মশীয়ত' বা ইচ্ছা। অনুরূপভাবে আহকামে হেসিসিয়া এবং অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংগঠিত ঘটনাবলীর উপর 'নাসেখ' বা মানসুখের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

কাউলে মুগনী-মমতাজুল মুহাদ্দেহীন মাওলানা ওবায়দুল আকবর (রাহ.) এম.এম।

আর তাফসীরে আহমদীর লিখক সজিদায়ে তাহিয়াহ আয়াতকে এই হাদীস দ্বারা রহিত

করেন নি, উপরন্তু এই আয়াতটিকে তিনি নাসখ বা মনসুখ কোনটিতে উল্লেখ করেন নি; বরং এই আয়াতে কারীমা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইহা 'আখবার' তথা পূর্ব ঘটনার অন্তর্ভুক্ত, আর আখবার আয়াত কারীমা সমূহকে নসখ এর অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ নয়।

ইমাম আহমদ (রাঃ) এবং ইমাম মালেক (রাঃ) এর মাযহাবেও উল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা এই আয়াতে কারীমা মনসুখ বলে জানা যায় না, ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর মাযহাবে আল্লাহর বাণীকে রাসূল (সাঃ) এর বাণী দ্বারা রহিত করণ বৈধ নয়। উল্লেখিত হাদীস শরীফটি খবরে আহাদের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে উল্লেখিত হাদীস শরীফটি মিশকাত শরীফের 'ফহলে ছালেহ্ তথা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর ফহলে ছালেহ্ তথা তৃতীয় অধ্যায়ের হাদীস সমূহ অনেক যয়ীফ বা দুর্বল; সুতরাং এই হাদীস দ্বারা কোরআনের আয়াত রহিত করণ জায়েজ হবে না।

যদিও ধরে নেওয়া যায় যে, হাদীসে আহাদ এর অর্থ পরবর্তী যুগে মাশহুর বা মোতাওয়াতের পর্যন্ত পৌছেছে এবং হাদীসে আহাদটি অধিক প্রচার ও বর্ণনার কারণে মোতাওয়াতের এর পর্যায়ে পৌছেছে, কিন্তু এ জাতীয় খবরে আহাদ কোন আমল জায়েজ হওয়ার পক্ষে মোতাওয়াতের এর হুকুম বিবেচিত হতে পারে কিন্তু এই জাতীয় খবরে আহাদ যা মোতাওয়াতের এর হুকুমে পরিণত হয়েছে, তা দ্বারা পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত কারীমাকে নসখ বা রহিতকরণ করা যাবে না, যেমন-তানকিহাতিচ ছুন্নিয়াহ কিতাবের লিখক ধারণা করেছেন, যে খবরে আহাদ যা মোতাওয়াতের পর্যন্ত পৌছেছে তা দ্বারা কোরআনের 'নহ' বা আয়াকতে রহিতকরণ করা যাবে।

আর যদি এ রূপ ধরে নেওয়া যায়, তথাপি এই খবরে আহাদ দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ নাজায়েজ হওয়া মানা যায় না কেননা আদম (আঃ) কে ফেরেশতাগণ যে সিজদা করেছেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ওলামায়ে কেরামগণ থেকে পরিলক্ষিত হয়। আর এই ধরনের মত ভিন্ন ব্যাপারে তো 'নসখ' তথা রহিত করণ হবে না, যা খুবই স্পষ্ট। তিনি কি লক্ষ্য করেন নি, যারা বলেন যে, এই সজিদা শুধু 'লগুবি' তথা শাব্দিকভাবে ছিল, যা 'খুদুহ' ও 'ইনকিয়াদ' অর্থাৎ বিনয় ও কায়মনোবাক্য ছিল, তাহলে এর উপর কিসের 'নসখ' পতিত হবে? নসখের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। আর যারা বলেছেন 'সজিদা' আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল, এবং আদম (আঃ) শুধু কেবলা ছিলেন। তাহলে এই মতের উপরও হাদীসে আহাদ দ্বারা 'নসখ' হচ্ছে না, কারণ এই মতে সজিদা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল। আর এটাতো 'নসখ' হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে না, উপরন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্যে সজিদা করার জন্য 'গাইরুদ্লাহ' কে কেবলা বানানো যায়, যেমন-বায়তুদ্বাহ শরীফকে কেবলা বানানো। শেষমেষ তিনি (তানকিহার লেখক) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে সজিদা করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন মানুষকে কেবলা নির্ণয় করেন, তখনই এই হাদীস দ্বারা তা রহিত হবে।

আমি বলছি যে, যদিও এইরূপ ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু এতে করে মূলভাবে 'কালামুদ্বাহ'র আয়াতে কারীম 'নসখ' হওয়ার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয় না কেননা সজিদা মূলতঃ কখনো 'নসখ' বা রহিত হবে না, কেননা সজিদা আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করা হয়।

আর যারা বলেন ফিরিশতাদের কৃত সজিদা মূলতঃ আদম (আঃ) এর জন্যই ছিল।

এটাই হক ও সত্য। তাদের কথায় বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীসে উল্লেখিত সজিদাটি সজিদায়ে তাহিয়াহ ছিল। কেননা তা তো নির্ধারিত যে, কারা সজিদায়ে তাহিয়াহ এর জন্য যোগ্য। ফিরিশতাদের সজিদার উদ্দেশ্য এই সজিদায়ে তাহিয়াহ। যদি হাদীসে উল্লেখিত সজিদা এই সজিদায়ে তাহিয়াহ ধরা না হয়, তাহলে নসখ এর দাবী বাতিল তথা মিথ্যা পরিগণিত হবে। আর যখন হাদীসের উল্লেখিত সজিদা সজিদায়ে তাহিয়াহ হিসাবে বিবেচিত হবে তখন হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহর নবী (দ.) বলেন, যদি আমি কাউকে সজিদায়ে তাহিয়াহ করার নির্দেশ দিতাম, তখন অবশ্যই আমি স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীকে সজিদা তাহিয়াহ করার জন্য; অথচ হাদীসে মহিলাদেরকে সজিদায়ে তাহিয়াহ করার কথা উল্লেখ করেনি। বরং স্বামীদের প্রতি স্ত্রীদের পূর্ণ আনুগত্য করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন অপর একটি হাদীসে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীস : ‘লাম্মা জায়ালাল্লাহ্ লাহম আলাইহিন্না মিন হক্কিন ওয়া লাউ আমরাহা আন তানকাল মিন জাবলে আবয়াদা ইলা জাবলে আসওয়াদা’ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা স্বামীদের প্রতি স্ত্রীদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি স্বামী স্ত্রীকে শ্বেত পাহাড় হতে কাল পাহাড়ে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ দেন তা করা স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। ‘লুময়াত’ গ্রন্থকার বলেন, নবী করিম (দ.) এর বাণী ‘লাউ আমরতুল মিরআতা’, এই হাদীস দ্বারা স্ত্রীদেরকে স্বামীকে পূর্ণ আনুগত্য করা অবশ্যস্বাভাবিক করা হয়েছে। আর কামালে মোবালেগা অত্যাধিক পূর্ণতা, এটা রূপক তথা ‘মাজাজ’ এর অর্থভূক্ত। আর ‘মাজাজ’ তথা রূপক দ্বারা কোরআনের ‘হাকিকুত’কে নসখ বা রহিত করা জায়েজ নয়। উপরন্তু হাদীস শরীফে অত্যাধিক পূর্ণ আনুগত্যতার বর্ণনার সজিদা দ্বারা যদি সজিদায়ে তাজিম যা এতায়াত বা আনুগত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদিকে যদি সজিদায়ে তাজিমকে তাহিয়াহ হিসেবে ধরে নেওয়া না যায়, অথচ সজিদায়ে তাহিয়াহ সালামের পর্যায়ভূক্ত, আর সালামে মূলতঃ এতায়াত তথা আনুগত্যের অর্থ পাওয়া যায় না। অথচ হাদীস শরীফে স্ত্রীদেরকে ‘এতায়াত’ করা স্বামীদের প্রতি উদ্দেশ্য করা হয়েছে; যদিও নবী করিম (সাঃ) এর বাণী, আমি যদি নিদেশ দিতাম স্ত্রীদেরকে সজিদা করার স্বামীদেরকে, এটা স্বামীদের হক বা প্রাপ্য স্ত্রীদের নিকট, যেমন হাদীসের মর্মার্থে ইহাই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, কিন্তু সজিদায়ে তাহিয়াহ ইহার বিপরীত, কেননা সজিদায়ে তাহিয়াহ মাশায়েখ বা পিতামাতা এবং অন্যান্যদের জন্য প্রযোজ্য এ হিসেবে নয়, যাদের আনুগত্য ওয়াজিব করা হয়েছে বরং এ হিসেবে যাদেরকে সচরাচর সম্মান করা যায়। উপরন্তু সজিদায়ে তাহিয়াহ তো প্রথম সাক্ষাতে হয়। যেমন তানকিহাতিহ্ ছুন্নিয়াহ কিতাবের লিখক বলেছেন তাহিয়াত যা প্রথম সাক্ষাতে প্রযোজ্য হয়। আর স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ বাসর রাতে বা মিলনে হয়। এরপরে সর্বদা সাক্ষাৎ হয়, যদিও স্বামী স্ত্রী কোন প্রয়োজনীয় কারণে পরস্পর থেকে পৃথক থাকে, তবুও সেটা উভয়ের মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্য তা নয়। তাহলে নবী করিম (সাঃ) এর বাণী আমি স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদের সজিদা করার জন্য, এটা শুধু আনুগত্য করার অবশ্যকতা বিদিত হয়েছে। আর আপনিও জানেন, নিঃসন্দেহে ‘এতায়াত’ বা আনুগত্যতা যা ইবাদত বা বন্দেগীর নিম্ন পর্যায়ের অর্থ প্রদান করে কিন্তু যখন এতায়াতকে সজিদা দ্বারা নির্ধারিত করা হয়েছে তখন ইহা অবশ্যই ইবাদতের অর্থই বহন করে। আর এই এতায়াত থেকে

উদ্দেশ্য সজিদা দ্বারা নৈকট্য লাভ করা, যার উদ্দেশ্যে এতায়াত তথা আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়। আর ইহাই ইবাদতের অর্থ যা বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করিম (দ) থেকে এ জাতীয় এতায়াতের সজিদা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। যদি এই ধরনের না হতো নবী করিম (দ.) সাহাবাদেরকে এই ভাবে বলতেন না ‘লাউ কুনতু আমারতু....’ কেননা নবী করিম (দ.) উত্তরে এতায়াতের সজিদা করার নির্দেশ দেননি, কারণ সাহাবাদের প্রশ্ন এতায়াতের সজিদার ব্যাপারে ছিল, যেমন হাদীস শরীফে ইহা স্পষ্ট।

হাদীস শরীফে সজিদায়ে তাহিয়্যাহ সম্পর্কে কোন নিষেধ নেই বরং ইতায়াতের সজিদার ব্যাপারে কোন নির্দেশ প্রদান করেননি। সুতরাং এই ইতায়াতের হাদীস দ্বারা কোরআনের আয়াতে কারীমা ‘নসখ’ বা রহিত করা জায়েজ হবে না, কেননা কোরআনের আয়াতে কারীমায় সজিদাটা নিতান্তই সজিদায়ে তাহিয়্যাহ যা আগে আলোচনা করা হয়েছে। আর যদি স্ত্রীদেরকে স্বামীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যতা করাটা রূপকভাবে ধরে নেওয়া যায় এবং বাস্তবে সজিদা কখনো সংগঠিত না হয়, তাহলে এই ধারণা থেকে তো কোরআনের আয়াতের ‘নসখ’ এর ব্যাপারে কোন প্রশ্ন দেখা যায় না। অতএব ভেবে দেখুন।

টীকার অনুবাদ : তফসীরে কালালী’তে উল্লেখ আছে যে, শরীয়তের উসুলের কায়দা অনুসারে ‘মিন কাবলেনা’ দলিল হিসাবে সাব্যস্ত, যা আমাদের শরীয়তে ‘নাসেখ’ হিসেবে স্পষ্ট নয়। উপরন্তু সজিদায়ে তাহিয়্যাহ হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর শরীয়তে ‘নসসে কোরআন’ ‘খররু লাহ সুজ্জাদা’ দ্বারা জায়েজ বুঝায়। সুতরাং আমাদের শরীয়তেও তা জায়েজ তথা বৈধ হিসেবে বিবেচিত। এই জায়েজ বিধানের ‘নাসেখ’ তথা রহিতকারী আমাদের শরীয়তে ‘খবরে ওয়াহেদ’ তথা ‘লাউকুনতু’ ভিন্ন অন্য দ্বারা হতে পারে, ‘খবরে ওয়াহেদ’ দ্বারা মোটেও নয়—এটা ছাড়াও এ ‘খবরে ওয়াহেদ’ সন্দেহজনক অস্থিরকৃত অর্থের সম্ভাবনা দেখা যায় যে, সজিদা কি তাহিয়্যাহ, না সিজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ‘খবরে ওয়াহেদ’ হুকুম ছিল। কেননা মানুষেরা ইসলাম গ্রহণের সময় কঠিন কুফরীর সন্নিগটে ছিল, উপরন্তু আব্বাহ ভিন্ন অন্যকে ইবাদত করা কুফরী হিসেবে বিবেচিত হয়, এহেন সময়ে ‘মোতলাক’ বিধান প্রয়োগ করা বারণ করা হয়েছে। যেমন কোন অবস্থায় শেষ মুহর্তে বা কোন কঠিন কষ্টে নিপতিত হওয়া থেকে নিষেধ করা। এরূপ জাহাঁগীরিয়ায় আছে।

কাউলে মুগনী—মমতাজুল মোহাদ্দেসীন মাওলানা ওবাইদুল আকবর (রাহ) এম.এম।

টীকা : ঐ ‘এরাদা’ তথা ইচ্ছা এটা ঐ উক্তির জাওয়াব যেমন— এতায়াতে সজিদা তথা আনুগত্যতার সজিদা দ্বারা পূর্ণ বন্দেগী বুঝায়, কেননা ‘ইতায়াতে সিজদা’ ইবাদতের সিজদা এর অর্থ বহন করে। এর উত্তরে বলা হয়, ইহাতে ‘সজিদায়ে তাহিয়্যার’ ব্যাপারে ক্ষতির কোন আশংকা নাই, কেননা ‘ইতায়াতে’ সিজদা দ্বারা পরিপূর্ণ ও আধিক্য বুঝায়। পতিত হয়ে সজিদা করণের ব্যাপারে ইতায়াতে সিজদা দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়্যাহ জায়েজ বুঝায়, বারণ বা জায়েজ নয় এমন বুঝায় না।

কাউলে মুগনী—মমতাজুল মহাদ্দেহীন মাওলানা ওবায়দুল আকবর, এম.এম।

রাসূলে করিম (দঃ) পবিত্র হাদীসের মধ্যে সজিদার আলোচনার তাৎপর্য ও অর্জিত বিষয় হল ‘লাউ কুনতু আহাদান.....’ হাদীসে যা ইঙ্গিত বহন করে তা সজিদায়ে তাহিয়্যাহ।

আর নবী করিম (দঃ) এর বাণী ‘আকরেমু আখাকুম’ তোমরা তোমাদের ভাইদের

সম্মান কর, দ্বারা 'লাউ কুনতু আহাদান, হাদীসেও একই কথা বুঝা যায়। যা আমি পূর্বে যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। যদি স্ত্রীদের সজিদা করার নির্দেশ স্বামীদের এতায়াত তথা আনুগত্য হিসেবে ধরা যায় মাজাজ তথা রূপক অর্থে এটাই যথার্থ। সুতরাং এতায়াত বা আনুগত্যতা সাজিদায়ে তাহিয়াহ ভিন্ন অন্যভাবেও করা যায়। সুতরাং এই অর্থ দ্বারাও কোরআনের আয়াত রহিত করণ বৈধ হবে না। অন্য দিকে নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র হাদীসের মর্মার্থ এই যে, নবী করিম (দঃ) ইহার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন নি, কিন্তু যা মূলতঃ মোবাহ তথা জায়েজ, নির্দেশ প্রদান না করায় এটা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায় না, কেননা নির্দেশ প্রদান থেকে বিরত থাকা উত্তম। এতে করে, ইহা দ্বারা নাসেখ তথা রহিতকারী বলা যথায়ত নয়, কেননা ইহা ওয়াজিব হওয়ার উপকারিতা বুঝায় না এবং হারাম হওয়াও বুঝায় না। 'নাসেখ' এর জন্য অবশ্যক যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ বহন করে যেমন : 'আমর' বা নির্দেশ অথবা হারাম প্রমাণিত হওয়া যেমন-নেহী তথা নিষেধ দ্বারা অর্জিত হয়, যা অচিরেই আলোচনা করা হবে। যখন 'আমর' দ্বারা আদিষ্ট বিষয় থেকে বিরত থাকা যা হুকুমের ওয়াজিব বা আবশ্যিকতাকে বারণ করে, ইহা দ্বারা 'মনদুব' বা মোবাহ এর বিধান নিষেধ হওয়া আবশ্যক হয় না। এর দ্বারা জানা গেল 'মনদুব' এবাহাত তথা মোবাহ এর হুকুম উল্লেখিত হাদীস শরীফে রয়েছে। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা পরিস্কার ভাবে বুঝা যা না। উল্লেখিত হাদীস পরীক্ষা ও অন্যান্য হাদীস শরীফে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা এ উদ্দেশ্য যে ফিরিশতাদের সজিদা করার নির্দেশ 'নসখ' বা রহিতকরণের জন্য, আর এর 'নসখ' বা রহিতকরণ শুধুমাত্র ওয়াজিব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেমন ফিরিশতাদের জন্য সজিদায়ে তাহিয়াহ করা ওয়াজিব ছিল অথবা সজিদায়ে তাহিয়াহ এর মোস্তাহাব বিধানকে রহিতকরণ বুঝায়, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহে সজিদায় তাহিয়াহ এর মোস্তাহাব ছিল অথবা শুধুমাত্র সজিদায়ে তাহিয়াহ এর জায়েজের বিধান যা ওয়াজিবের বা 'নুদুবের' অভ্যন্তরে নিহিতকে রহিত করণ বুঝায়।

প্রথম সিদ্ধান্ত : ওয়াজিব রহিতকরণ :- অর্থের দিক দিয়ে ইহা 'নসখ' বা রহিত হবে না কেননা সজিদায়ে তাহিয়াহ এর ওয়াজিব হওয়ার বিধান অবশ্যই রহিত হয়েছে তখন, যখন ফিরিশতাগণ হযরত আদম (আঃ) কে একবার সজিদা করেছিলেন, কেননা 'আমরে মোতলাক' বা সাধারণ নির্দেশ 'তাকরার' বা বার বার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং ওয়াজিব রহিত করণ সিদ্ধান্ত বলার আর প্রয়োজন পড়ে না। অতএব উল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ এর ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত করণ বুঝায়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত : হাদীস শরীফ দ্বারা মোস্তাহাব বা জায়েজ হওয়াকে রহিতকরণ বুঝায়। যদি উল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা এ রহিতকরণকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়, এতে করেও জায়েজ বা মূল বৈধতা রহিতকরণ আবশ্যক হয় না। আর এটাই পছন্দনীয় সিদ্ধান্ত, কেননা অধিকাংশ আলেমের মতে 'মনদুব' রহিতকরণ দ্বারা বৈধতাকে রহিতকরণ আবশ্যক করে না, যা আগে আলোচনা করা হয়েছে।

ফিরিশতাগণ আদম (আঃ) কে আল্লাহর নির্দেশ 'ওয়াজিব' বিধান হিসেবে সজিদায়ে তাহিয়াহ আদায় করার পর ওয়াজিব রহিত হল, কিন্তু 'মনদুব' হিসেবে আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহে প্রচলিত ছিল। এটা জানা কথা যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ জায়েজ কেননা জায়েজ ইহা 'নুদুবের' অভ্যন্তরে নিহিত এবং এটাই জায়েজ হওয়ার

আসল কথা। যদি হাদিসে শরীফের দ্বারা এই জায়েজ হওয়াকে রহিতকরণ বুঝানো হয় এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, নিশ্চয়ই ‘জওয়াজে আসলি’ তথা মৌলিক বৈধতা ইহা প্রত্যেক বস্তুর আসল মোবাহ। আর ইহা বস্তুর গুণের আবশ্যিকতা, উপরন্তু ইহা বস্তুর মাহিয়ত তথা মৌলিক বিষয়। সুতরাং প্রয়োজনের কারণে বস্তুর গুণ ও মৌলিকত্বকে বিচ্ছিন্ন করা বৈধ নয়, তখন বস্তুর হাকিকত পরিবর্তন হওয়া অবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এ রকম ভাবা জায়েজ নয়। মোবাহ বিষয়াদি জায়েজ তথা বৈধতার ‘নসখ’ তথা রহিতকরণের জন্য আবশ্যক হল ‘আরজে মোহরেম’ তথা হারাম সাব্যস্ত কারী কারণ যা হারামের দিকে ইঙ্গিত করে। এ জাতীয় হারাম সাব্যস্তকারী কারণের জন্য ‘নসখ’ এর বিধান প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু বস্তুর হাকিকত সম্পর্কে ‘নসখ’ এর সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না। এমনকি বস্তুর আবশ্যিক কোন গুণের বেলায়ও নয়। প্রথমতঃ বস্তু সত্ত্বাগত দিক দিয়ে হারাম হয়, দ্বিতীয়তঃ কোন মোলহেক বা অন্য কিছু সংমিশ্রণে অন্য সিদ্ধান্ত হয়, যেমন-ইহা উসুলের কিতাবে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মোবাহ মূলত জায়েজ হিসেবে শরীয়তে প্রবর্তিত আছে। কেননা ‘এবাহাতে আসলিয়া’ শরীয়তের একটি প্রকার আর ইহা ‘আমর’ তথা নির্দেশের দ্বারা বিলম্বে হলেও আদায় করা ছাবেত আছে। সুতরাং ইহা সত্ত্বাগত দিক দিয়ে হারাম হতে পারে না। এমনকি অন্য কোন বস্তুর মোলহেক তথা সংমিশ্রণে ও নয়, কেননা এতে করে বস্তুর হাকিকত পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যদিও বস্তুর গুণকে পরিবর্তন করা হয়।

উপরন্তু এ জাতীয় ‘মোবাহ’ এর বিধান কোন ‘নাসেখ’ দ্বারা রহিত করা হয়, তখন এ জাতীয় ‘নাসেখ’ বাহ্যিক সংশ্লিষ্ট ‘নাসেখ’ হওয়া ওয়াজিব। পূর্বে এ ব্যাপারে যথার্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ মৌলিকভাবে ‘মোবাহ’। যদি উল্লেখিত হাদীস শরীফের দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ ‘রহিত’ হওয়ার সিদ্ধান্ত মানা যায় তখন অবশ্যই এ ‘নসখ’ আরজে মোজাবের তথা বাহ্যিক সংশ্লিষ্ট কোন কারণ আবশ্যক হবে। অতপর এই বিষয়েও অবগত হওয়া উচিত ‘নাসেখ’ তথা ‘রহিতকারী’ সেটা কি ‘আমর’ নির্দেশ, না ‘নেহী’ নিষেধ। যদি ‘নাসেখ’ ‘আমর’ এর জন্য হয়, তখন তা অবশ্যই ওয়াজিবের জন্যই হবে, কেননা ‘নসখ’ ওয়াজিব ভিন্ন অন্য বিধানের উপকারিতা প্রদান করে না, আর যদি ‘নাসেখ’ কোন ‘নেহী’ বা নিষেধ এর জন্য আবর্তিত হয়, তখন অবশ্য তা হারামের জন্য প্রযোজ্য হবে, কেননা হারাম ভিন্ন অন্য বিষয়ে ‘নাসেখ’ আবর্তিত হয় না।

উসুলের কিতাবে পরিলক্ষিত যে, যদি ‘আমরে নাসেখ’ কোন জায়েজের জন্য প্রয়োগ হয়, উপরন্তু জায়েজ ইহা ‘আমর’ দ্বারা ওয়াজিব বিষয়ের মধ্যে নিহিত থাকে। যখন ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়, তখন জায়েজ আর অবশিষ্ট থাকে না বরং যখন ঐ আমর দ্বারা মূল বিষয় রহিত হয়ে যায়, তখন শুধু ‘নসখ’ এর প্রয়োগ হতে পারে। এটা আমাদের হানাফীদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এ ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তখন ‘নাসেখ’ সমস্ত ভিন্নমুখী হারাম বিষয় সমূহকে অর্ন্তভুক্ত করবে, যেমন কা’বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা। ইহার দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া রহিত হয়েছে, এমনকি উপকারিতা সত্ত্বেও অন্য যে কোন ঘরের দিকেও। উপরন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরানো জায়েজ যা আমরের ওয়াজিবের বিধানের অভ্যন্তরে নিহিত আছে। সুতরাং ওয়াজিবের ‘নসখ’ দ্বারা জায়েজও রহিত

হয়েছে। যদি ওয়াজিবের অভ্যন্তরে জায়েজ না থাকে বরং তা মূলতঃ জায়েজ হিসেবে বিবেচিত, তখন জায়েজের বিধান অবশিষ্ট থাকে, যদি ওয়াজিবের বিধান 'নসখ' তথা রহিত হয়ে যায়। আর এ সিদ্ধান্তে ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) এর ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে যা 'আল মোসাল্লাম' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যখন ওয়াজিবের বিধান রহিত হবে, তখন মূলতঃ জায়েজও রহিত হবে। সুতরাং তাঁর মতে জায়েজের জন্য নতুন 'নছ' বা আয়াতের প্রয়োজন হবে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর মতে নতুন 'নছ' এর প্রয়োজন হবে না। কেননা ইবাহাতে আসলিয়া, যা 'নস' এর স্থলাভিষিক্ত যেমন : উসুলের কিতাবে উল্লেখ আছে। মোসাল্লাম কিতাবে উল্লেখ আছে যে, (উচ্চারণ) (ইয়ার কাল জাওয়াজ ইজা নাসাখাল ওজুব) অর্থাৎ ওয়াজিব রহিত হওয়ার পরও জায়েজ অবশিষ্ট থাকে যদিও ওয়াজিব বিধান রহিত হয়ে যায়। এ কথার মমার্থ এই যে, যদি জায়েজটা জায়েজে আসলি হয় তা রহিত না হয়ে অবশিষ্ট থাকে যদিও ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়। এভাবে নয় যেমন তিনি অনুধাবন করেছেন। এটা ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর মযহাবে বিদ্যমান।

নুরুল আনোয়ার নামক উসুলের কিতাবের টীকায় বলা হয়েছে (জায়েজ অধ্যায়) (উচ্চারণ) 'ফাইন্না বুতলানুল মোতজাম্মান অর্থাৎ নিশ্চয়ই অর্ন্তভুক্ত বিষয় বাতিল-একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন কিছুর অভ্যন্তরে যা অর্ন্তভুক্ত থাকে, মূল বিষয় বাতিল হওয়ার সাথে সাথে অর্ন্তভুক্ত জিনিস ও বাতিল হবে। তবে জায়েজের বিধান যদি অন্য দলিল বা মূলতঃ মোবাহ হিসেবে ছাবেত হয়, এ জাতীয় অর্ন্তভুক্তি বাতিল সাব্যস্ত হবে না। নিঃসন্দেহে 'আমর' বা নির্দেশ জায়েজের উপকারিতা প্রদান করে, যার 'আমর' দ্বারা অর্জিত ওয়াজিবের অভ্যন্তরে নিহিত, কিন্তু এ জাতীয় জায়েজ বিধান যা মান্দুব কিংবা মোবাহ এর অভ্যন্তরে থাকে তা বাতিল হবে না। যখন ওয়াজিব হুকুম 'নসখ' তথা রহিত হবে, তখন এই ওয়াজিবের মধ্যকার জায়েজ বিধায় সেটা কি 'ইবাহাতে আসলিয়া' তথা মূলতঃ মোবাহ, না মনদুবের অভ্যন্তরের জায়েজ বিধায় তখন এই ধরনের জায়েজের বিধানের অন্য হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থাতেই 'নাসেখ' তথা রহিতকারীর 'নসখ' শুধুমাত্র মূলতঃ মোবাহ এর বিপরীত হারাম করার জন্য এই নাসেখের বিধান প্রযোজ্য হবে না, যেমন- রমজানের রোজা যা আইয়ামুল আব্বিজ তথা চাঁদের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখের আবশ্যিক রোজা রাখাকে রহিত করে কিন্তু এই রোজার জায়েজের বিধানকে রহিত করে না, কেননা রোজা রাখা মূলতঃ মোবাহ বা বৈধ। এই মৌলিক মোবাহকে 'নসখ' করা যায় না। যদি মৌলিক মোবাহ বিধানকে রহিতকরণ জায়েজ হত, তখন প্রত্যেক বিধানের হাকিকত পরিবর্তন হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ত। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত শরীয়তে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে যদি 'নাসেখ' তথা রহিতকারী 'নেহী' তথা নিষেধ জ্ঞাপক নির্দেশ হয়, যা বিধান হারাম হওয়াকে বুঝায়, তখন ঐ বিধানের জায়েজের হুকুম ও 'নসখ' তথা রহিত হবে। এই জাতীয় বিষয়ের জায়েজ হুকুমের জন্য 'নসখ' না হলেও (তা রহিত হিসেবে বিবেচিত হবে)। যা আমি আমর দ্বারা 'মানসুখ' তথা রহিতকরণের জায়েজ আলোচনা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। নিশ্চয়ই জায়েজ হুকুম 'মানসুখ' তাদের কথায় যদি সে জায়েজের হুকুম আসলিও হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর আসল মোবাহ এই উসুলের উক্তি ভিত্তিতে। আমরের ওয়াজিব হুকুম যখন 'নসখ' হবে, তখন কিন্তু

জায়েজের হুকুম নসখ হবে না, বরং ঐ জায়েজ হুকুমকে রহিত করার জন্য তথা সংশ্লিষ্ট হারাম কারণ থাকতে হবে। যেমন-সজিদায়ে তাহিয়াহ এর ব্যাপারে (সংশ্লিষ্ট হারাম কারণ পাওয়া গেলে) তাও জায়েজ হবে না।

টীকার অনুবাদ: ক্বালা.....।

বর্তমানে কোন কোন আলেম বলেন যে, হযরত নবী করিম (সা:) এর পবিত্র হাদীস শরীফে তোমাদের ভাইদের সম্মান কর এর উদ্দেশ্যে নবী করিম (সা:) এর পবিত্র জাতে পাক উদ্দেশ্য। উপরন্তু ‘একরাম’ দ্বারা ওয়াজিব বিধান বুঝায়। কেননা নবী করিম (দঃ) কে সম্মান করা ওয়াজিব। উপরন্তু ‘একরাম’ দ্বারা সিজদা ভিন্ন অন্য কোন ভাবে সম্মান করা বুঝায়-ইহা ‘মিরকাত’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর সিজদা দ্বারা এবং তোমাদের ভাইদের সম্মান কর-অন্তরের ভালবাসা দ্বারা। অন্যদিকে ‘ইতায়াত’ সিজদা করণ ছাড়া অন্যভাবে হতে পারে। কারণ তথা এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, একরাম দ্বারা উদ্দেশ্য-সজিদা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সম্মান করা, কেননা হাদীস শরীফে তা পরিলক্ষিত হয় যে, জৈনিক সাহাবী নবী করিম (দ.) কে সজিদা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী করিম (দঃ) বারণ করেন এবং কেউ নবী করিম (দ.) কে সজিদা করেন নাই। উপরন্তু হাদীসের অর্থ সিজদা দ্বারা ‘ইকরাম’ হওয়া বুঝায় না। সুতরাং সিজদা দ্বারা ইকরাম করা হারাম। কেননা ওয়াজিবের বিপরীতে হারাম আর ইহা ‘মিরকাতের’ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এ কারণে তিনি সিজদা ভিন্ন অন্যভাবে ‘ইকরাম’ করাকে বুঝিয়েছেন।

এর উত্তরে আমি (মমতাজুল মুহাদ্দেহীন মাওলানা ওবায়দুল আকবর) বলছি যে, হযরত নবী করিম (দ.) এর সম্মান করা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা ওয়াজিব হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং হাদীস শরীফের ‘আমর’ কে এই অর্থে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না, বরঞ্চ ‘আকরিমু আখাকুম’ এর উল্লেখ নবী করিম (দ.) উদ্দেশ্য করা বারণ বুঝায় যদি এই উদ্দেশ্য মানা হয় যে, আখাকুম দ্বারা নবী করিম (দ.) এর জাতে পাক বুঝাচ্ছে কিন্তু এই বিশেষ খাস সত্তার উদ্দেশ্যে দ্বারা ‘আম’ ভাবে অন্যদের যথার্থভাবে বুঝানো পাক বুঝানো নিষেধ করে না। যখন ‘আম’ এর অর্থ অবশিষ্ট থাকবে তখন আবশ্যিক তথা সাধারণ ভাইদের ‘একরাম’ করা ওয়াজিব হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি কি দেখেন নাই যে, ‘আখাকুম’ দ্বারা নবী করিম (সাঃ) এর পবিত্র জাতে পাক উদ্দেশ্য-আর ইহা আমের গভীভুক্ত, কিন্তু ‘খাস’ হিসেবে উদ্দেশ্যকৃত। প্রকাশ থাকে যে, ‘খাস’ যা আমের অন্তর্ভুক্ত হয় যখন তা বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এতে করে ‘আকরিমু আখাকুম’ ‘আমর’ যা ওয়াজিবের জন্য অবশ্যই তা সাধারণ ভাইদের বেলায় ওয়াজিব হবে অবশ্যই এবং সম্মান করা ওয়াজিব বলে পরিগণিত করা জায়েজ হবে না। এতে করে স্পষ্ট হয়ে গেল। ‘আমর’ মানদুব তথা জায়েজ বিধানের জন্য প্রযোজ্য হবে। সেটা প্রত্যেকটি বাধা বিপত্তির মাঝেও জায়েজের কথায় স্থিরকৃত।

জেনে রাখুন ‘আকরেমু’ দ্বারা সিজদা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সম্মান করা ‘কইদ’ লাগানো যা ‘মিরকাত’ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, সিজদা ভিন্ন অন্যভাবে সম্মান করা মোস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত এই হিসেবে নয় যে, সিজদা দ্বারা সম্মান করলে তা হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং সিজদা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সালাম করা যখন মোস্তাহাব বলে বিবেচিত ছিল, সিজদা দ্বারা ‘ইকরাম’ করা ‘মাকরুহ’ হবে না। কেননা

মোস্তাহাব বা মানদুব বিধানের বিপরীত জায়েজ দেখায় 'মাকরুহ' ছাড়া অধিকাংশের অভিমতে।

আকরিমু এর 'আমর' ওয়াজিব বিধানের জন্য-কেননা নবী করিম (দঃ) এর সম্মান করা ওয়াজিব যে কোন ভাবে হউক। হাদীসের অর্থে সিজদা বা অন্য কোন উপায় 'একরাম' তা অনির্ধারিত। কেননা 'আমর' নির্ধারিত কার্য বাস্তবায়িত হওয়া চায়, যেমন প্রহার কর এটা সম্বোধক থেকে ইজরিব 'মারার' কর্মটি তলব করেছে সুতরাং সম্মান করা ওয়াজিব হিসেবে বিবেচিত হবে 'আকরিমু আখাকুম' আমর দ্বারা এই মতের ভিত্তিতে তখন হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে সাধারণত ভাইদের সম্মান করা ওয়াজিব হবে। এতে করে তানকিহাতিচ ছুন্নিয়া কিতাবের লিখকের ভ্রান্ত মতবাদ স্পষ্ট হয়ে গেল। অনুরূপভাবে সিজদা ভিন্ন অন্যভাবে 'একরাম' করাও নির্দিষ্ট নয় 'একরামের আমর' যে কোন প্রকারের কার্য দ্বারা সম্পাদনকে বুঝায়। সুতরাং যে কোন একটি পর্যায় ওয়াজিব বলা জায়েজ হবে না। এতে করে সিজদা ভিন্ন অন্য উপায়ে 'একরাম' করা ওয়াজিবের বিপরীতেও হবে না। যেমন-এই মতের প্রবক্তা ইহার ধারণা করেছেন। আর সিজদা দ্বারা 'ইকরাম' করা হারামও হবে না।

যদি ধরে নেওয়া যায়-হাদীসের ভাবার্থ ইঙ্গিত করে যে, সাহাবা (রাঃ) সিজদা করাকে নিষেধ করায় বুঝায়। আর ইহা কিন্তু হারামের কারণে নয় উহাও বুঝাচ্ছে। নিশ্চয়ই 'কারিনা' তথা ইঙ্গিত দ্বারা যা সাধিত হচ্ছে এর দ্বারা তার বিপরীত অর্থেরও সম্ভাবনা থেকে যায়। আর ইহা হারাম সাব্যস্ত করাও নিষিদ্ধ। আর সাহাবাকে সিজদা করা থেকে বারণ করা বিশেষ 'মোসলেহাত' তথা বিশেষ কোন সামাজিক কৌশলের কারণে। আর এ বারণ করা দ্বারা 'ইকরাম' সিজদা দ্বারা করা হারাম বুঝায় না।

টীকার অনুবাদঃ কাওলিহি.....।

অনুরূপভাবে হাদীসের ভাবার্থ ইহা স্পষ্ট করে যে, হাদীসের সিজদা করা দ্বারা সিজদায়ে তাহিয়্যাহ কে বুঝাবে এতাত্যতের তথা আনুগত্যের সিজদাকে বুঝাবে না, কেননা সিজদায়ে এতাত্যত মূলতঃ মোবাহ নয়।

কাওলে মুগনি-মাওলানা ওয়ায়দুল আকবর (রাহ) এম.এ।

টীকার অনুবাদঃ কাওলিহি ইনকেলাবুল হাকায়েক।

'ইনকেলাবুল হাকায়েক' তথা হাকিতের পরিবর্তন দ্বারা হাকিকতের আসলিয়া যা শরয়ী হিসেবে বিবেচিত হাকিকতে আনছারিয়া তথা বাহ্যিক বিধান বুঝায় এমন বিষয় নয়।

টীকার অনুবাদঃ কাওলিহি.....।

'ওয়াজিব' বিধান দ্বারা 'আমর' তথা নির্দেশ খবর বা কোন ঘটনা বুঝানোর উপকারীতা প্রদান করে। যেমন কোরানের আয়াত 'তোমাদের উপর সিয়াম তথা রোজা পালন করা আবশ্যিক করেছেন। এই আয়াত দ্বারা 'নসখ' করা জায়েজ হবে। সেটা অনুরূপভাবে হারাম বিধানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। ওয়াজিব ভিন্ন অন্য বিধানের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। আর যে সমস্ত হারাম নয়, সেই গুলিকে হারাম নয় বলে বিবেচিত হবে।

ফেনী মোনাজেরায় তানকিহা কিতাবের সংকলক তাফসীরে 'মোদারেক' ও হামাদিয়া এর উদ্ধৃতি দিয়ে যা উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা যে বাতিল সে পরিসরের কথা বলছে যে, সিজদায়ে তাহিয়্যাহ পূর্বের শরীয়তে জায়েজ ছিল যা বর্তমানে 'নসখ' তথা রহিত

হল। এই উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত সালমান (রাঃ) যখন সজিদা করতে চেয়েছিলেন তিনি (দ.) বলেছিলেন-কোন সৃষ্টিকে সজিদা করা উচিত হবে না। এই কথা উদ্ধৃতি দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ হারাম হওয়া বুঝায় না, বরং জায়েজ না হওয়া বুঝাতে পারে, অন্যদিকে বিশেষ করে ইহা দ্বারা সজিদায়ে তাহিয়াহ হারাম বা জায়েজ না হওয়া 'মোতলাক' হিসেবেও প্রযোজ্য হয় না। কেননা 'কুলী' বিদুরিত হলে 'জুযয়ী' বিদ্যমান থেকে যায়।
কাওলে মুগনি -মাওলানা ওবায়দুল আকবর, এম. এম.।

টীকার অনুবাদ : ফাইযা নসখ।

ওয়াজিব বিধানে স্বগিত দ্বারা ওয়াজিবের অভ্যন্তরের থাকা অন্য বিধান বাতিল বুঝায় না বরং ওয়াজিব পুরোপুরি 'নসখ' দ্বারা অন্য কোন বিধানও 'নসখ' হতে পারে, যদি ইহা ধরে নেয়া যায়, তথাপিও বলতে হয় সজিদায়ে তাহিয়াহ যা আসলি সজিদা নয় বরং সজিদা আসলী এর অর্ন্তভুক্তি পর্যায়ে, 'যমনী' সজিদা হওয়ার কারণে এর উপর সজিদায়ে আসলিয়া এর হুকুম প্রযোজ্য হবে না। আগেকার শরীয়তে ওয়াজিব বিধান রহিত হওয়ার পর সজিদায়ে তাহিয়াহ প্রচলন দেখা যায়। সুতরাং সজিদায়ে তাহিয়াহ করা ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং জায়েজ হিসেবে বিদ্যমান রহিল। সুতরাং হাদীস দ্বারা 'জায়েজ' হওয়ার বিধান রহিত হল ইহা বলা বিস্তৃত হবে না, কেননা এই জাতীয় 'নসখ' শরীয়তে অর্ন্তভুক্ত নয়, আর যা শরীয়তের বিধানের অর্ন্তভুক্ত নয়, তা দ্বারা 'নসখ' করা প্রচলন ও নেই।

কাউলে মুগনী -মাওলানা ওবায়দুল আকবর, এম.এম।

যখন আমরা বলব, সজিদায়ে তাহিয়াহ এর ওয়াজিব হওয়া 'নাসেখ' তথা রহিতকারী দ্বারা রহিত হয়েছে এবং মূলভাবে এটা জায়েজ হওয়ার পক্ষে হুকুম নেই এবং শরয়ীভাবে অর্থের দিক দিয়ে এটার জায়েজ হওয়ার হুকুম বিদ্যমান, কেননা ওয়াজিব হুকুমের অভ্যন্তরে জায়েজ বিদ্যমান থাকে। যদি প্রয়োজনের জন্য জায়েজ হুকুম প্রচলিত থাকে, প্রয়োজন না থাকলে জায়েজ অবশিষ্ট থাকে না, বরং তখন তা মৌলিকভাবে হারামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। প্রয়োজন না থাকলে এর বৈধতা রহিত হয়। আর সজিদায়ে তাহিয়াহ হারাম সাব্যস্ত হওয়ার 'নসখ' শুধুমাত্র বর্ণনার জন্য যেমন বোনকে বিবাহ করা, যা আদম (আঃ) এর শরীয়তে বিদ্যমান ছিল। যদি জাওয়াজ হুকুমী বিধান হয় তখন তা কঠিন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেমন পাপযুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা। এ বিধান হালকাভাবে আদায় করার 'রোখছত' আছে সুতরাং এর জায়েজ হওয়া রহিত হল, জায়েজ বাকী রইল না, কেননা তা মূলতঃ হারাম পর্যায়ের। এ কথার ভিত্তিতে (মানুষের) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা হারাম। অথচ হযরত মুসা (আঃ) এর শরীয়তে তা কঠোরভাবে পালন করা ওয়াজিব ছিল। যখন কঠিনত্ব দূরীভূত হল-আমাদের জন্য সহজ পছাটা আসল এবং এ কঠিন বিধান হারামে প্রত্যাবর্তিত হল। সুতরাং এখানে বৈধতা বা জায়েজ আসলী নয়। বরং তা 'আমর' নির্দেশের দ্বারা ওয়াজিবের মধ্যে शामिल ছিল। যে বিধান খুবই কঠিন ছিল, যখন কঠিনত্ব দূর হল, তখন সে বিধানের বৈধতা তথা জায়েজও রহিত হল এবং (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) কাটা হারাম হওয়ার 'নস' তার জন্য বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত, অনুরূপ শনিবারকে সম্মান করার বৈধতা ও রহিত হল এবং এ জাতীয় সম্মানের জায়েজ হওয়া আসলী ছিল না, এ কারণে ইসলাম ধর্মে মৌলিকভাবে ইহা রহিত হল। এ সমস্ত আলোচনা 'তানকিহাতিছ ছুন্নিয়া' কিতাবে এর লিখক দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন জায়েজের মূল রহিত করণের উদ্দেশ্যে। যখন ওয়াজিব হুকুম রহিত হয়,

করা উত্তম। আর এ সিদ্ধান্ত দ্বারা 'আজীমত' বিধান প্রতীয়মান হয়, মূলতঃ আল্লাহ ভিন্ন সৃষ্টিকে 'ইবাদতের সিজদা' করা মৌলিকভাবে হারাম। এদিক দিয়ে 'আজীমত' অব্যাহতই আপনি অবগত হলেন যা আমরা উল্লেখ করলাম। উপরে যেসব বিষয়ে জায়েজ অবশিষ্ট না থাকা এটা 'ওয়াজিব' 'নসখ' হওয়ার কারণে নয়-বরং এই জায়েজ মৌলিকভাবে ছিল না, সুতরাং তানাকিহাতিচ ছুন্নিয়া কিতাবের লিখকের সমস্ত দাবী ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হল।

এই অধ্যায়ের আলোচনার সারবস্ত্ত হল, জায়েজ বিধান যদি ওয়াজিবের অভ্যন্তরে বিদ্যমান পাওয়া না যায় (শরীয়তের দিক দিয়ে বরং 'আমর' তা আসলী হওয়া, 'নাসেখ' রহিতকারী সেটা ওয়াজিবের জন্য হউক যেমন 'আমর' অথবা তা 'নাসেখ' হারাম সাব্যস্ত করার জন্য হউক যেমন 'নেহী' নিষেধাজ্ঞাপক) ওয়াজিব রহিত হয়, কিন্তু জায়েজ অবশিষ্ট থেকে যায়, এটাতে 'ইবাহাতে আসলিয়া' মৌলিক বৈধতা বিদ্যমান 'নস' থাকা দ্বারা। জায়েজ অবশিষ্ট থাকার প্রকৃতি হচ্ছে, প্রত্যেক হাকীকত উহাই আলস, যেমন 'উযুবে আসলী' এবং 'হরমতে আসলী' এবং এবাহাতে আসলী। কোন বস্ত্তর আসল প্রকৃতিকে রহিতকরণ জায়েজ হবে না যেই প্রকৃতি ঐ বস্ত্তর হাকিকতের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন ইনসানিয়াত তথা মনুষ্যত্ব প্রত্যেক মানবের নিকট বিদ্যমান, যদি বস্ত্তর প্রকৃতিকে রহিতকরণ জায়েজ হত তখন হাকিকতের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ত, যদিও তা গুণাবলীর ব্যাপারেও হয়। 'লাজেম' তথা আবশ্যক কারী যখন অসত্য বলে প্রতীয়মান হবে, তখন 'মালজুম' তথা আবশ্যককৃত বিধান ও অসত্য বলে পরিগণিত হবে।

পরন্তু যখন বস্ত্তর প্রকৃতি বা গুণাবলীকে যখন রহিত করণ জায়েজ হচ্ছে না। সুতরাং এটা জায়েজ বুঝানোর জন্যও নতুন কোন 'নস' এর প্রয়োজন পড়ে না, বরং ইবাহাতে আসলী' তথা মৌলিক বৈধতাই এটা জায়েজের জন্য 'নস' হিসেবে বিবেচিত, আর এটাই 'আল মোসলিম' গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, যেমন তিনি বলেন যখন ওয়াজিবের হুকুম 'নসখ হল, তখন জায়েজের বিধান অবশিষ্ট রহিল, সেটা জায়েজ থেকে গত বা অতিবাহিত নয়। কারণ 'আমর' দ্বারা ওয়াজিবের অভ্যন্তরে জায়েজের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। কেননা এই জায়েজ 'জায়েজে জমনী' তথা অন্তর্নিহিত বৈধতা, 'ওয়াজিব' বিধান ভিন্ন এ জায়েজের অস্তিত্ব থাকে না। আর এর দ্বারা কোন প্রকার তাওয়ারোজ বা দ্বন্দ্বও থাকে না 'জাওয়াজে জমনি' উদ্দেশ্য। 'জাওয়াজে আসলী' তথা মৌলিক বৈধতা অবশিষ্ট থাকে যখন ওয়াজিবের হুকুম রহিত হয়। অন্যদিকে হানাফী মাযহাবে যে মতামতটি বর্ণিত আছে, ওয়াজিব হুকুম রহিত হলে, তার জায়েজ বিধান আর থাকে না, আর এ হুকুম খাস করে ঐ জায়েজের অন্য যে জায়েজ 'আমর' দ্বারা ওয়াজিব বিধানের অভ্যন্তরে থাকে। চিন্তা করুন এবং আমি যা বর্ণনা করেছি যে, 'হাকিকতে আসলী' তথা বিধানের প্রকৃতি যাকে পরিবর্তন করা 'হাকিকতে আসলী' থেকে এটা জায়েজ হবে না এবং 'হাকিকতে আসলী' 'নসখ' করাও যাবে না।

আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেউ তার মুখের ভাষায় 'কুফুরী' কালাম করল যদিও সে অপারগ অবস্থায় 'কুফুরী' কালাম করল, এ জাতীয় মুহর্তে শরীয়তের বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য শুধুমাত্র পাপ রহিতকরণ হল। অপারগতা সময় ঐ ব্যক্তির জন্য তো শরীয়ত 'কুফুরী' কালাম মোবাহ বলেন নি, বরং এর জাতীয় অবস্থায়ও 'কুফুরী' কালাম হারাম হিসেবে অবশিষ্ট রইল। সুতরাং এ জাতীয় অবস্থায় 'আজীমত' উত্তম, 'রোখছত' থেকে, উপরন্তু কোন ব্যক্তি অপারগ অবস্থায় যদি কোন রাজা বাদশাকে ইবাদতের সিজদা করতে বাধ্য করা হয়, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য 'সিজদায়ে' ইবাদত না করে 'সব্র'

রেখাছত' থেকে উত্তম। আর যদি কোন ব্যক্তি রাজা বাদশা বা অন্য কাউকে সজিদায়ে তাহিয়াহ করতে বাধ্য হয় তখন 'সবর' বা সজিদায়ে তাহিয়াহ না করা থেকে, সিজদায়ে তাহিয়াহ করা উত্তম, কেননা এ অবস্থায় 'রোখছত' আজিমত' থেকে উত্তম, কেননা সিজদায়ে তাহিয়াহ ইহা মৌলিকভাবে মোবাহ তথা জায়েজ।

তবে এ জাতীয় 'আসলি মোবাহ' কোন সংশ্লিষ্ট 'আরেজ' বা বিষয়ের কারণে হারাম হতে পারে। প্রত্যেক 'আমরে মোবাহ' বা জায়েজ হুকুম যদি কোন সংশ্লিষ্ট 'আরেজের' কারণে হারাম হয়, তখন এ জাতীয় অবস্থায়ও 'আজমীত' থেকে 'রোখছত' তথা হুকুমটা পালন করা উত্তম, হারামের আরেজ কথা উপকারণ অবশিষ্ট থাকার সময়ও। এরই ভিত্তিতে ফতোয়ায়ে আলমগীরের লেখক বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অপারগ অবস্থায় বাধ্য হয়ে রাজা বাদশাহকে সিজদা করতে হয়, বাদশাহ যদি তাকে 'ইবাদতের সিজদা করতে বলে, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম বিধান হল সে যেন বাদশাহকে ইবাদতের সিজদা না করে, আর লোকটির বাদশাহকে সিজদায়ে তাহিয়াহ করা উত্তম হবে। আর এটাই ফতোয়া। ফতোয়ায়ে কাজী খানেও এরূপ সিদ্ধান্ত বিদ্যমান।

উপরন্তু যখন স্থির সিদ্ধান্ত হলো যে, 'হালাতে ইকরা', তথা অপারগ বা অপছন্দনীয় অবস্থায় সজিদায়ে তাহিয়াহ করা উত্তম। এতে করে জানা গেল যে, এই সজিদায়ে তাহিয়াহ মৌলিকভাবে হারাম নয়। এই সজিদায়ে তাহিয়াহ এর গুণাবলীও হারাম নয়, বরঞ্চ সংশ্লিষ্ট আরেজ বা কারণের দ্বারা এটা হারাম হতে পারে। আর যে সমস্ত শরীয়তের বিধান 'মোজাবের' তথা সংশ্লিষ্ট আরেজের কারণে হারাম হবে, কিন্তু এ বিধান 'মোবাহ' তথা জায়েজ 'আসলি' বা মৌলিক দিক দিয়ে। এতে করে সিদ্ধান্ত স্থির হল যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ 'মোবাহে আসলী' তথা মৌলিকভাবে জায়েজ। তবে কোন কোন সময় 'আরেজে মোজাবের' তথা সংশ্লিষ্ট কারণের দ্বারা ইহা হারাম হয়।

এই আলোচনার দ্বারা এই কথা রহিত হল যে, যে ব্যক্তি বলে যে, সিজদায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ হারাম, আর হাদীস শরীফ সমূহ দ্বারা এর বৈধতা 'নসখ' তথা রহিত করা হয়েছে। আর সজিদায়ে তাহিয়াহ যদি মূলভাবে হারাম হত, তাহলে তার মূল বৈধতাও হাদীস সমূহ দ্বারা 'নসখ' হত যেমন- নিজের বোনকে বিবাহ করা, যদিও বা অপারগ অবস্থায় বিবাহ করা 'রোখছত' উত্তম নয়, বিবাহ না করা তথা 'আজমীত' থেকে, উপরন্তু 'আরেজে মোজাবের' তথা সংশ্লিষ্ট কারণ দ্বারা হারাম বলে বিবেচিত হয়, শরীয়তের বিধানে কোন কোন অবস্থায় এ রকম বিধান নিষেধ নয়, অর্থাৎ ঐ অবস্থায় যখন এই হারামের/আজিমতের মধ্যে যদি ঐ আরেজ পাওয়া না যায় এবং এই জাতীয় 'আরেজ' তথা কারণ থাকার সময় ও প্রয়োজনের সময় ইহা করা শরীয়তে নিষেধ নয়। যেমন- আল্লাহর বাণী-কাদ পাচ্ছালা লাকুম মা হাব রামা আলাইকুম ইল্লা মাদ্ তুরের তুম। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম বস্তু সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তোমরা যখন কোন বস্তুতে অপারগ হও (তখন তার জন্য রোখছত আছে)।

টীকার অনুবাদ : কাউলিহি

এই উপমা উপস্থাপন করা সিজদায়ে তাহিয়াহ'র 'ফরজ' তথা আবশ্যিক কখন তা বুঝাতে, কেননা মূলত (ইবাদতের সিজদা) ফরজ অন্যদিকে আল্লাহ তা'লার নির্দেশের কারণে সিজদায়ে তাহিয়াহ একবার আদায় করা ফেরেশতাদের জন্য ওয়াজিব ছিল, কেননা 'আমরে মোতলাক' এর বিধান বার বার প্রয়োগ হয় না। জায়েজ অবশিষ্ট থেকে যায়, সুতরাং 'নাসেখ' দ্বারা ইহার বৈধতা 'নসখ' তথা রহিত হয়েছে ইহার প্রয়োজন পড়ে না, ইহা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

কাউলে মুগনী :- মাওলানা ওবায়দুল আকবর (রাহ.) এম.এম.।

والعارض المجاور لحرمة سجود التَّحِيَّة لا يخلوا اما ان يكون تشبيهاً
 بالهند في سجودهم للاوثان او تواضعاً لغير الله تعالى وهو حرام لقوله
 عليه السلام من تواضع لغنى لغناؤه اذهب ثلثا دينه ^{الصلوة} وفي السجود غاية
 التواضع والتذلل والاول لا يصح ان يكون عارضاً لحرمة فان التشبيه في
 كل امر غير مفيد للحرمة بل الشرط فيه ان يكون الشيء في اصله مذموماً
 ويكون التشبيه مقصوداً مع هذا صورة المشابهة لا يضر فيما يتعلق به صلاح
 العباد قال في رد المحتار قوله شبه بخلقهم اي مشابه لخلق والمراد من يشابه
 بهم في قسمهم من سائر المعاصي باهل الكتاب اي ان قصده فان التشبيه بهم
 لا يكون في كل شيء بل في المذموم وفيما قصد به التشبيه لا فيما لا يقصد به ذلك
 فاننا نأكل ونشرب كما يفعلون صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح
 العباد لا يضر الا فلا يضر التشبيه عند انتفاء شرط من هذه الشروط وظاهر
 ان سجود التَّحِيَّة غير مذموم في اصله فانه في الاصل تحية والتَّحِيَّة ليست مذمومة
 في ذاتها فلو كانت بالسجود فلا معنى لكونها مذمومة في اصلها ولو كان سجود
 التَّحِيَّة مقبوحاً في ذاته لم يرد الامر به ويتصل المريدون به صلاح حالهم
 بالتذلل عند تشيؤهم فلا يضر صورة المشابهة فيه وغرض الكفار بالسجود
 للاوثان عبادتها لا التحية لها به فلو كان السجود حراماً بالتشبيه ينبغي ان يحرم
 سجود العباد لله تعالى بالتوجه الى جهة الكعبة فانه من حيث اتحاد
 الغرض مشابه لسجودهم بخلاف سجود التَّحِيَّة فان الغرض منه سجود
 السلام فلا اتحاد لسجود التَّحِيَّة من حيث الغرض لسجودهم للاوثان فعلم ان
 التشبيه لا يصلح ان يكون عليه لحرمة سجود التَّحِيَّة كيف وحديث التشبيه ورد
 على خلاف القياس فانه لا معنى لكون اهل الاسلام من قوم تشبهوا بهم وفيه زجر

لالتحريم وكل نص ورد على خلاف القياس يختص بمورده ولا يجوز أن يتعدى
 منه الحكم إلى غيره وقد منع النبي عليه السلام عليه الصلوة والسلام عن السلام بكف اليد
 والأنا منظر إلى أن فيه تشبهاً بسلام اليهود والنصارى فيكون السلام به ممنوعاً
 لورود النص بال منع عنه ولا يجوز أن يقاس عليه سجود التحيّة كما وقع في
 التنقيحات السنية فإنه ليس من شعائر اليهود والنصارى على الخصوص كما
 أن السلام بكف اليد والأنا منظر من خصوص ملتهم بل كان ذلك السجود في
 جميع الشرائع السالفة وسجودهم الاحبار والرهبان كان سجود الربوبية
 لا سجود التحيّة كما عملت فلو سلم كونه مشابهاً لسجودهم صورة لكن من
 حيث المعنى فرقاً بينهما ولا يتحقق باتحاد الصورة فقط معنى التشبه بل لا بد فيه
 من وجود قصد التشبه كما تقدم فعلم أن سجود التحيّة ليس مشابهاً
 لسجودهم مطلقاً بل عند وجود القصد به بخلاف السلام بكف اليد والأنا منظر
 فإن السلام به ليس والأنا في خصوص ملتهم فلو وجد السلام به لوجد القصد
 التشبه فقط فلذلك منع النبي عليه السلام عنه مطلقاً بخلاف سجود التحيّة فإنه كان في
 جميع الشرائع السالفة لأني خصوص ملتهم فقط وقد ورد به الأمر مع
 أن بين سجودهم والأوثان وبين سجود التحيّة باعتبار الغرض والمعنى فرقاً
 بعيداً فالقول بأنه أن وجد وجد التشبه بهم كما وقع في التنقيحات، مما لا
 معنى له فعلم أن حكم السلام بكف اليد والأنا منظر لا يتعدى إلى سجود التحيّة
 وأما على الثاني أي لو كان العارض لمنع سجود التحيّة حرمة التواضع لغير الله
 فلا يلزم أن يكون السجود حراماً مطلقاً فإن التواضع لغير الله إن كان لغناه يكون
 حراماً لقوله عليه الصلوة والسلام من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه الخ

فان لم يكن لغنى لغناه بل لا مردني وحي شرعي فان كان من يتواضع له مستحب
توقيره والتواضع له واجب لقوله تعالى وَخُفِضَ لَهُمَا جَنَاحُ الذَّلِّ وَمَثَلُ لُهُمَا
قَوْلَا كَرِيمًا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ الخ وان لم يكن
منهم فيجوز له التواضع بل يستحب قال في رد المحتار ولا رخصة فيه اى تقبيل
اليدين لغيرهما اى عالم وعادل وفي المحيط ان كان لاسلامه جاز اكرامه
وان انيل الدنيا كره وطلب من عالم او زاهد ان يدفع اليه قدمه ويمكنه
من قدمه ليقبله اجابه قال الامام النووي ان كان لرزقه وتقواه وصلاحه
وعامه وشرفه ونحو ذلك من الامور الدينية لم يكره بل يستحب وان كان
لدنياه وغناه وثروته وشوخته وجاهته عند اهل الدنيا ونحو ذلك فهو
مكروه شديد الخ فلما جاز التواضع والتذلل لغير الله تعالى لا مردني
اجاز وتقبيل قبر والدين لما في العالم كيريه، ولا بأس تقبيل قبر والدين
الخ، اجاز وسجود التحيه في خمس محال كما وقع التصريح به في الفتاوى
القيسيه حيث قال السجدة اثنان سجدة العبادة وسجدة التحية سجدة
العبادة الله تعالى خاصة وسجدة التحية بدون الله خاصة وسجدة التحية
بدون الله تعالى في خمس محال جائز لقوم النبي ولمريد الشيخ ولرعيه للملك
ولوكد للوالدين ولعبد للمولى في كل حال يخصص الخ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিদ্ধা-এ-তাহিয়াহ জায়েজ ও

নাজাজেজ হওয়ার বাহ্যিক তাশাক্বাহ সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা

অনুবাদ : ‘আরেজে মোজাবের’ তথা সংশ্লিষ্ট কারণ বা বিষয়, যা দ্বারা সিদ্ধায়ে তাহিয়াহ হারাম বলে গণ্য হবে, ‘আরেজে মোজাবের’ যেন এই জাতীয় থেকে মুক্ত হয়। যেমন- সিদ্ধায়ে তাহিয়াহ যদি হিন্দুদের মূর্তি পূজার মত হয়, বা গাইরুদ্বাহ তথা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নিকট কাকুতি মিনতি করা এটা হারাম, হযরত নবী করিম (সাঃ) এর পবিত্র বাণী দ্বারা যেমন নবী করিম (সাঃ) এরশাদ ফরমান, মান তাওয়াদায়া লেগনীয়ীন লাগনা আজহাবা ছালছান দিনাহ। অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির নিকট মান সম্পদের আশায় কাকুতি মিনতি করে, তখন ঐ ব্যক্তির ধর্মের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল। সিদ্ধার দ্বারা কাকুতি মিনতি এবং নিকৃষ্টতা প্রকাশ পায়। (এখানে দুইটি কারণের মধ্যে) প্রথমটি অর্থাৎ তাশবিই আরেজ দ্বারা শুধুমাত্র সিদ্ধায়ে তাহিয়াহ হারাম হওয়া বিতর্ক সিদ্ধান্ত নয়। কেননা ‘তাশবিই বা সামঞ্জস্য বিষয়ে বা ব্যাপারে হারাম হওয়া বিতর্ক সিদ্ধান্ত হয় না, বরং তাশবিই বা সামঞ্জস্য প্রত্যেক বিষয়ে বা ব্যাপারে হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হয় না, বরং ‘তাশবিই’ দ্বারা হারাম হওয়ার জন্য শর্ত হল বিষয় বস্তুটি মৌলিকভাবে হারাম বা মন্দ হওয়া আর এ জাতীয় মৌলিক ‘তাশাক্বাহ’ উদ্দেশ্য, উপরন্তু কোন কোন বিধানে সাধারণতঃ ‘মোশাবাহাত’ দেখা যায়। আর এ জাতীয় ‘মোশাবাহাত’ দ্বারা বান্দাদের মোয়ামেলাত তথা কাজ কারবারে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ‘রদুল মোহতার’ গ্রন্থকার বলেন, এই কথায় শাক্বাহা বেখলকিহিম তার চরিত্র তাদের মত অর্থাৎ চরিত্রের দিক দিয়ে যেন তার মত সে তাদের মত, এর উদ্দেশ্য যা সমস্ত পাপ জনিত বিষয়ে প্রযোজ্য হবে আহলে কিতাবদের সাথে অর্থাৎ সে নিঃসন্দেহে ইচ্ছা করেছে। কেননা হিন্দু বা অন্যান্য বিধর্মীদের সাথে ‘তাশাক্বাহ’ প্রত্যেক বিষয়ে মন্দ হবে না। শুধুমাত্র মন্দ বিষয়ে তাশাক্বাহ হারাম হবে, এই ‘তাশাক্বাহ’ দিয়ে যা খারাপ কিছু ইচ্ছা করা যাবে, যদি ‘তাশাক্বাহ’ দ্বারা মন্দ কিছু ইচ্ছা করা না হয়, তখন ‘তাশাক্বাহ’ হারাম হবে না। কেননা আমরা খানা খাই পানীয় পান করি যেমনিভাবে হিন্দুরাও একই ভাবে পানাহার করে। ইহা ছাড়া অন্যান্য মোয়ামেলাতেও যা কোনভাবে ক্ষতি বিবেচিত হয়না। সুতরাং ‘তাশাক্বাহ’ তথা সামঞ্জস্যতা শরীয়তে ক্ষতির বিষয় নয়, যখন উল্লেখিত শর্ত পাওয়া না যায়।

প্রকাশ থাকে যে, সিদ্ধায়ে তাহিয়াহ মূলভাবে খারাপ বা মন্দ কাজ নয়, কেননা এই সিদ্ধা এম মূল উদ্দেশ্য তাহিয়াহ তথা সম্মান প্রদর্শন, উপরন্তু তাহিয়াহ তথা সম্মান সত্ত্বাগভাবে মন্দ বিষয় নয়, যদিও এই তাহিয়াহ তথা সম্মান সিদ্ধা দ্বারা আদায় হয়। এই তাহিয়াহ তথা সম্মান সিদ্ধা দ্বারা সম্পাদন ও মৌলিকভাবে মন্দ বা খারাপ কাজ নয়, আর যদি সজিদায়ে তাহিয়াহ সত্ত্বাগত দিক দিয়ে মন্দ বিষয় হত, তাহলে ইহা করার জন্য ‘আমর’ তথা নির্দেশের বর্ণনা আসত না।

উপরন্তু মুরীদগণ তাঁদের পীর মোর্শেদকে সজিদায়ে তাহিয়াহ করে এই উদ্দেশ্যে যেন তাদের অবনতি অবস্থার বিতর্কতা লাভ করে, সুতরাং এই সজিদা করণের ‘মোশাবাহাত’ কোন ক্ষতিকর বিষয় বিবেচিত হয় না; অন্যদিকে কাকেরদের সজিদা করা মূর্তিদেরকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহিয়াহ তথা সম্মানের উদ্দেশ্যে নয়। ‘তাশাক্বাহ’ তথা সামঞ্জস্যতার দরুণ যদি সিদ্ধা করা হারাম হয়, তখন সামঞ্জস্যতার দরুণ আল্লাহ

তা'লাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবামুখী হয়ে সিজ্জাদা করা ও হারাম হয়ে যায়, কেননা কাফের এবং ঈমানদারদের সজ্জাদা করার উদ্দেশ্যে ইবাদত এক ও অভিন্ন। আর এই অভিন্ন উদ্দেশ্য 'মোশাবা' অন্যদিকে সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ এই 'মোশাবা' থেকে ভিন্ন, কেননা সজ্জাদা তাহিয়াহ এর উদ্দেশ্য সালাম করা, সুতরাং মূর্তি সমূহকে সজ্জাদা করার উদ্দেশ্য আর সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ এর উদ্দেশ্য এক নয়। জানা গেল, 'তাশাক্বুহ' ইহা সজ্জাদায়ে তাহিয়াহকে হারাম বলা কোন দিক দিয়ে সহীহ হবে না এবং 'তাশাক্বুহ' এ হাদীস যা বর্ণিত হয়েছে কিয়াসের ভিন্নতার উপর। কেননা আহলে ইসলাম তথা মোসলমানগণ সব 'মোশাবাহাত' তথা সামঞ্জস্য বিধানে মূর্তি পূজারীদের অর্ন্তভূক্ত হবে, মোশাবাহাতের 'জজর' আছে 'তাহরীম' নেই, আর প্রত্যেক 'নস' যা কিয়াসের খেলাপে বর্ণিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে কোন খাস কারণের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং এই জাতীয় 'নস' দ্বারা অন্য একটি বিষয়ের উপর হুকুম জারী করা জায়েজ হবে না। হযরত নবী করিম (দঃ) হাতের তালু আনামেল দ্বারা সালাম দিতে নিষেধ করেছিলেন। প্রত্যেক বিষয় হচ্ছে যে, এ রীতিতে সালাম দেওয়া ইহুদী নাসারাদের সালাম দেওয়ার মত হয়, এই প্রকার 'তাশাক্বুহ' এর সালাম করা এই রীতিতে নিষেধ হয়েছে। আর হাদীসের 'নস' এর 'ওরুদ' বর্ণনার কারণে এই জাতীয় সালাম দেওয়া নিষেধ হল। এর উপর কিয়াস তথা অনুমান করে সজ্জাদা তাহিয়াহ নিষেধ বলা জায়েজ হবে না। যেমন তানকিহাতিচ ছুন্নিয়ার কিতাবের লিখক এইরূপ কিয়াস বা অনুমান করে সজ্জাদায়ে তাহিয়াহকে হারাম বলেছেন। কেননা সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ ইহা ইহুদী এবং নাসারাদের খাস কোন নিদর্শনও নয়। যেমনিভাবে হাতের তালু এবং আনামেল দ্বারা সালাম করা তাদের ধর্মের একটি খাস নিদর্শন, বরং এই সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ সমস্ত পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহে বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে ইহুদী নাসারাদের সজ্জাদা করা তাদের পুরোহিত এবং ধর্মযাজক পাদ্রীদেরকে- এটা ছিল তাদের রবুবিয়াত তথা প্রতিপালকের সজ্জাদা, এটা সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ তথা সম্মানের সজ্জাদা ছিল না, যেমন পূর্বে জানা গেল। যদি মানা যায় যে, বাহ্যিক দিক দিয়ে তাদের সজ্জাদায়ে রবুবিয়াতের সাথে সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ এর মোশাবাহাত দেখা যায়, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এই উভয় সজ্জাদা এর পার্থক্য বিদ্যমান আছে। শুধুমাত্র বাহ্যিক মোশাবাহাত তথা সামঞ্জস্যতায় কোন কিছুকে এক বলা যুক্তিযুক্ত নয় বরং এই 'মোশাবাহাত' উদ্দেশ্য একত্ব হওয়ার আবশ্যিক, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হল। জানা যায়, সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ তাদের 'সজ্জাদা' এর সাথে 'মোতলাক' ভাবে 'মোশাবাহাত' নয়। বরং যখন উদ্দেশ্য এক হবে, হাতের তালু বা আনামেল দ্বারা সালাম এটার খেলাপ, কেননা তাদের সালাম দেওয়ার রীতি এটা ভিন্ন অন্য রীতি নেই এমনকি এটা তাদের ধর্মের নির্ধারিত রীতি। যদি এইভাবে সালাম দেওয়া পাওয়া যায়। তখন অবশ্যই শুধুমাত্র 'তাশাক্বুহ' তথা উদ্দেশ্য ও পাওয়া গেল। এ কারণে হযরত নবী (দঃ) 'মোতলাক' তথা সাধারণভাবে এ রীতিতে সালাম দিতে নিষেধ করেছেন। সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ এটা ভিন্ন ব্যাপার, কেননা সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তে বিদ্যমান ছিল, তা শুধুমাত্র ইহুদী নাসারাদের ধর্মে খাস করে ছিল না। আর সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ করা উদ্দেশ্য দিক বিবেচনা করে, উদ্দেশ্য ও অর্থের দিক দিয়ে মূর্তির সজ্জাদা আর সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ এর পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং বলা হল, 'তাশাক্বুহ' পাওয়া গেল, তাশাক্বুহ পাওয়া গেল, যেমন-তানকিহাতিচ ছুন্নিয়া কিতাবের লিখক যা বলেছেন- যে কথার কোন অর্থ বা মূল্য নেই। এখন জানা গেল, হাতের তালু কিংবা আঙুলের মাথা দিয়ে সালাম করার হুকুম এটা সজ্জাদায়ে তাহিয়াহ এর জন্য প্রযোজ্য হবে না।

উপরন্ত দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ যদি 'আরেজ' যা সজিদায়ে তাহিয়া করাকে নিষেধ করে, গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের কাকুতি মিনতি করা হারাম। এই কারণ দ্বারাও সজিদা 'মোতলাক' তথা সাধারণভাবে হারাম বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে না, কেননা তাওয়াজো আকুতি মিনতি করা গাইরুল্লাহ এর নিকট, যদি তার ধন সম্পদ লাভ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তখন সজিদায়ে তাহিয়া ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে। হযরত নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র বাণীর আলোকে তাওয়াজো যদি সজিদায়ে তাহিয়া ধনীকে ধন সম্পদের উদ্দেশ্যে না হয়, বরং সজিদায়ে তাহিয়া ধর্মীয় কোন বিধান বা শরয়ী কোন হকের উদ্দেশ্যে হয় কোন ব্যক্তিকে বিনয়ভাবে সম্মান করা ওয়াজিব হয়, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য তাওয়াজো তথা আকুতি মিনতি করা ওয়াজিব হবে। যেমন আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন "ওয়াক পেজ লাহুমা জানা হাজ জুল্লে ওয়া কুল লা হুমা কাওলান করিমা, ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরে মিন কুম।" অর্থাৎ-তোমরা মাতা-পিতার সাথে নম্র আচরণ কর এবং তাঁদের সাথে মাধুর্য্যভাবে কথাবার্তা বল। তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে উলীল 'আমর' এর নির্দেশ মান্য কর।

সম্মান পাওয়া ব্যক্তি উল্লেখিত কোরআনের আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ হলেও তার সামনে তাওয়াজো তথা কাকুতি মিনতি করা জায়েজ, বরং মোস্তাহাবও বটে। রদুল মোহতার এর কিতাবের লিখক বলেন, এই কাজের মধ্যে কোন প্রকার 'রোখছত' নেই, অর্থাৎ আলেম এবং আদেল তথা ন্যায় বিচারকের হাত চুম্বন করা। 'আল মহিত' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ইসলামের জন্য তথা ধর্মের জন্য অন্য ব্যক্তিকে সম্মান করা জায়েজ আছে। অন্যদিকে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অর্জনের জন্য অন্যকে সম্মান করা মাকরুহ। আলেম এবং জাহেদ তথা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিদের নিকট তাদের পা মোবারক ধরা সম্ভব হলে তাদের পা চুম্বন করা। ইমাম নব্বী (রাঃ) বলেন, ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ যদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি তাঁর তাকওয়া, তাঁর মোয়ালেমাত, ইলম এবং সম্মান এই জাতীয় দ্বীনের কাজের উদ্দেশ্যে, তাদের পা চুম্বন করা মাকরুহ নয় বরং মোস্তাহাব। যদি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে, ধন সম্পদের উদ্দেশ্যে, বা যশ খ্যাতির উদ্দেশ্যে দুনিয়াবাজ মানুষ কিংবা এই জাতীয় পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাহালাপ ধরা কিংবা চুম্বন করা কঠিন মাকরুহ তথা মাকরুহে তাহরীমি।

উপরন্ত দ্বীনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নিকট তাওয়াজো তথা আজিজী করা কিংবা নিজেকে অন্যের নিকট নিকৃষ্টভাবে উপস্থাপন করা জায়েজ বলে প্রমাণিত হল। ফতোয়ায়ে আলমগীরে বর্ণিত আছে পিতা মাতার কবরে চুম্বন করা জায়েজ। এতে কোন প্রকার শরয়ী ক্ষতি নেই। ফোকাহায়ে কেরামগণ পাঁচ জায়গায় সিজদায়ে তাহিয়াহ করা জায়েজ বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। ফতোয়ায়ে তাইছিরিয়ায় বিশদভাবে বর্ণনা আছে, যেমন-তাইছিরিয়ার গ্রন্থকার বলেন, সিজদা দুই প্রকার :- এক. সিজদাতুল ইবাদাত তথা ইবাদতের সিজদা, দুই. সিজদাতুল তাহিয়াত তথা সম্মানের সিজদা। ইবাদতের সিজদা আল্লাহ তা'লার জন্য খাস তথা নির্দিষ্ট, অন্যদিকে সিজদায়ে তাহিয়াহ আল্লাহ ভিন্ন অন্যদের জন্য খাস। আল্লাহ ব্যতীত পাঁচ জায়গায় সিজদায়ে তাহিয়াহ জায়েজ। (১) উম্মত নবীকে সিজদায়ে তাহিয়াহ করা, (২) মুরীদ পীরকে সম্মানী সিজদা করা, (৩) প্রজা বাদশাহকে সম্মানী সিজদা করা (৪) সন্তান-পিতা-মাতাকে সম্মানী সিজদা করা, (৫) গোলাম তার মনিবকে সিজদায়ে তাহিয়াহ করা। উল্লেখিত পাঁচ জায়গায় সর্বাবস্থায় সিজদায়ে তাহিয়াহ করা রোখছত আছে।

جهلاً تبين ان ما في ملالاج

النبوة للشيخ عبد الحق الدهلوي قدس سره من قوله يكسب سجدة تحت است
 و بعضى روايت فقيهه و ان رخصته آمده است مختار كراهت و حرمت است الخ و ان
 يفهم منه في الظاهر ان كراهة و حرمة ما يختار مطلقاً لكنه في الحقيقة
 قيد بما اذا كان السجود فيه لينيل الدنيا و لغنى لغناه و لما اورد في كلامه لفظ
 الكراهة و الحرمة كليهما يفهم منه ان بعضهم اختار كراهته و بعضهم اختار
 حرمة فيجوز في توجيه الاختلاف الواقع بينهم في اختيارهم ان يقال
 ان من نظر الى ان الناس يسجدون على مرور الزمان ان لاهل التسليم
 السلاطين الجابرة اختار حرمة مطلقاً فان السجود لهم انما يكون لينيل
 الدنيا و من لم ينظر الى ذلك بل نظر الى صورة السجود و ظواهر النصوص
 فيه من الاحاديث اختار كراهته مطلقاً لكن الناظرين الى معاني النصوص و علة
 المنع قالوا انه ان كان لاهل الدولة الدنوية لينيل الدنيا يكون فعله حراماً
 و ان كان لامر ديني لمن يحق ان يتواضع له شريعاً فهو على ابحاثه على هذا
 ما في بعض كتب الفقه ان سجد التسمية كبيرة من الكبائر الخ يكون
 مراده ان احداً لو سجد لغنى لغناه كالجبابرة من السلاطين فهو كبيرة من
 الكبائر فان الكبيرة ما فيه وعيد لتركه و لم يوجد نص على ثبوت الوعيد
 للساجدين على وجه التسمية غير ان معنى التواضع لغير الله يوجد في ذلك
 السجود و التواضع مطلقاً لغير الله ليس من الكبائر بل اذا كان لغنى لغناه
 فانه يوجب ذهاب ثلثي الدين بحكم النص من الحديث و ذهاب ثلثي الدين
 من قبيل الوعيد و ما في قول بعضهم كما في العالم كبرى ان الكبيرة هنا
 يستقبحه المسلمون الخ فالمراد المسلمون الذين لهم قوة ادراك حقائق
 الاشياء من حسناتها و قبحها كما هو المتبادر لاعموم المسلمين فيكون مراد

قوله ان ما يكون قبيحا في اصله فذلك يستقبحه اهل العرفان للحقائق من المسلمين
فهو كبيرة من الكبائر ولا يقع في اصل سجود التَّحِيَّة بل في عارضة كما عانت فلا يكون
كبيرة بالنظر الى اصله بل يكون كبيرة بالنظر الى عارضة وهو لسجود ليل الدنيا
فعلم ان سجود للاغنياء لغناهم مما يعد من الكبائر لذلك قالوا اذا سجد
للجبابرة فهو كبيرة من الكبائر كما وقع في نص العالمكيرية. قال الامام ابو منصور اذا
قبل احدين يدي احد الارض او انحنى له او طأ رأسه لا يكفر لانه يريد تعظيمه
لا عبادته وقال غيره من مشايخنا اذا سجد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر الا
ويظهر التأمل في هذا القول ان السجود عند الامير ابي منصور جائز مطلقا اما عند
غيره من المشايخ اذا سجد الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر واما اذا سجد لغير
الجبابرة من السلاطين وغيرهم فلا يفهم من ذلك القول كونه كبيرة عند احد
منهم فانه اشار فيه بهؤلاء الى جبابرة ذلك الزمان وفائدة الاشارة به اليهم
تقرير عدم كونه كبيرة لغيرهم كما لا يخفى على من له نظر عميق وفهم دقيق في مساق
المجاويز تساهل ما في الباب ان السجود ان كان لغني لغناه فهو كبيرة لكن لا من
حيث ان السجود من الكبائر بل من حيث ان فيه معنى التواضع لغني لغناه فان
لم يكن للاغنياء هذه الحيشية او غيرهم ممن لا يمتنع له التواضع شرعا
لا وجه لكونه كبيرة فانه ليس في هذه الصورة محلا للوعيد وهو ذهاب ثمن
الدين كما علمت والجواز على هذه التقدير وان كان في بادي النظر قول
الاقلين من الفقهاء لكن بعد التعمق في المعنى يظهر ان قول الاكثريين
منهم في نظر اليه وقول الاقلين قد يكون قويا بقوة دليله قال ابن نجم المصري
اي صاحب

فهو كبيرة التي دفن في العالمكيرية من سجد للسلطان على وجه التحية او قبل الارض بين يديه
لا يكفر لكن باثر لا رتاب الكبيرة التي مرادة اذا سجد السلطان المجابر الذي يجبر الناس للسجود
له فالسجود له كبيرة من الكبائر لا مرادة سجد التحية مطلقا من الكبائر كما فهمه من المناظر

في الاشياء لا انتقل الا الصحيح المعتمد في المذهب وان كان مفردا على قول ضعيف
ورواية ضعيفة الخ يعلم من قوله ان الضعف في الرواية لا ينافي كون المروي
معتقلا في المذهب فخرج الكلام مما ذكرنا ان الامر في قوله تعالى اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ من حيث كونه متعلقا بفعل الملائكة ليس بتكويني بل تكليفي وهو
قسم من التشريعي والوجوب المفهوم منه حكم شرعي وكونه الامر تكليفيا
لا يتوقف على كونه بتوسط النبي كما مر فلو سألوا ان ادم يكون نبيا للملائكة
في الجنة لكن عدم كونه نبيا لهم لا يمنع كون ذلك الامر تكليفيا مفيدا للوجوب
ثبت كون السجود واجبا على الملائكة لكن لما سجدوا ولم يردوا بدفعه واحدة سقط
عنهم الوجوب لان الامر المطلق لا يعتمد التكرار لكن يبقى جواز ان الجواز
لا يفتي من الامور بسقوط الوجوب بالامتنال بحكم عدم احتمال الامر للتكرار بل
يفنى نسخ الوجوب اذ كان في ضمنه واما اذا لم يكن في ضمنه لا يفتي بنسخه ايضا بل
يبقى لانه جواز اصلي ولا يجوز ان يزول من الشيء ما هو الاصل فيه فلما بقي جواز
صار من حيث كونه تحية مندوبا في الشرائع السالفة ولا يلزم تكرار امر السجود وابقا
مندوبا فيها فان ذلك الامر للوجوب لا للندب ولا يلزم ببقائه بقاءه حتى يلزم
تكرار الامر فلما بقي مندوبا فيها عام ان جواز اصلي فان الجواز الذي يكون في
ضمن الندب يكون امليا كما علمت فهو بالنظر الى هذا الجواز من شرع من
قبلنا فيكون حجة الدال بالنظر الى كونه امرا على الملائكة حجة لنا فان الله تعالى
قد قمن به في قرآننا وجميع ما في القرآن حجة في جواز العمل به بشرط ان لا يوجد
الدليل على نسخه وظاهر انه لو وجد له في القرآن ناسخ غير ما قيل انه منسوخ
يحدث لو امرت احدا ان يسجد لاحد الخ وهذا الحديث لا يجوز ان يكون
ناسخا له لانه مع قطع النظر عما يرد عليه مما ذكرنا خبر لا يفيد التحريم و
الناسخ يجب ان يكون مما يفيد الوجوب او التحريم كما بيناه

নবম পরিচ্ছেদ

সিজ্দা-এ-তাহিয়াহ সম্পর্কে ফকীহদের মতামত

অনুবাদঃ হযরত শাইখ আবদুল হক দেহলভী (রাঃ) মাদারেজুন নবুয়্যাত কিতাবে এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক প্রকারের সজিদা তাহিয়াহ আছে। কতক ফোকাহাদের বর্ণনায় সিজদায়ে তাহিয়াহ করার রোখছত তথা জায়েজ আছে। আর কারো মতে এ জাতীয় সিজদা মাকরুহ বা হারাম। এ কথা থেকে আমরা অনুধাবন করলাম বাহ্যিক দিক দিয়ে মোতলাক সিজদায়ে তাহিয়াহ মাকরুহ বা হারাম। কিন্তু হাকিকত তথা বাস্তবিকভাবে এই সজিদার হাকিকতের সম্পর্কে দুনিয়া অর্জনের জন্য এবং ধনী ব্যক্তি থেকে ধন লাভের জন্য হলে তখনই হারাম হবে। হযরত শায়খ আবদুল হক দেহলভী (রাঃ) এর বর্ণনায় মাকরুহ এবং হারাম উভয়টি আছে। কোন কোন ফোকাহায়ে কেলাম সিজদায়ে তাহিয়াহকে মাকরুহ বলেছেন, আবার কেউ কেউ হারাম বলেছেন। সুতরাং এ দ্বিবিধ মতানৈক্য মতামতের পর্যালোচনা এইভাবে করা জায়েজ হবে যে, কেউ বলে যে, কোন ব্যক্তি দেখল যে, সময়ের রেওয়াজ অনুযায়ী প্রজারা অত্যাচারী বাদশাহকে সিজদা করতেছে। তখন তিনি এ সিজদাকে মোতলাক হারাম বলে ফতোয়া দিলেন, যখন তাদের সিজদা শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জনের জন্য হয়। আর যিনি এভাবে না দেখে শুধু বাহ্যিক সিজদা দেখল এবং হাদীস সমূহের ‘জাহেরী নস’ দেখল। তখন তিনি মোতলাকভাবে এ সিজদায়ে তাহিয়াহকে মাকরুহ বলে মতামত পেশ করলেন, কিন্তু গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যারা হাদীসের নসের অর্থ এবং নিষেধের কারণ পর্যালোচনা করে বলেন, যদি সিজদায়ে তাহিয়াহকারী দুনিয়া ধন দৌলত বা দুনিয়া অর্জনের জন্য সজিদা করে, তখন ইহা হারাম হবে। আর যদি দীন ধর্মের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের নিকট শরীয়ত মোতাবেক তাওয়াজো তথা কাকুতি মিনতি করা যায়, তাদের সিজদায়ে তাহিয়াহ করে, উহা মোবাহ।

কোন কোন ফিকাহ এর কিতাবে দেখা যায় যে, সিজদায়ে তাহিয়াহ কবীরা গুনাহের মধ্যে একটি কবীরা গুনাহ। ‘কবীরা গুনাহ’ বলার উদ্দেশ্য হল, যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পদশালী ব্যক্তিকে সম্পদ লাভের আশায় সজিদা করল, যেমন-অত্যাচারী বাদশাহকে ভয়ে সিজ্দা করা। এ জাতীয় সজিদা করা কবীরা গুনাহ। উপরন্তু কবীরা গুনাহকারীর জন্য আল্লাহ তা’লা কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন, অথচ সিজদায়ে তাহিয়াহতে আল্লাহ ভিন্ন গাইরুল্লাহ এর নিকট তাওয়াজো তথা আজিজী বিনয় প্রকাশ পায়। মোতলাক আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নিকট তাওয়াজো তথা আজিজী বিনয় করা কবীরা গুনাহ নয় বরং যখন ধনীর ধন লাভের উদ্দেশ্যে তার কাছে তাওয়াজো তথা আজিজী বিনয় প্রকাশ করা হয়, তখন ঐ ব্যক্তি ধর্মের এক তৃতীয়াংশ চলে যাওয়া ওয়াজিব হবে। হাদীসের ‘নস’ বা দলিল এ হুকুম মোতাবেক, ধর্মের এক তৃতীয়াংশ চলে যাওয়া ইহা আজাবে এলাহীর পর্যায়ভুক্ত। যারা বলেন কবীরা গুনাহ হল, যা ফতোয়ায়ে আলমগীরে আছে যে, মুসলমানগণ যা মন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাই কবীরা গুনাহ। যা ফতোয়ায়ে আলমগীরের ভাষায় ‘মুসলমান’ বলার উদ্দেশ্য হল, ঐ সমস্ত মুসলমান যারা বস্তুর হাকিকতের ভাল মন্দ যথার্থভাবে উপলব্ধি করার শক্তি রাখেন। এ জাতীয় মুসলমান সংখ্যায় কম। সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমান নয়। সুতরাং তাঁর কথার উদ্দেশ্য হবে,

মৌলিকভাবে যে সমস্ত কিছু মন্দ, এ কারণে মুসলমানগণের মধ্যে হাকিকত সম্পর্কে আহলে ইরফান তথা তজ্জাজনীগণ যা মন্দ বলে সাব্যস্ত করেন, সেটাই কবীরা গুনাহের মধ্যে একটি কবীরা গুনাহ। মৌলিকভাবে সজিদায়ে তাহিয়াহ কোন মন্দ বিধান নয়, বরং আরেজ তথা অন্য কিছুর সংশ্লিষ্টতায় তা খারাপ হতে পারে, যেমন-পাঠক জানলেন। উপরন্তু মৌলিকভাবে বিবেচনায় এটা কবীরা গুনাহ নয়, বরং আরেজের বিবেচনায় তা কবীরা হতে পারে। আর তা হচ্ছে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে অন্যকে সজিদায়ে তাহিয়াহ করা। জানা গেল ধনীদেবকে সম্মানী সিজদা করা হয়, তাদের ধন সম্পদের খাতিরে বা লাভের উদ্দেশ্যে। এটা কবীরা গুনাহ থেকে আরো জঘন্য। এই কারণে তারা বলে অত্যাচারী বাদশাহকে সিজদা করবে, এটা কবীরা গুনাহ থেকে আরো বড় তথা জঘন্য গুনাহ হবে যা ফতোয়ায়ে আলমগীরের ‘নস’ এ বর্ণনা আছে। ইমাম আবু মনছুর বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সামনে মাটিকে চুম্বন করল, অথবা ঐ ব্যক্তির সামনে ঝুঁকে পড়ল বা ঐ ব্যক্তির সামনে মাথা নত করল। এতে করে কোন ব্যক্তি কুফুরী করল না, কেননা ঐ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সম্মানের উদ্দেশ্যে এ কাজগুলি করল। তার ইবাদত তথা বন্দেগী করার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের অন্য মাশায়েখগণ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি এসব অত্যাচারীকে সিজদা করল, এটা কবীরা গুনাহ থেকে আরো মারাত্মক গুনাহ।

এ উক্তিটি চিন্তা গবেষণা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম আবু মনছুর এর মতে মতলক তথা সাধারণভাবে সিজদা করা জায়েজ, কিন্তু অন্য মাশায়েখ এর মতে যদি অত্যাচারী (রাজা, বাদশাহ বা ব্যক্তি) কে সিজদা করা হয়, তা কবীরা গুনাহ থেকে ও জঘন্য কেননা তিনি তাঁর উক্তির মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন এদের প্রতি যারা ঐ সময়ে অত্যাচারী বাদশাহ। (এদের) ইঙ্গিতের উপকারিতা হল তাদেরকে (অত্যাচারী বাদশাহদের) বুঝানোর জন্য। এর দ্বারা অত্যাচারী ভিন্ন অন্যদেরকে সিজদা করলে কবীরা গুনাহ হবে না, এটা সাব্যস্ত হল। এ কথাটি গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি, সুফ্ব বিষয় বোধগম্যবান ব্যক্তি, যিনি মোজবেরাত’ তথা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাঁর কাছে অপ্রকাশ্য নয়। এ অধ্যায়ের অর্জিত বিষয় হল, ধনীদেবকে ধনের আশায় সিজদা করা কবীরা গুনাহ, কিন্তু এ হিসাবে নয় যে, সজিদা করা কবীরা গুনাহ বরং এ দিক দিয়ে কবীরা গুনাহ যে, ধনীদেব ধনের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট তাওয়াজো তথা কাকুতি মিনতি করা গুনাহ, কেননা ধনীদেব সাথে ধনের আশায় এরূপ কাকুতি মিনতি করা যায় না। অথবা ধনীরা ছাড়া অন্যদের সাথে কাকুতি মিনতি করা, এটা কোনভাবে কবীরা গুনাহ হবে না, কেননা এটা বাহ্যিকভাবে এমন কোন কাজ নয়, যা আজাবের কারণ হবে, অর্থাৎ আজাব হল, ধর্মের এক তৃতীয়াংশ চলে যাওয়া। যেমন-আপনি অবগত হলেন, ঐ পর্যালোচনায় সজিদায়ে তাহিয়াহ জায়েজ হল। যদিও ফোকাহায়ে কেরামদের অল্প সংখ্যকদের মত বাহ্যিক এর দিকে, কিন্তু অর্থের দিকে অল্প সংখ্যক ফোকাহাদের উক্তি দলিল প্রমাণাদি দ্বারা মজবুত হবে; ইবনে নজুমুল মিশরী অর্থাৎ ‘আল আশবাহ’ এর কিতাবের লিখক তার ‘আল আশবাহ’ কিতাবে বলেন, আমি মাযহাবের নির্ভরশীল বিশুদ্ধ হতে বর্ণনা করেছি, যদিও তা দুর্বল উক্তি এবং বর্ণনা থেকে নির্গত হয়েছে।

তাঁর একথা থেকে জানা যায় রেওয়ায়েতের দুর্বলতা বর্ণনাকৃত বিষয় মযহাবে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য নিষেধ নয়।

আমরা ‘আমর’ এর আলোচনায় যা বললাম তা প্রকাশ হয়ে গেল, আল্লাহ তা’লা এর বানীর মধ্যে ওয়াইজকাল রাব্বুকা মিন অর্থাৎ-আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, অর্থাৎ-এ হিসাবে যে, ‘আমর’ এর নির্দেশের কাজের সম্পর্ক ফেরেশতাদের সাথে, এটা ‘তাকবিনী’ নয় বরং ‘তাকলীপি’ বিধান। এটা নবীর মাধ্যমের উপর তাওকুল তথা স্থির নয়-যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় হযরত আদম (আঃ) বেহেশতের মধ্যে ফেরেশতাদের জন্য নবী ছিলেন না, কিন্তু ফেরেশতাদের নবী না হলেও তখনো ‘আমরে তাকলীপি’, যা ওয়াজিবের হুকুম প্রয়োগ হয়, তাতো নিষেধ নয়। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্তে বুঝা গেল যে, ফেরেশতাদের জন্য হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু যখন ফেরেশতারা হযরত আদম (আঃ) কে একবার সিজদায়ে তাহিয়াহ করল, তাদের উপর থেকে ওয়াজিবের বিধান চলে গেল, কেননা ‘আমরে মোতলাক’ বারংবার আদায়ের সম্ভাবনা রাখে না। (ওয়াজিবের বিধান) কিন্তু সিজদা জায়েজের বিধান অবশিষ্ট থেকে যায়, কেননা জায়েজ অস্তিত্বহীন হয় না আমর সমূহ থেকে যে সমস্ত ‘আমর’ ওয়াজিব হিসাবে আদায় করা হয়েছে, এ হুকুমের কারণে যে, ‘আমর’ বারবার সম্ভাবনা রাখে না। বরং ওয়াজিব বিলীন হয়ে যাবে, যখন ওয়াজিব অভ্যন্তরে জায়েজ অবশিষ্ট থাকে। যদি ওয়াজিবের মধ্যে জায়েজ না থাকে তখন এই জাতীয় ওয়াজিব বিধানও রহিত হবে না, বরং ওয়াজিব অবশিষ্ট থাকবে। কেননা “জাওয়াজে আসলি” তথা মূল বৈধতা এবং কোন বস্তুর “আসল” তথা মূলকে দূর করে দেওয়া জায়েজ হবে না।

সুতরাং সিজদায়ে তাহিয়াহ এর জায়েজের বিধান অবশিষ্ট রইল। আর তা আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহে “মানদুব” হিসাবে বিবেচিত হল, আর সিজদায়ে তাহিয়াহ করা দ্বারা “আমর” এর তাকরার তথা বার বার হওয়া আবশ্যক রইলনা, সিজদায়ে তাহিয়াহ “মানদুব” হিসাবে বাকী রইল, কেননা উসজুদ এর “আমর” তথা নির্দেশ ফেরেশতাদের জন্য মানুষের জন্য নয়। মানদুর অবশিষ্ট থাকার জন্য ওয়াজিব অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক নয়। এতে করে ‘আমর’ এর তাকরার হওয়ার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এখন যখন ‘মানদুব’ হিসাবে সিজদায়ে তাহিয়াহ অবশিষ্ট রইল, সুতরাং সাধারণত সিজদায়ে তাহিয়াহ মৌলিকভাবে জায়েজ যা ‘মানদুবের’ অভ্যন্তরে নিহিত। এ জায়েজই মূল বা আসল। যেমন আপনি অবগত হলেন যে, এ জায়েজ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তের জায়েজ বিধান। এটাই আমাদের জন্য দলিল, কেননা আল্লাহ তা’লা এ ঘটনা পবিত্র কোরানে বর্ণনা করেছেন এবং সমস্ত বিষয় দলিল আমল জায়েজ হওয়ার জন্য এই শর্তে যদি ঐ আসল ‘নসখ’ তথা রহিত হওয়ার দলিল পাওয়া না যায় এবং এটা স্পষ্ট যে, সিজদায়ে তাহিয়াহ আয়াতের ‘নসখ’ তথা রহিতকারী হিসাবে পবিত্র কোরআনের কোন আয়াতে কারীমা পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র যারা বলে সিজদায়ে তাহিয়াহ এর আয়াত ‘মানসুখ’ তথা রহিত লাউ আমারতু হাদীস দ্বারা এবং এই হাদীস দ্বারা কোরআনের আয়াতকে ‘নসখ’ রহিত করা জায়েজ হবে না, কেননা ইহা দৃষ্টি বহির্ভূত হাদীস কোন বিষয়ে বর্ণিত যা আমি বর্ণনা করেছি। উপরন্তু হারামের উপকারিতা দিচ্ছে না ‘নাসেখ’ এর ওয়াজিব, সেটা ওয়াজিব অথবা হারাম হুকুমের জন্য প্রযোজ্য হবে। যেমন-আমি উহার বর্ণনা দিয়েছি।

وقوله عليه السلام ^{الصلوة} لسعد بن القيس لا تتغل في خاص لمصلحة خاصة مع ما فيه مما ذكرنا وحديث
 سلمان لا ينبغي لمخلوق أن يسجد لأحد إلا لله الخ ليس لتحريم السجود كما ينطق به
 لفظ لا ينبغي فلا يكون استعماله ولو سلم كونه استعماله لكن لا يجوز أن يكون استعماله
 في عينه ولا معنى في وصفه لما علمت أن أصله مباحٌ والاباحة الأصلية لا تجوز أن
 تكون منسوخة لمعنى في عينها ولا معنى في وصفها فلا بد أن تكون منسوخة لمعنى
 في غيرها فالغرض له أما التشبه بعبادة الأوثان بالسجود أو حرمة التواضع لغير
 الله تعالى والاول لا يجوز أن يكون علته محرمة لما ذكرنا والثاني لا يفيد كونه حراماً
 مطلقاً بل انه لا يفيد كونه حراماً اذا كان لنيل الدنيا كما أوضحناه فإن لم يكن كذلك
 بل يكون لامر من امور الدين كالسجود للمشايخ والوالدين وغيرهم ممن نطق الشرع
 لتوثيرهم وتعظيمهم لا يكون حراماً أصلاً فخرمة ذلك السجود مثل حرمة الصوم في
 يوم النحر وذلك الصوم جائز في الأصل حرام بالعارض كذلك الحكم في ذلك
 السجود غير أن العارض في الصوم حكمه حكم الوصف له والعارض في السجود
 حكمه حكم المجاور له فلو وجد عارض الحرمة يحكم بكونه حراماً والافوه على أصل
 اباحته بناء على ذلك كان أكثر المشايخ الكرام يجوزونه ولا يمنعون لمريديهما اذا
 سجدوا وتعظيماً لهم كما هو ظاهر عند من طالع كتب سيرهم وراجع الى زبرح الانهم
 واولياء الله لا يتبعون لأرباب الظواهر الاقيماً يكون حقاً فإن حقيقة الامور
 تكون منكشفة لهم فما يرتكبونه لا بد أن يكون حقاً في الواقع بل ارب فظهر لك
 بما ذكرنا ان الفقهاء اختلفوا في مسألة سجود التتعية لكن اختلفوا في النظر
 الى الملاقح المنع بظاهر النصوص من الاحاديث لا بالنظر الى أصل العلة فمن نظر الى
 ظاهر النصوص منها والى سجود الناس لأجبار من السلاطين قالوا يحرمته وكرهته
 كما قدّمنا ومن نظر منهم الى علة المنع قالوا بالجواز اذا لم يكن للاغنياء ولفقاهم
 بل كانت لحق من حقوق الدين فلما كان المانع بالنظر الى ظاهر النصوص من الاحاديث

أكثرين يعلم في الظاهر أن المذهب المرحج هو الحرمة فلذلك قال في مدارج النبوة
يكسب سم سمية تحت است وبعض روايت فقير دران رخصه آمده است مختار كراست و حرمت
است لكن يظهر عند التعقب في علّة المنع أن المرحج هو قول المجوزين
وانجاز عند هم ليس على إطلاقه كما علمت فقد تحقق بفضل الله الوهاب ما هو
الصواب في هذا الباب من أن سجود التحية ليس يجب أن يتواضع له شرعاً جائز بل
ارتباب مع ذلك اقول أن الشيعة في قومه كالنبي في أمته قد اتفق عليه جميع أهل
القدس من علماء الظواهر والباطن أهل رسول حقيق للمريد في افاضاته وأفاضاته
وقع التصريح به في كلام الامام الرباني المجدد في الالف الثاني في مكنياته على
هذا الابدان يكون للمريد مذهب شيعه في طريق سلوكه فيجب عليه أن يتبعه
فيما هو مشريه وينقاد به فيما به امره ويتذلل في حضرته بغاية التدلل والاكتناز
بركاته ولا يفوز بقبوضاته حتى لو سجد في حضرته تعظيماً لله وتذلاً لأعذده وأظهر
الانكسار حاله في جنابه وطلباً للرضا وأرجاء ان ينظر اليه بنظر رحمة ويتشرف
اليه بتوجه عنايته فلا شك أن ذلك السجود يكون موجباً لرفع درجات ذلك
المريد وسبباً لترفع امره وباعثاً لصلاح حاله ووسيلة الى الفوز بامنيته فلا
يليق لأرباب الظواهر الذين ليس لهم علاقة بالمشايخ ان يمدوا اعناق الانكار
الى حاله ويسبوا ما يصدر عنه في محبة شيخه الى كفره وفسقه ومن اعطاه
الله قلباً بصيراً فظاهر عذده أن بعضاً من المشايخ الكبار يصعد بحال مجاهداته
على معارج الكمال القدسية ويرتقى بآثار رياضاته على مدارج المقامات -
الانسية ويتغوصه في بحر الانابات يصير كأنه كعبة للقبوضات وتبوق انوار الحسن
الارزى عليه يكون كأنه طور للتجليات فلما كان مخوياً بانوار جمال الله يكون
محبوباً لخلق الله حتى الناس يتيهون لشوق وصله ويأتون الى حضرته من
كل فج شائعين للاستفادة من كماله فيقعون في السجود في سبته تعظيماً له وهذه

المرتبة من مراتب الكمال لا يعطيها إلا المتعال إلا لبعض خواص عبادة الذين -
 اصطفى ولقليل من خلصا حبابه الذين اجتبى ولعمري ان جنابنا شيخنا مرشدا
 سيدنا الغوث الفياض المحبوب لحضرة الله الجناب الشاه مولانا **احمد الله**
 رضي الله عنه وسراج بيته مالك كنوز ولايته سلطان الاولياء برهات -
 الاصفياء قطب الاقطاب في هذا الزمان الجناب الشاه مولانا غلام الرحمن
 رضي الله عنه لهما تلك المنقبة من مناقب العز وفخر عكس جماله من مطلع
 منجبهند ارباع على قضا القلوب وساحات الصدور بحيث يطير عقول
 اهل الدهور من تجملات ذلك النور فيسعي الاقاصح الادنى منهم بسعي
 مشكور وجهود غير مقصور الى حضراتهما العالية وسدتهما الرفيعة مشتاقين
 ليقبسا من مشاعيل فيوضاتهما شائقين ليستفيدوا من افاضاتهما فلما يروا
 جمالهما بعد حضورهم في جنباهما يتأثر قلوبهم بحبتهما فيقعون في السجود -
 من غير جحود انكسار على ما صدر منهم من القصور في امتثال امر الملك المعجود
 فالسجود في حضراتهما رمز من رموزات كمال محويتها بنور الله وغمزة من
 غموزات تمام محبوبيتهما لحضرة الله لا ينكوه الا من له طبع خفاش لا يقدر
 على اقتباس شهاب ذلك النور فهذا النقص فيه لا في ذالكما البدرين من
 البدور ، قال مولانا روم في مثنويه هـ

آدمي چون نور گیرد از خدا ؛ هست سجود ملائک را اجتناب ،
 نیز مسجود کسی کو چون ملک ؛ رسته باشد جانش از طغیان و شک
 مولانا بحر العلوم در شرح آن میگوید آدمی چون از نور گرفتار از خدا کنایه است از معرفت و علم
 و آنچه و را دست از ذات مشیخ جمیع اسماء و احوال است مسجود ملائکه است از اجتناب که این
 سجود تکريم است و در بیت ثانی میگوید بلکه مسجود بی نوع خود نیز است اگر چنین باشد که
 از ادعای بشری مبدل باوصاف ملکی گشته در تفسیر فتح العزیز میگوید که باید

فهميد كنضاي پايان در سينه ايشان واقع است و در آن عمارتي بغايت وسيع بنياد نهاده
و آن عمارت مشتمل بر دوازده نشيمن است كه بعضى از آن بدنيا تعلق دارد و بعضى از آن
بدن از آن بالاس دين و دنيا (الى قول) در نشيمن، دوازدهم محبوب نازينى ماه جيلينى -
بلكه كعبه شامى كه تجلى جمال الهى بدن او را اشيانه خود ساخته و طورى نمائى كه انوار حسن ازلى
بر آن يافت شان محبوبيت الهى در او جلوه گر شده صيد دلها بجا ذبيحيت ميكند و هزاران هزار -
عاشق حسن ازلى ديوان وار بى توقع منفعت و استفاده كمال از دور دشت بجا ذبيحيت در كنند
او دو يده مى آيند و مشتاق لمعه آويند و ايس مرتبه از آن مراتب است كه بهنج كس را از بشر
نداده اند مگر لطيف اين محبوب مقبول بر خي اولياى است او را شمع از محبوبيت آن نصيب
شده سبوح و خلاق و محبوب دلها گشته اند مثل حضرت غوث الاعظم **عبد القادر**
جيلانى و سلطان المشايخ نظام الدين قدس سرها اگر كسى را
درين دوازده نشيمن شبه و شك بخاطر رسد بايد كه درين كارها كه مذكور شده تأمل نمايد كه
اصل اين همه اشتغال از كجا است با يقين بجزم خواهد كرد كه ايس همه پرتوى از انوار كمال تجرى
است كه شاخ در شاخ شعبه در شعبه بر مثال جداول جدا شده بهر طائفه رسيده ،

لا شك ان جنبنا المذكورين المعظمين وشيخنا المكرمين الموصوفين
قد وصلا بيلمع انوار الحسن الاذنى عليهما فيما ذكرناه من المقام وقد صار -

محبوبين للنواص والعام نيكشف معنى من رافى فقد رأى الحق على
من يراها ينظر التعشق والتحبب من الانام فسجدون في حضرتها متوقفا
ليفوز بها يريد من المرام فالسجود في حضرتها تعظيما لهما ما لا يلام لاشركا
ولا عقلا عند ذوى الافهام ، مولا ناروم مى نويسايد

۱. ايمان تعظيم مسجد نيكند .. بر جفا كه اهل دل جدميكند ،
۲. ايس مجاز است ايس حقيقت اينها .. نيست مسجد جز درون سروران ،
۳. مسجد بگو اندرون اوليا است .. مسجد گاه جمداست آنجا خداست ،
۴. تامل مروح خدا تامل .. يرد .. بهنج قومي را خدا رسوا نكرد ،
۵. قصد جنگ انبيا ميداشتند .. جسم ديده آنچه به پنداشتند ،
۶. هر چه در عيني علت شود .. كفر كرد كمالى ملت شود ،
۷. كاسيان را قياس بر خود ميگر .. گر چه مانند در نوشتن شير و شير ،
۸. شد او بيل گشت و بد شد كار او .. لطف گشت و نور شد هزار او ،

দশম পরিচ্ছেদ

সিজ্দা সম্পর্কীয় হাদীস সমূহের পর্যালোচনায় কামেলীনদের মতামত

অনুবাদ : হযরত নবী করিম (সাঃ) এর বাণী হযরত ছা'দ বিন কায়েস (রাঃ) কে লা'তাফ আল্ অর্থাৎ- তুমি করবেনা। এটা নেহি তথা খাস নিষেধ জ্ঞাপক ক্রিয়া। এটা কোন মোসলেহাতের কারণে, যা হযরত ছায়াদ বিন কায়েস এর (রাঃ) জন্য খাসভাবে ছিল, যা উক্ত হাদীসের মধ্যে আছে, যা আমি উল্লেখ করেছি। হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস, যাতে দেখা যায় যে, লা-ইয়াম্ বাগী লি মাখলুকিন আই-ইয়াছ জুদা লি-আহাদিন ইল্লাল্লাহ্ ইলা-আখির। অর্থাৎ-কোন সৃষ্টিজীব আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে সজিদা করা উচিত হবে না। এর দ্বারা সজিদা করা হারাম বুঝায় না। এ কথা হাদীসের শব্দ “লা ইয়াম বাগী” তথা উচিত হবে না শব্দ দ্বারা বুঝা যায় এবং হাদীস শরীফে সজিদায়ে তাহিয়াহ নাসেখ বা বাতিল হবে না। যদি এই হাদীস শরীফকে সজিদায়ে তাহিয়াহ এর জন্য ‘নাসেখ’ হিসাবে মানা হয়, কিন্তু এই হাদীস শরীফ সজিদায়ে তাহিয়াহ এর হাকিকত ও অর্থের দিক দিয়ে কখনো ‘নসেখ’ তথা রহিতকারী হওয়া জায়েজ হবে না, যেমন-আগনি অবগত হলেন যে মূলতঃ সজিদায়ে তাহিয়া মোবাহ তথা জায়েজ। ‘ইবাহাত আসলিয়া’ তথা মৌলিকভাবে জায়েজ বিধান রহিত হওয়া জায়েজ হয় না। সত্ত্বাগত দিক বিবেচনায় কিংবা গুণগত দিক বিবেচনায়, তবে ‘ইবাহাত আসলিয়া’ এর হুকুম সত্ত্বাগত কিংবা গুণগত দিক দিয়ে ভিন্ন অন্য ‘আরেজের’ দ্বারা রহিত হতে পারে। সজিদায়ে তাহিয়া আর ‘আরেজ’ সেটা ‘তাশাক্বুহ’ তথা সামঞ্জস্যতা দ্বারা যেমন মূর্তি বা প্রতিমাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজ্দা করা বা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নিকট তাওয়াজো তথা কাকুতি মিনতি করে সিজ্দায়ে তাহিয়াহ করা (দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে) হারাম। প্রথম ‘আরেজ’ তথা মূর্তি-পূজা সিজ্দায়ে তাহিয়াহ এর হারাম হওয়ার কারণ বলা জায়েজ হবে না, যা আমি উল্লেখ করেছি। (মূর্তি পূজারীগণ মূর্তিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজ্দা করে তাহিয়াহ তথা সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজ্দা করে না) দ্বিতীয় ‘আরেজ’ সেটাও ‘মাতলক’ তথা সাধারণভাবে সিজ্দায়ে তাহিয়াহ হারাম বলে ফতোয়া দিচ্ছে না। বরং তাওয়াজো এই ‘আরেজ’ তখন সিজ্দায়ে তাহিয়াকে হারাম বলে ফতোয়া দিবে, যখন এই আরেজ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে তাওয়াজো তথা কাকুতি মিনতি করে, বরং তা যদি ধর্মের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কাজ হিসাবে আদায় করা হয়, যেমন পীর মাশায়েখ বা পিতা মাতা বা এদের ভিন্ন অন্যদেরকে, যাদেরকে সম্মান এবং তা'জীম করা শরীয়তে বলা হয়েছে, তাদেরকে সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজ্দায়ে তাহিয়াহ করা, ইহা কখনো মৌলিকভাবে হারাম হবে না। ঐ সিজ্দায়ে তাহিয়া হারাম (হওয়া) কোরবানীর দিন রোজা রাখার মত হারাম, অথচ রোজা রাখা মূলতঃ জায়েজ কিন্তু ‘আরেজ’ (কোরবানীর দিন) এর দরুন হারাম। অনুরূপ হুকুম সিজ্দায়ে তাহিয়াহ এর বেলায়। ইহা ছাড়া রোজা এর ‘আরেজ’ রোজার স্বত্ত্বাগত কিংবা গুণগত দিকের জন্য একই হুকুম বর্তাবে। অন্যদিকে সিজ্দায়ে তাহিয়াহ এর ‘আরেজ’ হল ‘মোজাবের’ তথা অন্যের সংশ্লিষ্টতা। যদি হারামের ‘আরেজ’ সিজ্দায়ে তাহিয়াহ এর মধ্যে পাওয়া যায়, তখন ‘আরেজ’র কারণে তার উপর হারাম হুকুম প্রযোজ্য হবে। হারামের ‘আরেজ’ পাওয়া না গেলে তখন হারাম বলা যাবে না, কেননা-সিজ্দায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ মোবাহ। এটার ভিত্তিতে অধিকাংশ

মাশেয়েখীনে কেরাম সিজ্দায়ে তাহিয়াহ জায়েজ বলেছেন (এবং তাঁরা নিষেধ করেন নি, তাঁদের মুরীদগণকে) এবং তাঁদেরকে সম্মানের উদ্দেশ্যে মুরীদানেরা সিজ্দা করলে তাঁরা এটা করতে নিষেধ করেন নি। আর যে ব্যক্তি পীর মাশায়েখের জীবনী পাঠ করেছেন, তাঁদের নিকট এই প্রকারের সিজ্দায়ে তাহিয়াহ এর ঘটনা স্পষ্ট।

উপরন্তু অলি-আল্লাহগণ বাহ্যিক জ্ঞানীদের অনুসরণ করে না, শুধুমাত্র যা সঠিক এবং সত্য তারই অনুসরণ করেন। কেননা প্রত্যেক কাজের হাকিকত তাঁদের সম্মুখে উন্মুক্ত, যেন তাঁরা সঠিকটি গ্রহণ করতে পারে। সন্দেহ ছাড়া প্রত্যেক বিষয় তাঁদের নিকট বাস্তবতার দিক থেকে হক্ক হওয়া আবশ্যিক। এখন আমি যা উল্লেখ করেছি তা আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ফোকাহায়ে কেরামগণ সিজ্দায়ে তাহিয়াহ এর ‘মাসয়ালায়’ মতানৈক্যতা করেছেন, কিন্তু তাঁদের মতানৈক্যতা হাদীস সমূহের ‘জাহের নস্’ বা তথা প্রকাশ্য উক্তির কারণের বিবেচনায়, মূল কারণের দিক দিয়ে নয়। যিনি হাদীসের প্রকাশ্য ‘নস্’ বা দলিল দেখেছেন এবং অত্যাচারী বাদশাহকে প্রজাদের সিজ্দা করা দেখেছেন, তাঁদের কেউ হারাম বলেছেন, কেউবা মাকরুহ বলেছেন, যা পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি।

ফকীহদের মধ্যে যারা ‘ইল্লতিল মানয়ে’ তথা নিষেধের কারণ দেখেছেন, তাঁরা সিজ্দায়ে তাহিয়াহ জায়েজ বলেছেন, যদি তা ধনীদিগের ধন লাভের উদ্দেশ্যে করা না হয়, বরঞ্চ ইহা ধর্মের হক্কের মধ্যে একটি হক্ক হিসাবে বিবেচিত হল। নিষেধকারীদের দৃষ্টি হাদীস সমূহের প্রকাশ্য বিবৃতির দিকে, অধিকাংশরা হাদীসের জাহেরী বিবৃতি সম্পর্কে অবগত এই বলে যে, প্রাধান্য মত হল যে, ইহা হারাম।

এ কারণে ‘মাদারেজুন নবুয়াত’ গ্রন্থকার বলেন, এক প্রকারের সিজ্দা তাহিয়াহ কতক ফকীহদের মতে সিজ্দায়ে তাহিয়াহ ‘রোখছত’ তথা সিজ্দা করা যায়। জাহেরা আলেমদের মত হল সিজ্দায়ে তাহিয়াহ মাকরুহ এবং হারাম, কিন্তু সিজ্দায়ে তাহিয়াহ নিষেধের কারণ গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং জায়েজের পক্ষে মত প্রদানকারীদের মত প্রাধান্য বলে বিবেচিত হয়। এদের জায়েজ বলা সাধারণ তথা মতলাকভাবে নয়। যেমন আপনি অবগত হলেন, অসীম দানকারী আল্লাহর অনুগ্রহ এই অধ্যায়ে সত্যটা বিশ্লেষিত হল যে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে সমস্ত ব্যক্তিকে কাকুতি মিনতি এর সাথে সিজ্দায়ে তাহিয়াহ করা কোন সন্দেহ ছাড়া জায়েজ বলে প্রতীয়মান হল। স্পষ্ট এটা সত্ত্বেও আমি বলতেছি যে, ইন্নাশ শাইখ ফী ক্বাওমিহি কান্ নবীয়ে ফী উম্মাতিহি তথা কোন গোত্রের ধর্মীয় শায়খ বা নেতা তিনি নবীর মত উম্মতের জন্য’ এই উক্তির উপর আলেমে জাহের ও আলেমে বাতেনগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন বরং পীর মাশায়েখ মুরীদের জন্য হাকিকতে রাসূল, ফয়েজ, বরকত এবং আত্মার পরিশুদ্ধিতার বিবেচনায়। মোজাদ্দের আলফে ছানী (ইমামে রাক্বানী) (রাঃ) এর উক্তি থেকে এটার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। এই উক্তি প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেন যে-মুরীদের জন্য স্বীয় পীরের মজহাব গ্রহণ করে ছল্কের পথ চলা আবশ্যিক। মুরীদের জন্য ওয়াজিব নিজ পীরের ভাব-ভঙ্গি অনুসরণ করা এবং যে সমস্ত কাজের আদেশ করেন, তা আদায় করা এবং পীরের সম্মুখে নিজেকে অত্যন্ত হয়ে এবং হীন বলে উপস্থাপন করা। এভাবে মুরীদ পীরের নিকট হতে না পারলে, তাহলে মুরীদ পীর থেকে বরকত লাভ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পীরকে সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজ্দা

না করবে এবং পীরের সম্মুখে নিজের হীনতা এবং কাকুতি মিনতির অবস্থা প্রকাশ না করবে এবং অবশ্যই পীরের সন্তুষ্টি তালাশ না করবে এবং পীরের দয়ার দৃষ্টির আশা না করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় পীরের তাওয়াজ্জাহ লাভ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুরীদ পীরের ফয়েজ লাভ করতে পারবে না। এতে কোন সন্দেহে নাই যে, এই জাতীয় সজিদা ওয়াজিব বলে বিবেচিত হবে ঐ মুরীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং মুরীদের ধর্মীয় কাজের উন্নতির জন্য এবং মুরীদের অবস্থা সংশোধনের কারণ হিসাবে বরং এই সজিদা মুরীদের নিরাপদ ফয়েজের উসীলা হিসাবে। খোদায়ী নেয়ামতগুলো জাহেরা আলেমদের জন্য উপযুক্ত নয়, যে সমস্ত জাহেরা আলেমগণ মাশায়েখীনে কেরামদের সাথে সম্পর্কে রাখে না। তারা এই সমস্ত পীর মাশায়েখদের মুরীদের অবস্থাকে সর্বদা অস্বীকার করে, অথবা তারা গাল মন্দ করে এবং কুফুরী বা ফাসেকী বলে মুরীদ থেকে পীরের ভালবাসায় যা কিছু প্রকাশ পায়। অন্যদিকে আল্লাহ যাঁকে অন্তরের চক্ষু দান করেছেন, তাঁর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, কতক মহান মাশায়েখ যিনি পূর্ণ রেয়াজত ও মোজাহাদের দ্বারা কামালিয়াতের পবিত্র সিঁড়ি সমূহে আরোহণ করেছেন এবং পরিপূর্ণ রেয়াজতের দ্বারা মানবতার উর্ধ্ব মকামে সমাসীন হয়েছেন, নৈকট্যের সাগরে ডুব দিয়েছেন। এই মহান সত্ত্বা তখন ফয়েজ বিতরণের কেবলা হয়ে যান এবং এই মহান ব্যক্তির উপর চিরন্তন সৌন্দর্যের নূর তথা আলোকরশ্মি বিজলি চমকায়। এই মহামানব তখন 'তুর' সদৃশ হয়ে যায় যেন তাঁর উপর জালওয়ায়ে এলাহী বিকশিত। যখন এই মহান ব্যক্তি আল্লাহর সৌন্দর্যের নূরের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তখন তিনি সৃষ্টি জগতের মাহবুব তথা প্রেমাম্পদ হয়ে যায়, তখন মানুষেরা তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় পতঙ্গের মত যায় এবং সব প্রকারের লোকজন তাঁর দরবারে আশ্রয়ভরে আসে, তাঁর কামালিয়াত থেকে সামান্য লাভের জন্য। তখন অসহায় মানুষেরা তাঁর সম্মুখে তাঁর সম্মানার্থে সিজদায়ে পতিত হয়। আর এই মরতবা, কামালিয়াতের মর্তবা, এই সম্মান আল্লাহ সম্মানী বান্দা ছাড়া অন্যকে দান করেন না। শুধুমাত্র আল্লাহ তাঁর ঐ সমস্ত খাস বান্দাদেরকে, যাঁদের তিনি নির্বাচিত করেছেন (এই সম্মান দেওয়ার জন্য) এবং কম সংখ্যক এই সমস্ত আল্লাহর বন্ধু, যাঁদেরকে আল্লাহ পছন্দ ও নির্বাচিত করেছেন।

এবং আমার সময়ে নিশ্চয়ই আমাদের জনাব শায়খ মোর্শেদ সাইয়েদ, অসীম ফয়েজ বিতরণকারী গাউতুল আজম আল্লাহর মাহবুব, জনাব শাহ্ মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর গৃহের বাতি, তাঁর বেলায়তের খনির মালিক, আওলিয়াদের বাদশাহ্, ছুফিগণের দলীল, এ জমানার কুতুবুল আকতার, জনাব শাহ্ মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (রাঃ)। ঐ মর্যাদা তাঁদের দুইজনের জন্য, সম্মান এবং গৌরবের মর্যাদা, তাঁদের উভয়ের সৌন্দর্য মাইজভাভারে উদিত যে সৌন্দর্য বিকশিত হয় ক্বলবের প্রান্তরে এবং প্রশস্ত স্থানে এই দিক দিয়ে ঐ নূরের সৌন্দর্য্যমন্ডলী দর্শন করার জন্য সময়ের অবস্থানকারীদের আকল উড়ে বেড়ায়, মানুষের মধ্যকার কলুষিত এবং নিম্ন শ্রেণীর কৃতজ্ঞভরে প্রচেষ্টা চালায় এবং তাঁদের উভয়ের মহান দরবারে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালায় এবং তাঁদের উভয়ের মহান মর্যাদায় অতীব আশ্রয়ী হিসেবে হাজির হয়, যেন মানুষেরা তাঁদের উভয় থেকে ফয়েজের বিচ্ছুরণ অর্জন করতে পারে, অতীব আশ্রয় সহকারে, যেন তাঁদের উভয়ের নিকট হতে ফয়েজ লাভ করতে পারে। যখন মানুষেরা অধ্যাত্ম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন, তখন

মোহাব্বতে বিচলিত হয়, তখনই মানুষেরা সিজ্জাদায়ে পতিত হয় কোন প্রকারের সন্দেহ ইংকার ছাড়া অত্যন্ত বিনয়ের সাথে।

সুতরাং তাঁদের উভয়ের সামনে সিজ্জাদা দেওয়া এটা তাঁদের উভয়ের আল্লাহর নূরে বিলীন হওয়ার রহস্যাদির মধ্যে একটা রহস্য এবং তারা উভয় যে, আল্লাহর মাহবুব তথা পরিপূর্ণ প্রেমাস্পদ এ রহস্যের বিবেচনায়।

এই সিজ্জাদাকে চামচিকা স্বভাবের লোক ছাড়া অন্যরা অস্বীকার করে না, যে চামচিকা স্বভাবের লোক এই নূরের আলোকছটা গ্রহণ করার শক্তি রাখে না। এরা সিজ্জাদা করার যোগ্যতাবিহীন তথা অযোগ্য। বিশ্ববিখ্যাত মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রাঃ) তার মছনবী শরীফে বলেন-অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহর নূর লাভ করেন, তখন সেই মানব ফেরেশতার সিজ্জাদা লাভে নির্বাচিত হয়। ফেরেশতাদের মত কেউ কেউ সিজ্জাদা করার যোগ্য হন, তখন ঐ ব্যক্তির জ্ঞান সন্দেহ থেকে দূর হয়।

মাওলানা বাহরুল উলুম উপরের ছন্দের ব্যাখ্যার বলেন যে, অর্থাৎ-মানুষ আল্লাহ থেকে নূর অর্জন করা এটা মারেকাত এবং ইলমের দিকে ইঙ্গিত করতেছে এবং ঐ ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু আছে তা সমস্ত নাম সমূহের সন্নিবেশকারী মহান সত্তা থেকে এবং তিনি কামেল তথা পূর্ণ মানবে পরিণত হয়ে ফেরেশতাদের সিজ্জাদা পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন বিবেচিত হন এবং এই সিজ্জাদা সম্মানী সিজ্জাদা।

দ্বিতীয় পংক্তির মধ্যে মাওলানা বলেন, এই মহামানব স্ব গোত্রীয় মানবের ও সিজ্জাদা পাওয়ার উপযুক্ত হন, যদি তাদের মানবীয় চরিত্র ফেরেশতা চরিত্রে পরিবর্তন হয়। তাফসীরে ফতহুল আজ্জিজের গ্রন্থকার বলেন, অনুধাবন করা উচিত যে, বিশাল প্রান্তর এই মহামানবদের পবিত্র বক্ষে অবস্থিত এবং ঐ প্রশস্ত বক্ষের ময়দানে অত্যন্ত প্রশস্ত দালান আছে এবং ঐ দালানে বার নসিমন তথা কাছারী আছে, এর কতক দুনিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর কোন কোন নসিমন তথা কাছারী ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। আর কোনটি দ্বীন ও দুনিয়ার উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। বার নম্বর নসিমন তথা কাছারীতে আছে 'মাহবুবে নাজীন' কপালের চাঁদ বরং কাবা সদৃশ, যেন আল্লাহর সৌন্দর্যের জালওয়ার আভা তাঁর পবিত্র শরীর মোবারকে প্রস্ফুটিত এবং তুর পর্বত সদৃশ যেন চিরন্তন প্রভুর নূর সমূহ তাঁর উপর আপতিত, আল্লাহর মাহবুবীয়তের শান তাঁর মধ্যে জালওয়া করেছেন। অগণিত অন্তর যেগুলি তাঁর ভালবাসার আকর্ষণে শিকারে পরিণত হল, তাঁর মহব্বতের ফাঁদে বন্দী হলেন এবং তাঁর জ্যোতি লাভের আশায় আত্মহারা হয়ে পড়েন। এটা সর্বোচ্চ মর্যাদা। কোন মানুষকে ইহা দান করা হয়, কিন্তু এই মহা মাহবুবের উসিলায় কোন কোন আউলিয়া তথা আল্লাহর বন্ধু লাভ করেন, তখন তিনিও মাহবুবীয়তের শান লাভ করে সৃষ্টি জগতে সজ্জাদা পাওয়ার যোগ্য পরিণত হয় এবং হাজারো প্রাণের প্রেমাস্পদে পরিণত হন, যেমন-হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এবং সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নেজাম উদ্দীন আউলিয়া (কঃ)। যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে এই ১২ (বার) নম্বর নসিমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে সমস্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার চিন্তা ভাবনা করা দরকার যে, এই সমস্ত নূরের আলোকছটা কোথা থেকে এসেছে, দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা দরকার যে, এই সমস্ত নূরানী আলোকছটা- নূরে মোহাম্মদী (দঃ)'র জ্যোতি। ডালে ডালে শাখায়-প্রশাখায় এই উপমায় যে, বিভিন্ন অন্তরে বিভিন্ন ছন্দ প্রত্যেক আবর্তে পৌছল।

কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের উল্লেখিত দুইজন সম্মানিত বুজুর্গ এবং আমাদের সম্মানিত দুইজন শায়খ, যাঁরা উভয়ে বিভূষিত যে, অবশ্যই তাঁরা উভয়ে পৌঁছেছেন চিরন্তন সৌন্দর্যের নূরের বিচ্ছুরণে এবং তাঁদের উভয়ের উপর ইহা পতিত, যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এতে করে তাঁরা ‘খাস’ ও ‘আম’ তথা বিশেষ এবং সাধারণ মানুষের মাহবুব তথা প্রেমাস্পদে পরিণত হল, নিজের পবিত্র বাণীর অর্থ উন্মুক্ত হল “মান্ রা আনী-ফাক্বাদ রা আল্ হাক্বা” যে আমাকে দেখল সে হক্ব তথা আল্লাহকে দেখল। মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়কে প্রেম এবং মহাব্বতের চোখে দেখল, তাঁরাই তাঁদের উভয়ের সম্মুখে সিজদায়ে পতিত হয়, যেন তাঁরা তাঁদের হাজত ও উদ্দেশ্যের ফয়েজ লাভ করে। সুতরাং তাঁদের উভয়ের সম্মুখে সজিদা করা তাঁদের সম্মানের উদ্দেশ্য যা শরীয়ত কিংবা বিবেকের রায়ে জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে না জায়েজ তথা অবৈধ নয়।

বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রাঃ) মসনবী শরীফে বলেন :-

আবলাহা তাজীমে মাস্জিদা মি কুনান্দ।

বর জায়ে আহলে দিল্ জদ্ মি কুনান্দ।

ইমজাজাস্ত ই হাকিকত ই খঁরান।

নিস্তে মাস্য়ুদ যুজ দরুনে সরওরান।

মাস্জিদি কু আনদোরুনে আওলিয়াস্ত।

সিজদাগাহে জুমলা আস্ত আঁ-জা খোদাস্ত।

তাদিলে মরদে খোদা নামদ বদরদ।

হিছে কাউমি রা খোদা রিস্ওয়ানা করদ।

কস্ দে গীরদ ইল্লাতি ইল্লাদ শাওদ।

কুফরে গীরদ কামেলী মিল্লাত শাওদ।

কারে পাক রা কিয়াস বর খোদ মগীর।

গরছে মানদ দর নোবেশতা শের ওয়াশীর।

শোদ উ বদল গ্যাশত ওয়া বদিল শাদশদ কারে উ।

লোতফে গাশতে ও নুরে শব্দ হার নারে উ।

অনুবাদঃ বেকুপগণ জাহেরী মসজিদের সম্মান করে, কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরে ব্যথা দেয়। হে গর্দভতুল্য মানুষ, ইহা মজাজি সমজিদ এবং অলীগণের অন্তরে যে মসজিদ আছে উহাই প্রকৃত মসজিদ। অলীগণের অন্তরে ব্যতীত কোথায়ও সজিদার স্থান নেই। অলীগণের অন্তর রাজ্যে যেই মসজিদ অবস্থিত উহা আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সজিদার স্থান যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বঙ্গুগণের অন্তরে আঘাত না হানে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা’লা কোন জাতিকে লাক্ষিত করেন নাই। কাফেরগণ নবীদের দৈহিক আকৃতি দেখে তাদের মত মনে করেছিল বিধায় নবীদের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছাই পোষণ করেছিল। রোগগ্রস্থগণ যা ধরে তা রোগাক্রান্তই হয়, আর কামেলীনগণ জাহেরীভাবে ধর্মের বিপরীত কোন কাজ করলেও হাকীকতান উহা ধর্মের অনুকূলে হয়। পাক পবিত্র বান্দাগণকে নিজের সাথে তুলনা করো না, যদিও ফার্সী ভাষায় ‘শের’ এবং ‘শের’ লিখতে একইরূপ, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ‘শের’ অর্থ বাঘ, যে মানুষ খায়, আর ‘শীর’ অর্থ দুগ্ধ যা মানুষে পান করে।

যে ব্যক্তি কামেল হয়, কামালিয়তের দরুণ তাঁর কাজ কারবারও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের মেহেরবাণী ও ফজলে করমের ধারা এভাবে বর্ষিত হতে থাকে যে, তাঁর দয়ার দৃষ্টিতে আগুন নূরে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

فحاصل ما في الرسالة ان سجود التحية إما ككراهة أو حرام أو مكروه أو مباح -
والظاهر انه ليس بكفر لا عقلاً ولا شرعاً وقد اتفق عليه جميع اهل الملة والذين
وحرمة ليس مطلقاً بل اذا كان بغرض نيل الدنيا فان لم يكن لغرض نيل الدنيا
بل كان لغرض نيل الدين كسجود المريد بين المشايخ فهو مثلاً فهو ليس
بحرام يستدل عليه بقوله عليه السلام ^{عليه السلام} لسيامان حين اراد ان يسجد له
لا ينبغي له خلق ان يسجد لاحد الا الله فانه يحتمل ان يكون معناه لا
ينبغي له خلق ان يسجد لاحد الا الله لا اجل الله لا اجل الله فيفهم منه ان سجود
الانسان للانسان ان كان لاجل الله فهو مما ينبغي ولا يخفى ان السجود
ان كان لغرض نيل الدين فهو لاجل الله فتأمل ومن قال انه مكروه فماده
انه مكروه صورته لا معنى قد ورد الحديث على ذلك المعنى ومن نظر الى
المعنى فقد قال انه مباح في الاصل ونطق نص القرآن بذلك فان
كان للجبابرة من السلاطين والمعنى لغناه ولينيل الدنيا فحرام لكن
لا من حيث ان السجود حرام بل من حيث ان التواضع للهؤلاء حرام
والا فهو باختيار الاصلية لا اثر فيه والعجب من صدر الدين الصوفي
في انه حمل قول جنابنا الشاه مولانا عبد العزيز قدس سره
في تفسيره انه نشر من فقه العزيز بجواز السجود لمثل غوث
الثقلين عبد القادر الجيلاني وسلطان المشايخ نظام الدين
اولياء على التمثيل كما صرح به في مناظرة فني وقال يكفر السجود لغير الله
مطلقاً بل العجب العجيب منه على انه قال في تلك المناظرة ان من
افتى بجواز سجود التحية فهو كافٍ لست شعري بما حمله على تكفير المفتي
به لعله اغتر على دعوى صفوته فلذلك صارت همته على ذلك القول
والا لهر يجتر عليه وليس قول جنابنا الشاه صاحب على وجه التمثيل بل
هو لتقرير جوازه لمن له ما ذكره من المقام ، قال احمد الله على ما وقفني
من تحريرو هذه الرسالة على وجه الاتمام وهو النوق والمعتبر

একাদশ পরিচ্ছেদ

সিদ্ধায়ে তাহিয়াহ সম্পর্কে সারসংক্ষেপ বর্ণনা

অনুবাদ : সংক্ষিপ্ত এ কিতাবে অর্জিত বিষয় হল যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ-এটা নয় কুফরী না হারাম এবং মাকরুহও নয় বরং মোবাহ বা জায়েজ।
প্রকাশ থাকে যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ শরীয়তের বিধান কিংবা আকলিভাবে কুফরী বিধান নয়। আর এ কথার উপর মযহাবের সব ইমাম ও ধর্ম বিশাদগণ একমত।
সজিদায়ে তাহিয়াহ মাতলক তথা সাধারণভাবে হারাম নয়, বরং যখন সজিদায়ে তাহিয়াহ দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় (তখন তা হারাম) আর যদি সজিদায়ে তাহিয়াহ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে না করে দ্বীন বরং ধর্ম লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, যেমন- পীর মাশায়েখীন কেরামদেরকে তাদের মুরীদেরা সজিদায়ে তাহিয়াহ করে থাকে। এটা হারাম নয়। নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র হাদীস শরীফ দ্বারা এর প্রমান উপস্থাপন করা যায়, হযরত নবী করিম (দঃ) হযরত সালমান (রাঃ) কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, যখন হযরত সালমান (রাঃ) নবী করিম (দঃ) কে সিজদা করতে চেয়েছিলেন, যা এই লা ইয়ামবাগী অর্থাৎ কোন সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা কর উচিত হবে না। এই হাদীস শরীফের লা ইয়ামবাগী এর অর্থ এইভাবে হওয়ার সম্ভাবনা রাখে যে, অর্থাৎ- কোন সৃষ্টি আল্লাহ বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্যকে সিজদা করা উচিত হবে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ মানুষকে সিজদা করা যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে এ জাতীয় সিজদায়ে তাহিয়াহ করা উচিত হবে। এ কথা অপ্রকাশ্য নয় যে, যদি সিজদায়ে তাহিয়াহ ধর্মের লাভের উদ্দেশ্যে হয়, সেটাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, চিন্তা করুন।
আর যিনি বলেন যে, সজিদায়ে তাহিয়াহ মাকরুহ। এ কথার উদ্দেশ্যে হল যে, বাহ্যিকভাবে সিজদায়ে তাহিয়াহ মাকরুহ, অর্থের দিক দিয়ে বিবেচনায় মাকরুহ নয়। পবিত্র হাদীসেও এ অর্থের দিকের কথা বর্ণিত হয়েছে।
আর যিনি সজিদা অর্থের দিকে নজর করেছেন তিনি অবশ্যই বলেন এই সজিদায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ মোবাহ তথা জায়েজ। পবিত্র কোরান শরীফের 'নস' ইহা বলে, কেননা অত্যাচারী রাজা বাদশাহগণকে সজিদা করা, বা ধনীদেবকে ধন পাওয়ার আশায় সজিদা করা বা দুনিয়ার কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে সজিদা করা হারাম, এই হিসাবে নয় যে, সজিদা করা হারাম বরং এই দিকে দিয়ে যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট তাওয়াজু তথা ইনকেসারী করা হারাম। ইহা ভিন্ন সিজদায়ে তাহিয়াহ মূলতঃ হারাম নয়। এই জাতীয় সিজদায়ে তাহিয়াহ করার মধ্যে কোন পাপ নেই। জনাব ছুফী হুদরুদ্দীন এর কথায় অবাক লাগে যে, তিনি আমাদের জনাব শাহ আবদুল আজীজ (কঃ) এর সূরা 'আলাম নাশরাহ' এর তাকসীর যা 'ফতহুল আজীজে' আছে যে, এই জাতীয় সজিদায়ে তাহিয়াহ জায়েজ বলে মেনে নিয়েছেন গাউছুস আজম আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এবং সুলতানুল মাশায়েখ নেজাম উদ্দিন আউলিয়া (কঃ) উদাহরণস্বরূপ এ জাতীয় মহান সত্ত্বাদের সিজদায়ে তাহিয়াহ করা জায়েজ, যা তিনি ফেনীর মোনাজেরায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেন, আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে সিজদা করা 'মাতলক' ভাবে কুফরী। বরং আশ্চর্য ঐ হুদরুদ্দীন সাহেবের কথায় তিনি মোনাজেরায় বলেন, যে ব্যক্তি সজিদায়ে তাহিয়াহ জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন, সে কাফের। হয়ত আমার কিতাব যা দ্বারা তিনি কুফরীর ফতোয়া মেনে নিয়েছেন, সম্ভবতঃ তিনি (হুদরুদ্দীন) সূফীর দাবী থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এই কারণে তার এই কথা বলার সাহস হল, নচেৎ তিনি এমন আচরণ করতেন না। জনাব শাহ আবদুল আজীজ (কঃ) এর কথা উদাহরণ স্বরূপ ছিল না, বরং যা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই সংক্ষিপ্ত কিতাব পূর্ণাঙ্গভাবে সমাপ্ত করার তৌফিক দান করেছেন এবং তিনিই তৌফিকদাতা এবং সাহায্যকারী।

تتمه

لما وقع في بعض الادعاء ان التغني مطلقا حرام اودت ان احوز فيه نبذا من الكلام ملخصا من اقوال الاجلة الكرام فاقول التغني هو ترويد الصوت باللحان في الكلام الموزون على ما تقتضيه المحسنات الموسيقية والصوت الحسن حسن قوله تعالى يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِلَّا مِمَّا يَشَاءُ الصَّوْتُ الْحَسَنُ - فترويد بالحنانه ايضا يكون حسنا فانه لا يجر في نفس ترويده ولا في الحانه لكن يشترط ان لا يكون القبيح في اصله يتغنى به من الكلام الموزون فان لم يكن فيه فحش وقبح ويجوز ان يجعله المريد على تحريك ما في قلبه من نار الشوق لِحُبِّ شَيْخِهِ وَحُبِّ اللَّهِ وَحُبِّ رَسُولِهِ فَالتَّغْنَى بِهِ يَثْمُرُ فِي الْقَلْبِ حَالَةٌ تَسْمَى وَجَدًا لَا يَطْلُمُ عَلَيْهَا الْآمَنُ لَذَوْقِ صَائِبٍ وَقَلْبُ ذَائِبٍ مِنْ نَارِ الْعَشَقِ وَحَوَاهُ وَلِمَا كَانَ لِلتَّغْنِيِّ تَأْثِيرٌ فِي الْقَلْبِ جَازٍ فِي الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ فَعَلِمَ مِنْ ذَلِكَ اَنْ التَّغْنَى بِكَلَامِ حَسَنِ مَوْزُونٍ اَيِّ بِكَلَامٍ لَا يَكُونُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْهَجْوِ وَالْفَحْشِ اَوْ عَلَى الْوَصْفِ لِمَرْأَةٍ مُعَيَّنَةٍ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَبْنًى لَا يَرْخُصُ لَهُ الشَّرْعُ يَكُونُ حَسَنًا سِوَاهُ كَانَ يَلْسَانٍ عَرَبِيٍّ اَوْ هِنْدِيٍّ اَوْ بُجَائِيٍّ - اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْاَلْسِنَةِ فَلَمَّا جَازَ التَّكَلُّمُ بِكُلِّ لِسَانٍ جَازَ التَّغْنَى بِهِ فَلَا يَمْنَعُ التَّغْنَى شَرْعًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ تَغْنِيًا بِلِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُوْجَدُ فِيهِ عَارِضٌ مِنَ الْعَوَارِضِ الْمَكْرُوهَةِ اَوِ الْمَحْرَمَةِ اَمَّا مِنْ جِهَةِ الزَّمَانِ بَانَ يَكُونُ رَقْتُ لِلصَّلَوَاتِ وَنَعْرُهَا اَوْ مِنْ جِهَةِ الْمَكَاتِ بَانَ يَكُونُ طَرِيقًا اَوْ سَوَاقًا وَنَحْوَهُ اَوْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ يَكُونُ

أو غير ذلك من الاستسنة فلما جاز التكم بكل لسان جاز التغنى به فلا يمنعه التغنى
 شرعاً من حيث أنه يوجد فيه عارض من المواضع المكروهة أو المحرمة
 إما من جهة الزمان بأن يكون طريفاً أو سوقاً ونحوه أو من جهة المعنى بأن يكون
 امرؤاً تخشياً فتنته أو فاسقاً قد جعل الفناعة وديد ناله وغيرها من العوارض
 المكروهة أو المحرمة فإن كان العارض محرماً فالغناء حرام وإن كان مكروهاً
 فالغناء مكروه فكذا فكذا الغناء وحرمته من حيث كون العارض مكروهاً أو حراماً
 لا بالنظر إلى نفسه بل هو على أصل إباحته عند خلوه عن ذلك العارض لكنه
 مع ذلك إن كان لتبليغ الشوق إلى لقاء الله وازدياد حبه أو كان على محبة
 رسول الله أو على حب الشيخ أو لغرض من الأغراض الدنيوية يكون مستحباً
 فخرج الكلام إلى أن الغناء إن لم يكن في أصل كلامه ما يهجن شرعاً مباح في نفسه
 وزد على إباحته من الأحاديث والآثار ما لا يحصى لكنه بالنظر إلى معنى في المعنى
 وغيره من العوارض قد يكون مكروهاً وقد يكون حراماً أما بالنظر إلى معنى في
 السامع قد يكون مستحباً وذلك إذا كان ممن يستمعه من التواجدين فإنه
 إنما يستمعه لتبليغ ما في قلبه من الشوق إلى لقاء الله وغير ذلك مما علمت
 والغناء وإن يطلق لغة على كل ما يتغنى به لكن في اصطلاح المتصرفين
 ما يستمعه أهل التواجد من المريدين يقال له السماع وكلاماً في السماع
 لأق مطلق الغناء والسماع حلال طيب عقلاً وشرعاً يشهد به قوله :-

قوله بل هو على أصل إباحته إلا لما كان الغناء الخالي عن المكروهات والمحرمات مباح في
 أصله والمباح يجوز أن يباشره كل أحد من أفراد الناس علم أن ما شرط بعض من
 الشروط السنية لسماعه كالزمان والمكان والاختار ونحوها إنما هو لفائدة المريدين
 لأنفس جواز السماع فإن الجواز ثابت من غير هذه الشروط فلذلك يجوز سماعه
 في أوقات السرور إن كان السرور مباحاً كما في البدائع والكافي والفرقة وغيرها من
 كتب الفقه فعلم أن تلك الشروط ليست شرط جواز السماع بل شرط صحة السماع
 لفائدة المريدين

أُحِلَّ لَكُمْ الطِّيبَاتُ قَدْ اسْتَفِيدَ حِلَّتْهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ أَسْمِعُ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ الرَّافِدَةُ خَاتَمُ -
المحدثين مولانا عبد الحق الدهلوي في مدارج النبوة وغيره

من ينكر هذا السماع فهو بليد جامد قاسي القلب ليس لذوق
سليم وقد نقل عن بعض الاجلاء ان هذا السماع مسنون كما في اشعة
اللمعات وقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْإِحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْمَانِعُونَ
عَلَى حُرْمَةِ الْغَنَاءِ لَوْ سَلِمَتْ صَحَّةُ اسْتِدْلَالِهِمْ لَكُنْ لَا سَلَمَ أَنَّهَا لِتَحْرِيمِ هَذَا السَّمَاعِ
فَإِنَّ الْغَنَاءَ مِنْ أَوْصَافِ الْمَغْنَى وَالسَّمَاعَ مِنْ أَوْصَافِ السَّمْعِ فَحُرْمَةُ الْغَنَاءِ
لَمَعْنَى فِي الْمَغْنَى أَوْ لِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَاضِ لَا يُلْزَمُ أَنْ يَحْرُمَ مَا يَحِلُّ بَلْ يَسْتَحِبُّ
لِلسَّمَاعِ لِمَعْنَى فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَا بَلْ لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ لِهَوِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا السَّمَاعِ فَإِنَّهُ
أَنَّمَا يَكُونُ لِلْإِضْلَالِ هُنَّ سَبِيلُ اللَّهِ لِبَعْضِ مِنَ النَّاسِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ
التَّبَعِيَّةِ وَلَا مَ الْغَايَةِ كَمَا فِي الْأَحْيَاءِ بِخِلَافِ هَذَا السَّمَاعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلدَّعْوَةِ
إِلَيْهِ هَكَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْإِحَادِيثِ وَالْآثَارِ عَلَى حُرْمَةِ الْغَنَاءِ وَكَرَاهَتِهِ يَكُونُ
مَحْمُولًا عَلَى الْغَنَاءِ الَّذِي يَكُونُ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا لِمَعْنَى فِي الْمَغْنَى أَوْ لِعَارِضٍ مِنَ
الْعَوَاضِ لَا عَلَى الْمَغْنَى الَّذِي يَكُونُ لِأَغْرَاضٍ صَحِيحَةٍ وَلَا عَلَى السَّمَاعِ الَّذِي
يَسْمَعُهُ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ الْمُرِيدِينَ وَالسَّمَاعِ لَهُمْ مِنْ أَهْمِ الْأُمُورِ وَمَا فِيهِ
لَهُمْ مِنَ الْفَوَائِدِ لَا يَسْعَهُ هَذَا الْمُخْتَصَرُ وَمَنْ يَرِيدُ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ
أَنْ يَطَّلَعَ كَتَبَ التَّصَوُّفِ وَالْفَقْهِ لَا سِيَّمَا أَحْيَاءَ الْعُلُومِ لِلْغُلَى وَالْعَوَافِ
لِلشَّهِرِ وَرَدِي وَرَدِ الْمُخْتَارِ ابْنِ الْعَابِدِينَ وَاشْعَةَ اللَّمَعَاتِ لِمَوْلَانَا
عَبْدِ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ فَلَمَّا عَلِمْتُ حُكْمَ الْغَنَاءِ وَ

السماع فاسمع حكم الآتية من المزامير والطبول وغيرها قد صرح المحققون من علماء المذهب أنها ليست محرومة لعينها بل معنى كونها حراماً لعينها كما في الجلد الثالث من رد المحتار فلو حكم بحرمته ضربها إنما يحكم لمعنى في غيرها على هذا لو كان الله وحلاً لا يكون ضربها حلاً ولا فلا فلذلك قال في الجلد الخامس من رد المحتار لا بأس بضرب الطبل في العرس كذا في الاجناس لكن ضربها عند رقة قلوب المتواجدين في محل تواجدهم بالسماع لتحريك ما في قلوبهم من الشوق إلى لقاء الله ونار محبه بما يستحسن عقلاً وشرعاً ومن لا يحرك السماع سواء كان بالمزامير أو بدونها لأحياء أو لروح له ملخصاً من اقوال الاكابر العشقي نار يحترق باحراقه ووقود احراقه النغم بالمزامير أو بدونها كما يحترق نار حجر يضرب حجر عليه كذلك يشتعل نار قلوب العاشقين بسماع الاصوات الحسنه الموزونه بالالحان الرقيق ولو كان مع الآتية من المزامير والطبول يزود ادهجاً وكنت منكراً لذكر الامر قبل مراجعتي الى حضرت مرشدنا الموصوف فان قلبي كان خالياً عن معنى العشق وقد انكرت على من كان يسمعه من مريده انكاراً شديداً لكن كنت متعجباً بالهم لها يسوقه بغاية الشغف ويصرفون رقتهم فيه وتحركون عند سماعه وهم عقلاء بل كثير من العلماء فيهم ثم بعد ذلك لما وفقني الله للدخول في سلك مريديه ونظر الى بنظر العناية فقد انكشف في قلبي حقيقة حالهم وحصل لي علم ما ودعه الله من السرف الاوتار وما في السماع من الفوائد للمريدين فالحمد لله على ذلك فلا ينبغي لارباب الظواهر من المنكرين ان يمدوا اعناق انكارهم في امر السالكين في طريق الحق باغترارهم على ما علموا من الجواز والاجواز من ظواهر الاحكام وحقيقه كل علم انما يتكشف على سالكيه ومن لم يبدق شيئاً لم يدرك انه مؤرجل فلا يليق ليهن ان يكونوا من المنكرين ومن

له يؤمن بها ذكرنا فهو غير مكابر لا يفهم كلام الاكابر وما قيل ان الترجيح لحرمة
 الغناء كما وقع في التفسير الاحمدى لا يضرنا فانا لا ندعى حلة الغناء على
 الاطلاق حتى يكون الترجيح لدليل حرمة بل دليل حرمة محمول على
 ما فيه عارض من عوارض الحرمة فانها بالنظر الى العارض لا بالنظر الى اصل
 ذاته،

قَدْ تَمَّ الْكِتَابُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَهَآبُهُ

قد يحدث في المستمع في حال سماعه شوق الى ما يذكرك فيثب من مكانه ويفعل
 فعل من يريد ذهابه الى محبوبه فاذا علم ان لا سبيل له اليه كرر الوثوب مرارا
 ويدور وانا متعابا وقد يكون ذلك عن تودد يظهر في خلال السماع بين الجسد
 والروح وذلك لان الجسد سفلا في خلق من التراب والروح روحانية خلق
 من الفرح فالروح تعلو الى فوق الى مجلها والجسد نزل الى محله الى ان يقع السكون
 وقد يكون ذلك منهم على سبيل التفرح والتفريح والتطالب في حال السماع
 فليس به حظور الا انه ليس من صفات المحققين (الى قوله) قيل في تفسير
 قوله تعالى يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ قيل هو الصوت الحسن وقال بعضهم
 ان الصوت الطيب لا يدخل في القلب شيئا ولكن يحرك ما في القلب ثم ان
 اهل السماع يعقلون في حال سماعهم فمنهم من يغلب عليه في حال سماعه
 الخوف او الحزن او الشوق فيؤديه الى البكاء والالين والشققة وتخريق
 الثياب والغيبة والاضطراب ومنهم من يغلب عليه الرجاء والفرح و
 الاستبشار فيؤديه الى الطرب والرقص والتصفيق كما روى ان داود
 عليه السلام استقبل السكينة بالرقص وقالت له زوجته اترقص وانت
 بنى فقال لها انت محكمين على قلبى اذهب وانت طالق وقوله السكينة
 فعيلة من السكون قيل هي شئ لها رأسان ووجهان وجه الانسان وقيل

لها رأس كراس الهرة وذنب كذنبها صراخ كصراخها وكان لها جناحان قال -
 محب الحق والدين واجمعوا على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم
 يخل بالمعنى لقوله عليه ^{الصلوة} والسلام حسنوا القرآن بأصواتكم ولقوله عليه ^{الصلوة}
 والسلام ان لكل شئ حلية وحلية القرآن الصوت الحسن ويكرهون
 القراءة بالالحن والأصوات الممدودة وأما القصائد والأشعار فقد سئل
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال هو كلام فحسنة حسن
 وقبيحة قبيح

كتبه

احقر الخدام للدريار المنيف

في المنجبهندار الشريف المدعو يامين الحق بن

مولانا عبد الكريم بواها الله في جنات النعيم

الجاتجامي، ثم الفرهاد ابادي، بنغلاديشي

পরিশিষ্ট

“হেমাহ” বা ধর্মীয় সংগীত বাদ্যযন্ত্র সহকারে শ্রবণ
করার শরীয়ত সম্পর্কিত বিধানের বর্ণনা

অনুবাদ : কতক সাধারণ লোকের ধারণা যে গানগীতি মতলক হারাম অর্থাৎ সকল অবস্থায় সর্বপ্রকার সামা বা গান গীতি হারাম। তাই তাদের দ্রাস্ত ধারণা নিরসনকল্পে এ ব্যাপারে আমি সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য পেশ করলাম। আমি বলছি, গান হলো আওয়াজকে সুরের সাহায্যে ছন্দে রূপান্তরিত করা, আর অভিজ্ঞ সুর শিল্পীদের অভিমতও তাই। উত্তম আওয়াজ উত্তমই যেমন-আল্লাহপাক বলেন, “ইয়াজিদু ফিল খালকে মা ইয়াশাও” অর্থাৎ আল্লাহ বৃদ্ধি করেন সৃষ্টির মধ্যে যা তিনি চান। এর ব্যাখ্যায় তাফহিরকারকগণ সুন্দর বা উত্তম আওয়াজকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং উত্তম আওয়াজকে সুরের দ্বারা রূপান্তরিত করাও উত্তম। কেননা উত্তম আওয়াজকে সুরের মাধ্যমে অন্যভাবে রূপান্তরিত করা মন্দ নয়। কিছু শর্ত হলো আওয়াজ বা সুর যেন মূলতঃ মন্দ বা খারাপ না হয়, যা ছন্দের আকারে গান হিসাবে পরিবেশিত হয় এবং গানের মধ্যে যেন অশ্লীল বা মন্দ জাতীয় কিছু না থাকে। অতএব গান শ্রবণকারী আশেক ভক্ত যাদের অন্তরে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত তাদের জন্য পীরের ভালবাসা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের ভালবাসার প্রেক্ষিতে নৃত্য করা জায়েজ। কেননা গান শ্রবণের দ্বারা তাঁদের হাল বা জজবা পরিলক্ষিত হয়, যাকে সূফী পরিভাষায় ‘ওয়াজদ’ বলা হয়। আর এ হাল বা জজবা তাঁদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, যারা জউক বা স্বাদ আশ্বাদনকারী এবং আল্লাহর প্রেমাগ্নি দ্বারা যাদের অন্তরে ও খেয়াল উর্ধ্বগামী হয়। তাঁরাই এ হাল বা জজবার অধিকারী হয়। অতএব বুঝা গেল গান-গীতি দ্বারা অন্তরে তাছির প্রভাব বিস্তার করে, আর এ জাতীয় তাছিরকারী গান গীতকে হাদিস শরীফে বৈধ বা জায়েজ ঘোষিত হয়েছে যেমন-হাদিস শরীফ “মানলাম ইতা গান্না বিল কোরআন ফালাইছা মিন্না” অর্থাৎ যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনকে সুর বা লাহানের সাথে তেলাওয়াত করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং উক্ত হাদিস শরীফের আলোকে বুঝা গেল যে, গান বা গীত সুন্দর বাক্যের ছন্দ দ্বারা গাওয়া জায়েজ। আর এ স্থলে বাক্য বলতে ঐ সমস্ত বাক্যকে বুঝায়, যাতে অশ্লীল বা খারাপ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ বা বাক্য নির্দিষ্ট কোন নারীর প্রশংসায় গীত না হয় অথবা অন্যান্য কথা যা শরীয়ত অনুমোদিত নহে। উল্লেখিত প্রকার ব্যতীত অন্যান্য ভাল বাক্য বা সুন্দর কথা উত্তম হিসেবে বিবেচিত, আরবী, হিন্দী, বাংলা বা অন্যান্য যে কোন ভাষায় হউক না কেন? সুতরাং যে কোন ভাষায় কথা বলা যেমন- জায়েজ, তেমনি ঐ সমস্ত ভাষায় গান গীতি গাওয়াও বৈধ বা জায়েজ। সুতরাং শরীয়তে মোহাম্মদী (দঃ) মোতাবেক গান বা গীত নিষিদ্ধ নয়-এ হিসেবে যেন গানের ছন্দে বা কলিতে মাকরুহাত তথা অপছন্দনীয় এবং মোহরেমাত তথা হারাম প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া না যায়। সময় বা কালের দিক দিয়ে সংগীত রাস্তা কিংবা বাজার বা অন্য কোন অযাচিত স্থানে পরিবেশন করা বা গাওয়া অথবা গানের ভাবার্থের দিক দিয়ে যেন গানের ভাবার্থে এমন আলোচনা থাকে যা দ্বারা ফ্যাসাদের ভয় ও ধর্মের প্রতি অনাসক্ততা পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত সংগীত বা গান গীত অভ্যাসগত গান হিসেবে পরিগণিত। এছাড়া অন্যান্য মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কার্যাদির প্রাসঙ্গিকতা থাকে, অথবা গানের পরিবেশনগত সময় ও স্থান বা ভাবার্থে যদি হারাম প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যায় তাহলে এ জাতীয় গান গীত শরীয়তে হারাম হিসেবে বিবেচিত। আর যদি ‘মাকরুহ’ প্রাসঙ্গিকতা থাকে তাহলে গানও ‘মাকরুহ’। সুতরাং গান গীত মাকরুহ বা হারাম হওয়া তার প্রাসঙ্গিকতা দ্বারা নির্ধারিত। নিছক গান

অস্তিত্বের দিক দিয়ে মাকরুহ বা হারাম নহে। বরং গান মূলতঃ জায়েজ বা বৈধ; যখন তাহা মাকরুহ বা হারাম প্রাসঙ্গিকতা থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু এ দিক দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্র আল্লাহ তা'আলার 'লেকা' বা সাক্ষাতের অতীব আগ্রহ নিয়ে বা আল্লাহর ভালবাসা বৃদ্ধিকল্পে, অথবা রাসূলে পাক (দঃ)-এর মোহাব্বতে তথা ভালবাসার উদ্দেশ্যে বা নিজ গীর তথা মোরশেদের ভালবাসার নিমিত্তে বা ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে সঙ্গীত, গান গীত গায় তা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মোস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত।

উল্লেখিত তথ্যের আলোকে সিদ্ধান্ত নির্ণীত হলো যে, সঙ্গীত, গান বা গীত যদি মূলতঃ বাক্যের দিক দিয়ে শরীয়ত সম্মত হয় তাহলে এ জাতীয় গান-গীত মূলত জায়েজ। গান-গীত জায়েজ হওয়ার পক্ষে অনেক গুলি হাদিস শরীফ রসূলে পাক (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু গানের ভাষাগত ভাবার্থের ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতা হেতুতে কখনো গান "মাকরুহ" তথা অপছন্দনীয় হিসেবে পরিগণিত হয়, আবার কখনো 'হারাম' হিসেবে বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে শ্রোতার দিক দিয়ে গান 'মোস্তাহাব' তথা পছন্দনীয় হয়, আর ইহা তখন হয় যখন শ্রোতা "ওয়াজদ" তথা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের নিমিত্তে শ্রবণ করে। আর উপরন্তু শ্রোতা তা শ্রবণ করে তাঁর অন্তর বা কুলবে প্রজ্বলিত আগ্রহ যা তাকে আল্লাহ্‌তালার 'লেকা' বা সাক্ষাতের দিকে ধাবিত করে-ও অন্যান্যভাবে যা উপরে জানানো হলো।

টীকা : "গান মূলতঃ জায়েজ", যখন গান গীত মাকরুহ ও হারাম প্রাসঙ্গিকতা থেকে মুক্ত থাকবে, তখনই শুধু গান জায়েজ। আর মোবাহ জিনিস বা আচার আচরণ সর্বদায় যে কোন মানুষের জন্যই জায়েজ। অন্যদিকে 'সামা' এর জন্য যে ৬ (ছয়)টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে যেমন (১) উপযুক্ত সময় (২) যথাযথ স্থান (৩) ইখওয়ান তথা ত্বরিকতপছী ভাই ইত্যাদি শুধুমাত্র মুরিদানদের ফায়দা বা লাভের উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে কেবলমাত্র 'সামা' জায়েজ হওয়ার জন্য নহে; কেননা এ ৬টি শর্ত ছাড়াও 'সামা' জায়েজ হওয়া সাব্যস্তকৃত। আর এতে করে খুশীর সময় সামা করা জায়েজ। আর অন্য দিকে আনন্দ বা খুশী করা শরীয়তে মোবাহ বা জায়েজ যা বাদায়ে, কাফি, খাজানা ও অন্যান্য ফিকাহ এর কিতাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং জানা গেল যে, ঐ ৬টি শর্ত 'সামা' জায়েজ হওয়ার জন্য নহে এবং বিশুদ্ধ 'সামা' যা মুরিদানদের জন্য উপকারী এ জাতীয় 'সামার জন্য শর্ত।

আর "গেনা" তথা গান সাধারণতঃ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গায়ক যে বাক্য সুরের সাহায্য উচ্চারিত করে। কিন্তু সুফিয়ায়ে কেরামগণের পরিভাষায় গান বলতে বুঝায় "আহলে তাওয়াজুদ" বা আল্লাহর সান্নিধ্য অন্বেষণকারী মুরিদান তথা ঐদিকে এরা দা বা ইচ্ছা পোষণকারীগণের পক্ষে সুরের সাহায্য শ্রবণ করা; আর এটাকে 'সামা' নামে অভিহিত করা হয়। আর আমাদের আলোচনা 'সামা' সম্পর্কে শুধুমাত্র সাধারণ 'গেনা' বা গান সম্পর্কিত নয়। উপরন্তু 'সামা' হালাল, পবিত্র, যুক্তিগত ও শরীয়ত সম্মত যা আল্লাহ পাকের কলাম দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহর বাণী "উহল্লা লা কুমুত্ তইয়িবাত" অর্থাৎ তোমাদের জন্য পবিত্র জিনিস সমূহ হালাল করা হয়েছে। অন্যদিকে-তা হালালের পক্ষে আল্লাহর বাণীঃ "ইন্নাল্লাজিনা ইয়াহতামেউনাল কাউলা ফা ইয়াত্তাবেউনা আহছানাছ" অর্থাৎ যারা বাক্য বা কথা-বার্তা শ্রবণ করে, সুতরাং তারা উহা হতে উত্তম ও সুন্দর বাক্যের অনুসরণ করে। আল্লাহর বাণী "ওয়া ইজা ছামেউ মা উন্যেলা ইলার রাসূলে তারা আইউনুহম তাকিদু মিনাদ দময়ে মিম্মা আরায়ু মিনাল্ হক্কে" অর্থাৎ ঈমানদারগণ যখন রাসূলে (দঃ) এর উপর নাখিল হওয়া আয়াত সমূহ শ্রবণ করে; হে রাসূল (দঃ)

তখন আপনি তাদের চক্ষুগুলিকে অশ্রুসিক্ত দেখবেন, যা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পেরেছেন।

‘সামা’ এর ব্যাপারে খাতেমুল মোহাদ্দেসীন মৌলানা আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) মাদারাজুন নবুওয়াত কিতাবে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং অন্যান্য কিতাবেও তা বিদ্যমান। যে ব্যক্তি এ ‘সামা’ কে অস্বীকার করে তার তুলনা জমট পাথরতুল্য নিষ্ঠুর হৃদয়ের অধিকারী; যার মধ্যে “জাউকে সলীম” তথা একাগ্রচিত্তের প্রেরণা নাই।

কতক সম্মানিত বুজর্গ ব্যক্তিবর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ জাতীয় বিশুদ্ধ ‘সামা’ মাসনুন তথা নবী করিম (দঃ)-এর সূনাত যা “আশায়াতুল লোময়াত শরহে মিশকাত” এ লিপিবদ্ধ আছে এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “ওয়া মিনা”ন নামে মাই ইয়াশতারী লাহওয়াল হাদীস লে ইউদ্দেল্লা আন্ ছাবিলিল্লাহে” অর্থাৎ কতক লোক যারা খেল তামাসার (লাহওয়াল হাদীস) কথা-বার্তা ক্রয় করে লয় যেন খোদার পথ হতে মানুষকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করে। এছাড়া অন্যান্য আয়াতে কারীমা সমূহ ও হাদীস শরীফ সমূহ দ্বারা ‘সামা’ তথা গান গীতকে অস্বীকারকারীগণ হারাম বলে দলিল উপস্থাপন করে। যদি গানগীতি অস্বীকারকারীগণের দলিলাদি বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নেওয়া হয় কিন্তু তাদের পেশকৃত দলিলাদি সমূহ ‘সামা’ হারাম হওয়ার পক্ষে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, গান-গীত হচ্ছে গায়কের গুণ; পক্ষান্তরে ‘সামা’ হচ্ছে সামেহ তথা শ্রোতার গুণ। সুতরাং গেনা বা গান হারাম হওয়া গানের অর্থের বিবেচনায় অথবা প্রাসঙ্গিকতার সংশ্লিষ্টতায়। আর ইহা হালালকে হারাম করার আবশ্যকতা রাখে না বরং শ্রোতার জন্য তা মোস্তাহাব তথা পছন্দনীয় যা অর্থের দিক দিয়ে বিবেচিত যা উপরে আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং “লাহওয়াল হাদীস” তথা খেল তামাসার কথা-বার্তাকে সাধারণত ‘সামা বুঝা ও নির্নীত করা জায়েজ হবে না, উপরন্তু আল্লাহর রাস্তা থেকে পথ বিচ্যুতি ঘটে কতক সংখ্যক মানুষের যা মিন তাবিজিয়া ও লামে গায়াত দ্বারা বুঝায় যা এহইয়াউল উলুমুদীন কিতাবে বর্ণিত আছে-যা বিশুদ্ধ সামার সম্পর্কে নহে।

অন্যদিকে সাধারণ গান গীতি এর উদ্দেশ্য গায়কের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। এভাবে পবিত্র হাদীস শরীফে অনেকগুলি হাদীস গান মাকরুহ ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। তবে ঐ হাদিস সমূহ হারাম ও মাকরুহ গান গীতির ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে-এ অর্থে যে গানের ভাবার্থ বিবেচনায় অথবা প্রাসঙ্গিকতার সংশ্লিষ্টতায়। শুধুমাত্র গানের উপর প্রযোজ্য নহে। যে সকল গান গীতি বিশুদ্ধ ও শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় আর এ জাতীয় গান শ্রবণকারীর জন্য ঐ হাদীস সমূহ প্রযোজ্য হবে না। উপরন্তু এ জাতীয় বিশুদ্ধ গান-গীত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আকাংখী মুরীদান বা ব্যক্তিবর্গ শ্রবণ করেন। আর আল্লাহ পাক, রাসূলে করিম (দঃ) ও কামেল পীর মোরশেদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির গান গীতি শ্রবণ করা আশেক ভক্তদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এ জাতীয় ‘সামা’ তথা সংগীতের মধ্যে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য অনেক উপকারিতা বা ফায়দা রয়েছে যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা দূরূহ। আর যে ব্যক্তি ব্যাপকভাবে সাধারণ গান ও সামার ব্যাপারে জানতে আগ্রহী, তিনি যেন তাছাউফের কিতাব সমূহে এবং ফিক্‌হর পুস্তক সমূহ পাঠ করেন। বিশেষ করে ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) রচিত এহইয়াউল উলুমুদীন, ইমাম সোহরাওয়ার্দী (রাঃ) রচিত আলা-আওয়ারেফ, ইমাম ইবনে আবেদীন (রাঃ) রচিত রদ্দুল মোহতার এবং মৌলানা আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রাঃ) রচিত আশায়াতুল লোময়াত এবং অন্যান্য সামা সম্পর্কীয় কিতাব সমূহ পাঠ করেন।

সুতরাং যখন ‘গেনা’ তথা গান ও ছেমার হুকুম সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, অতঃপর

এখন বাদ্য যন্ত্রাদি যেমন মাজামির তথা বাদ্য, তাবুল তথা ঢোলক ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে শুনুন। মুসলিম বিশ্বের সব মাযহাবের মোহাক্কেক আলেমগণ এ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ‘ছেমা’ ও গান বাজনার যাবতীয় যন্ত্র বা উপকরণাদী ইলমে ফিক্‌হর উসূল মতে হরমতে লি জাতিহি বা মূলতঃ হারাম নহে। আর উহা মূলেতে হারাম হওয়ার কোন অর্থই হতে পারে না যা ‘রদ্দুল মোহতার’ নামক বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ার কিতাবের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। যদি ইহা বাজানোকে হারাম বলা হয় তা ভুল হবে; কেননা শুধু বাজানো হারাম নহে বরং ছেমার অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে তা বাজানো হালাল অথবা হারামের হুকুম দিতে হবে। সে হিসেবে অবশ্যই বলতে হবে, যদি যেই ‘লাহাব’ বা গান হালাল, উহার যন্ত্রাদি তথা উপকরণাদি বাজানোও হালাল; আর যদি ইহা হারাম হয় উহার যন্ত্রাদি তথা উপকরণাদি বাজানোও হারাম। এ কারণে রদ্দুল মোহতার নামক কিতাবের ৫ম খণ্ডে বর্ণনা করেছেন যে ওরসে তবলা বাজানো কোন ক্ষতিকর বিষয় নয়। আল্ আজহার কিতাব এ মধ্যেও তা বিদ্যমান আছে। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রাদী, ‘মোতাওয়াজীন তথা খোদা প্রেমে আসক্ত ব্যক্তি কুলব নবম অবস্থায় বাজানো এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের তাওয়াজুদের বা আত্মাহর সান্নিধ্যে স্থানে বাজানো ও শ্রবণের দ্বারা তাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত আত্মাহর ‘লেকা’ তথা সাক্ষাতের আশ্রয় ও মোহাক্কতের আশ্রয় দ্বারা তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয় যা যুক্তিগত ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মোস্তাহছান তথা উত্তম। আর ‘সামার’ দ্বারা যে ব্যক্তির অন্তর প্রকম্পিত হয় না-তা বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা হউক বা অন্য কিছুর দ্বারা হউক, তার কুলব প্রাণহীন যা আকাবেরীনে ছুকীয়ায়ে কেরামগণের পবিত্র বাণী থেকে চয়নকৃত। ইশক তথা প্রেম অগ্নিস্বরূপ যা দ্বারা দক্ষ করে প্রজ্জ্বলিত করে জ্বলনের শক্তি দ্বারা “নগম” যন্ত্রাদী অথবা অন্য কোন উপায়ে যেমনিভাবে পাথরের উপর রেখে ঘর্ষণ করে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়, অনুরূপভাবে খোদা প্রেমিকদের হৃদয়ে সুমধুর হৃদের উত্তম সুরের আওয়াজ বা সামা শ্রবণে প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়-যদিও যন্ত্রাদি যেমন মাজামীর, তাবুল ইত্যাদির সাহায্য হয়। ইহার দ্বারা তাঁদের বিচ্ছেদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়।

(পরিশেষে লেখক মুফতীয়ে আজম গাউছে জমান আত্মামা শাহ্ সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রাঃ) বলেন) “ওয়া কুনতু মুনকিরাণ লি জালিকাল আমির ক্বাবলা মুরাজি আতি ইলা হায়রাতি মুরশিদিনাল মাউছুফী ফা ইন্না ক্বালবী কানা খালিয়ান আন্ মা’নাল ইশকি” অর্থাৎ- “আমি নিজেও ছেমার বিরোধী ছিলাম হযরত গাউছুল আজম মাওলানা শাহ্ ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভান্ডারীর সংস্পর্শে যাওয়ার পূর্বে; তখন আমার অন্তর আত্মাহর প্রেম থেকে শূণ্য ছিল।” হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (রাঃ) এর শিষ্যরা যারা ছেমা শ্রবণ করতো তাঁদেরও আমি প্রচন্ড বিরোধী ছিলাম কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর শিষ্যরা যখন ঐ ছেমা তথা গানগীত একাত্মচিতে শ্রবণ করে তখন তাঁদের অন্তর উহাতে বিগলিত হয়ে যায় এবং ঐ গান গীত শ্রবণের সময় তাঁদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং তাঁরা জ্ঞানী গুণী বটে বরং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ আলেমও ছিলেন। অতঃপর আত্মাহপাক আমাকে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) এর ত্বরীকার মুরীদ হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আর তিনি আমার দিকে “নজরুল এনায়াত” তথা দয়ার দৃষ্টি করেছেন, তদ্বারা আমার অন্তরে ঐ সমস্ত মুরীদানদের প্রকৃত অবস্থা খুলে গেল, আর এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান অর্জিত হল; যে জ্ঞানকে মহান আত্মাহ্ রাক্বুল আলামীন তাঁর অভেদ্য রহস্যাদি হতে আমানত হিসেবে দান করেছেন।

আর ছেমা তথা বিস্তৃত গান গীতের মধ্যে আশেক মুরীদানদের জন্য অসংখ্য ফায়দা বা

উপকারীতা রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে 'সামা'র মত মূল্যবান দৌলত দান করেছেন। উপরন্তু জাহেরা আলেমদের মধ্যে যারা 'সামা'র বিরুদ্ধাচরণ করেন তাদের উচিত হবে না যে, সামা এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধ গড়ে তোলা, আর সত্য পথের পথিকদের ব্যাপারে অহেতুক বিরোধীতা করা। ঐ সমস্ত জাহেরা আলেমগণ যেন 'ইজ্জু লা ইজ্জু' এর মাসআলা দ্বারা এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন। কেননা সমস্ত ইলমের হাকিকত আল্লাহতা'লা তাঁর পথের অগ্রসরমানদের অন্তরে খুলে দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ না করে, সে ঐ বস্তু সম্পর্কে অবগত হবে না যে উহা কি তিক্ত না মিষ্ট। সুতরাং আরবাবে জাওয়াহের তথা জাহেরা আলেমদের সামার বিরুদ্ধবাদী হওয়া উচিত হবে না।

আমি লিখক হিসাবে যা কিছু উল্লেখ করেছি, তার উপর যদি কেউ বিশ্বাস না করে সে অবশ্যই বড় ধরনের নির্বোধ, যে আকাবেরানীগণের কালাম তথা কথা বুঝতে পারে না। যারা বলেন, শরীয়ত মোতাবেক গান হারাম হওয়ার দলিল প্রাধান্য পেয়েছে; যা তাফসীরুল আহমদী এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। এতে 'সামা' তথা বিশুদ্ধ গান গীত শ্রবণকারীদের কোন ক্ষতির কারণ নেই। কারণ আমরা 'মতলক' গান হালাল হওয়ার দাবী করি না; তাই হারামের দলিলের প্রাধান্যতা নির্দোষ গানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না। অন্যদিকে গান হারামের দলিল গানের হারাম হওয়া প্রাসঙ্গিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে গানের আসল তথা সত্বাগত দিক থেকে নয়।

অনুবাদঃ 'সেমাহ' বা ধর্মীয় সংগীত শ্রবণের ব্যাপারে বিভিন্ন কথাবার্তা রয়েছে। যে 'সেমাহ' বা ধর্মীয় সংগীত 'মতলক' তথা আল্লাহর জিকিরের প্রচণ্ড আসক্তি দেখা দেয়, তখন 'সেমাহ' শ্রবণকারী 'রুহানীয়াতে' কুলবের স্থানের উন্নতিতে উন্নতি দেখা দেয় এবং 'সেমাহ' শ্রবণকারী এমন সব কাজ করে যার উদ্দেশ্য পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহর সান্নিধ্যের দিকে যাওয়া। উপরন্তু জানা যায় যে, যখন 'সেমাহকারী' বার বার আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মনোযোগ ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না এবং সান্নিধ্য লাভের জন্য বারংবার পরম বন্ধুর সমীপে বিভিন্নভাবে পরিভ্রমণ করে। আর এই 'সেমাহ' এর ব্যাপারে মতানৈক্যতা পরিলক্ষিত হয়। 'সেমাহ' শ্রবণ মধ্যবর্তী অবস্থায় যা প্রকাশ পায় শারিরীক ও রুহানীভাবে, আর ইহা যা শরীর ও আত্মায় প্রভাব ফেলে, কেননা শরীর নিম্ন মানের মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর 'রুহ' হচ্ছে রুহানীয়াত যা, 'ফারাহ' বা অনাবিল শান্তির ধারা থেকে সৃজিত। উপরন্তু 'রুহ' জগতের দিকে ধাবিত হয় এবং 'জিসিম' তথা শরীর ও তার স্থানের দিকে ঝুকে পড়ে, যাতে করে 'ইতমিনাল' তথা স্থায়মান আর 'সেমাহকারীদের' থেকে 'সেমাহ' এর অবস্থায় আনন্দ আহলাদ এবং আল্লাহর অশ্বেষনের অগ্রহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যদের মাঝে ইহা প্রতিবেদিত হয় না।

আল্লাহতা'লার বাণী অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা (সার্বিক কল্যাণ) বৃদ্ধি করেন। কোম কোম মোফাছেরীন বলেন, (কল্যাণ) বৃদ্ধি করা অর্থ হচ্ছে উত্তম আওয়াজ বা স্বর, আবার কেউ কেউ বলেন, পবিত্র স্বর বা আওয়াজ দ্বারা অন্তরে কোন কিছু প্রবিষ্ট করে না বরং এই জাতীয় স্বর দ্বারা কলব কম্পিত হয়। উপরন্তু সেমাহকারীগণ সেমাহ এর অবস্থায় অনুধাবন করে তখন তাদের অনেকের মধ্যে আল্লাহর ভয় কিংবা পরকালের (সার্বিক পরিস্থিতির) চিন্তা বা আল্লাহর (সান্নিধ্য লাভের) অগ্রহ প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে সেমাহকারীদের মধ্যে কান্না, উচ্চস্বরে কান্না বা চিৎকারের, কাপড়-চোপড় ছিন্ন করা, বেখুদী হওয়া কিংবা সুসংবাদের (রুহানী আওয়াজ) দেখা যায়, তখন তারা আনন্দ, নাচানাচী কিংবা হাত চাপড়াতে থাকে, যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ

(আঃ) যখন বিশ্রাম গ্রহণ করতেন নাচানাটির কারণ তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নবী হয়ে নাচানাটি কেন করতেন। তিনি স্ত্রীকে উত্তরে বললেন-তুমি কি আমার অন্তরের উপর হুকুম দিচ্ছ, তুমি তালাক প্রাপ্ত, তুমি চলে যাও।..... (সাকীনাতুন) সকুন থেকে ফাইল্যাতুন মত। কেউ কেউ বলেন 'সাকিন হুছে দুই মাথা ও এক চেহারা বিশিষ্ট ইনসান। কেউ বলেন 'সকিনা' হুছে বিড়ালের মাথার মত একটি মাথা-বিড়ালের লেজের মত ১টি লেজ, বিড়ালের মত উচ্চস্বর এবং তাঁর ২টি বাচ্চাও রয়েছে। জনাব মুহেব্বুল হক উদ্দীন বলেন মোফাচ্ছেরীনে কেরাম ও আইম্মায়ে এজামগণের মতে উত্তম স্বরে কোরান তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব, যা হযরত নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র বাণী অর্থাৎ- তোমরা উত্তম স্বরে কোরান তেলাওয়াত কর, হুজুরে পাক (দঃ) এরশাদ করে বলেন যে, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য্য আছে, কোরান শরীফের সৌন্দর্য্য হুছে তোমাদের উত্তম কণ্ঠস্বর। লম্বা উচ্চস্বরে কোরান তেলাওয়াত অপছন্দনীয়। অধিকন্তু উত্তম কসিদা সমূহ এবং শ্লোক উত্তম বাক্য বটে, আর মন্দ কহিদা ও শ্লোক মন্দই বটে।

কাতাবাহ

আহুকারুল খোদাম লিদ্ দরবারিল মুনীফ ফিল মাইজভান্নার শরীফ
আল্ মাদউ বে আমিনুল হক ইবনে মাওলানা আবদুল করিম বাউয়াহমাদ্রাহ ফি জান্নাতিন
নঈম, আল্জাজ্জামী-ছুন্মাল ফরহাদাবাদী, বাংলাদেশ।